# হে অতীত কথা কও

*—(ঃ)—*



অধ্যাপক—ডাঃ শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী,

এম,এ ; বি, এল, পি, আর, এস ; ডি, লিট ; শাস্ত্রী

গ্রিফিথ স্কলার ; মোয়াট গোল্ড মেডালিষ্ট, ঘোষ ট্র্যাভেলিং ফেলো, মিশর

রাজকীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রাচ্য সংস্কৃতির ভূতপূর্ব অধ্যাপক,

পাটনা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন

সভ্য ; কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আরবী

ও পারসী বিভাগের সভ্য এবং

মুসলিম কৃষ্টি ও ইতিহাসের

অধ্যাপক

দেশবন্ধু বুক ডিপো

৮৪।এ বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা—৬

১৯৪৯

প্রকাশক—
শ্রীরাধিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
৮৪/এ, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—
শ্রীমৃগেন্দ্রনাথ কুমার
উমাশঙ্কর প্রেস,
১২, গৌরমোহন মুখার্জ্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা—৬

# উৎসর্গ

রাঙাদা,

শ্রীপ্রিয়লাল রায়চৌধুরী

শ্রীচরণে—

# সূচীপত্র

১৮৬১—১৯০৭ খৃঃ অব্দ

"আমার ঘর নাই—পুত্র কলত্র নাই। আমি দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। শেষে ক্লান্ত হইয়া মনে করিয়াছিলাম যে, নর্ম্মদাতীরে এক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া—সেই নিভৃত স্থানে ধ্যান-ধারণায় জীবন অতিবাহিত করিব। কিন্তু প্রাণে প্রাণে কি এক কথা শুনিলাম, কত চেষ্টা করিলাম—কথাটি ভুলিয়া যাইতে চাই; কিন্তু যত ভুলিতে যাই, ততই ঐ কথাটি প্রাণে প্রাণে বাজিয়া উঠিতে লাগিল। কথাটি কি? ভারত আবার স্বাধীন হইবে—এখন নির্জ্জনে ধ্যান-ধারণার সময় নয়—সংসারের রণ রঙ্গে মাতিতে হইবে। নির্জ্জন দেশ হইতে স-জনে আসিলাম। আসিয়া দেখি যে, আমারি মত দু'চারিজন ভবঘুরে লোক ঐ দৈববাণী শুনিয়াছে। আমি চন্দ্র-দিবাকরকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি যে, আমি ঐ মুক্তির সমাচার প্রাণে প্রাণে শুনিয়াছি······আমি নর্ম্মদার তীর ছাড়িয়াছি বটে, কিন্তু আমার হৃদয়ে আর একটি আশ্রমের নূতন ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে;

আমি দেখিতেছি—স্থানে স্থানে স্বরাজগড় নির্ম্মিত হইয়াছে। সেখানে ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক থাকিবে না।

শুনিয়াছি মুক্তির সংবাদে আমার জপতপ বাঁধন ছাঁদন সব ঘুচিয়া গিয়াছে। আকুল পাগলপারা উধাও হইয়া বেড়াইতেছি। আর গোলামগড়ে থাকিতে চাই না—ঐ স্বরাজগড় গড়িতে, স্বরাজতন্ত্রের প্রজা হইতে আমার প্রাণ সদাই আন্‌চান"।

কি অপূর্ব অনুভূতি, কি গভীর প্রেম, কি অকৃত্রিম ভালবাসা এ শুধু কবির কল্পনা নয়। ব্রহ্মবান্ধব গৃহত্যাগী সন্যাসী, ভারতের সমস্ত প্রান্ত পরিভ্রমণ করিয়া শান্তসলিলা নর্মদাতীরে নির্জন প্রান্তরে তিনি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া সাধনে নিমগ্ন। অকস্মাৎ তিনি অনুভব করিলেন—কে যেন তাঁহাকে নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া নূতন সাধনার পথে আহ্বান করিয়াছে। তিনি স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখিলেন। সাধারণ সন্যাসীর মত ব্রহ্মবান্ধব একমাত্র নিজের মুক্তির চেষ্টা না করিয়া সমস্ত দেশের মুক্তির সাধনায় নিমগ্ন হইলেন—তাঁহার উপাস্য হইল ভারতমাতা, উপাসনা হইল দেশসেবা, মন্ত্র হইল বন্দেমাতরম্।

সিপাহী বিদ্রোহের বাহিরের বিক্ষোভ তখনও শান্ত হয় নাই। ১৮৬১ সাল—ফাল্গুন মাস, কলিকাতার ত্রিশ মাইল দূরে খনিয়ান গ্রামে এক নিষ্ঠাবান হিন্দু পরিবারে দেবীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র জন্মগ্রহণ করে—নাম ভবানীচরণ। মাতা এক বৎসরের মধ্যেই পরলোক গমন করেন। গ্রামে পিতামহীর যত্নে প্রতিপালিত ভবানীচরণ গ্রাম্য জীবনের সঙ্গে পরিচিত

হইবার সুযোগ পাইলেন। গৃহস্থালীর কথাবার্তা, গ্রাম্য রসিকতা, প্রবাদ, ছড়া পিতামহীর নিকট শিখিলেন ও তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিলেন।

বালক ভবানীচরণ পাঠশালার পাঠ শেষ করিয়া হুগলী হিন্দু স্কুলে প্রবেশ করিলেন। অধ্যক্ষ বরার্ট থোরেস বালকের ইংরাজী-সাহিত্যে জ্ঞান দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। তাঁহাকে মুরস্ পোয়েটিকাল ওয়ার্কস উপহার দিলেন। কিছুকাল কলিকাতায় জেনারল এসেম্বলী স্কুলে পাঠ করিয়া পরে হুগলী কলিজিয়েট স্কুল হইতে পনর বৎসর বয়সে তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করেন। এই সময়ে ভবানীচরণ গঙ্গা পার হইয়া ভাটপাড়ায় গিয়া সংস্কৃত পড়িতেন। তিনি তখন খুব স্বাস্থ্য চর্চা করিতেন—ব্যায়াম, কুস্তী, লাঠি, ক্রিকেট ও ছোরা খেলায় তিনি বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন।

এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া ভবানীচরণ হুগলী কলেজে প্রবেশ করেন। তখন সবে মাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের "দুর্গেশনন্দিনী", "আনন্দ-মঠ", রমেশ দত্তের "বঙ্গবিজেতা" ও "রাজপুত জীবন সন্ধ্যা" প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা দেশে সেই সময় এক অপূর্ব চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের নিবাস চব্বিশ পরগণা জেলার কাঁঠালপাড়ায়—গঙ্গার অপর তীরে। তাঁহার সাহিত্য তখন তরুণ বাঙ্গালী মনের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে—বিশেষ করিয়া হুগলী, চন্দননগর, শ্রীরামপুর, কলিকাতা অঞ্চলে। রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব সেই সময় দক্ষিণেশ্বরে এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছেন। বিলাতি শিক্ষার মোহ তখন

মুহ্যমান। রামমোহন রায়ের যুগের প্রতিক্রিয়া কেশবচন্দ্রকে নূতন পথে পরিচালিত করিয়াছে। অন্যদিকে “শাদা ইংরাজকে” “কালা ভারতীয়” বিচারক বিচার করিতে পারিবে না বলিয়া স্থির হইয়াছে। উহাতে ভারতবাসী অপমানিত বোধ করিয়াছে; ভারতীয় মনে বিক্ষোভ সঞ্চারিত হইয়াছে।

হুগলীতে তখন বহু ফিরিঙ্গী ও আর্মেনীয় বাস করিত। তাহাদের উদ্ধত অনাচারের জন্য পাড়া প্রতিবেশী অনেক সময় অস্থির হইয়া উঠিত। পাড়ার গৃহস্থ মেয়েরা গঙ্গাজল আনিতে গেলে আর্মেনীয় বালকগণ ঢিল ছুড়িয়া তাহাদের কলসী ভাঙিয়া দিত। এই লইয়া বাঙ্গালী যুবক ও আর্মেনীয়দের মধ্যে মনান্তর হইল, ফলে একদিন খুব মারামারি হইল। ভবানীচরণ ছিলেন এই দলের নেতা। পরিশেষে ভবানীচরণ এমন ব্যবহার করিলেন যে, আর্মেনীয় ও ফিরিঙ্গী বালক বাহির হইলেই মারামারি আরম্ভ হয়। শেষে ব্যাপারটি মীমাংসা হইয়া যায়, ফিরিঙ্গীরা প্রতিশ্রুতি দিল-আর তাহারা মেয়েদের কলসী ভাঙিবে না।

অন্য একদিন তাহারা এক বৃদ্ধার কলস ভাঙিয়া দিল এবং তাহাকে প্রহার করিল। আবার মারামারি আরম্ভ হইল। পুলিশ আসিল, বাঙ্গালী ছেলেরা দোষী বলিয়া সাব্যস্ত হইল। ভবানীচরণ প্রতিবাদ করিলেন। পাড়ার বয়োবৃদ্ধগণ বলিলেন —ওঁরা রাজার জাত, শাদা চামড়া, ওদের সঙ্গে বিবাদ করা কি সাজে? ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে আবেদন করার জন্য পরামর্শ দিলেন।

কিছুকাল পরে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হুগলীতে আসিলে ভবানীচরণ স্বয়ং তাঁহাকে আর্মেনীয়দের দৌরাত্ম্যের কথা বলিলেন। সুরেন্দ্রনাথ নিঃসঙ্কোচে বলিলেন যে, তিনি স্বয়ং সরকারের নিকট আবেদন করিয়া ইহার প্রতিকার করিবেন। কিন্তু কিছুই হইল না। ভবানীচরণের মনে এই ফিরিঙ্গীর অত্যাচার, ভারতীয়দের প্রতি মিথ্যা দোষারোপ এবং সুরেন্দ্রনাথের আবেদনের নিষ্ফলতা গভীর রেখা-পাত করিল। তাঁহার মনের চিন্তাধারা নূতন গতিপথ আবিষ্কার করিল। বিদেশী ফিরিঙ্গীদের অহঙ্কার ও দম্ভ চূর্ণ করিতে হইবে। তাহা আবেদনের মধ্য দিয়া হইবে না। মার না খাইলে ফিরিঙ্গী সায়েস্তা হইবে না, মার দিতে হইবে। একমাত্র এই চিন্তা—ফিরিঙ্গী তাড়াইতে হইবে।

যুবকমনে তখন দুর্গেশনন্দিনী, বঙ্গবিজেতা, আনন্দমঠ ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করিতেছে। ভবানীচরণ ভাবিলেন, কোন দেশীয় রাজ্যে গিয়া সৈন্য হইতে হইবে, তারপর সৈন্যাধ্যক্ষ, তারপর বাংলা দেশে সৈন্যদল গঠন, পরে ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে সম্মুখ সমর। সেই উদ্দেশ্যে ভবানীচরণ সত্যই একদিন পশ্চিম যাত্রা করিলেন —কোন দেশীয় রাজ্যে সৈন্য বিভাগে যোগদান করিবেন। পথিমধ্যে তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা পার্বতীচরণ পাণ্ডুয়া ষ্টেশনে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং অনেক বুঝাইয়া ফিরাইয়া আনিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হরিচরণ তাঁহাকে কলিকাতায় আনিয়া নিজের কাছে রাখিলেন এবং জেনারেল এসেম্বলী ( বর্তমান স্কটিশ চার্চ ) কলেজে ভর্তি করাইয়া দিলেন।

আনন্দমোহন বসু তখন দেশের নেতা। ভবানীচরণের পিতৃব্যের বন্ধু। সেই পরিচয়ে ভবানীচরণ আনন্দমোহন বসুর নিকট গিয়া তাঁহার মনের ভাব প্রকাশ করিলেন। আনন্দ-মোহন বলিলেন যে, ইংরেজ জাতি পৃথিবীতে স্বাধীনতার দূত। তাঁহারা বৈধ আন্দোলনের পক্ষপাতী। যুবক ভবানীচরণ গম্ভীরভাবে বলিয়া উঠিলেন—অসম্ভব,—কলমবাজিতে স্বাধীনতা হইবে না, অস্ত্র ভিন্ন অন্য উপায় নাই—Not through pen but only through sword.

আনন্দমোহন বসুর নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া ভবানী-চরণের একমাত্র চিন্তা—অস্ত্র চালনা শিখিতে হইবে, যুদ্ধ করিয়া ফিরিঙ্গী তাড়াইতে হইবে। গোয়ালিয়র গিয়া সৈন্য বিভাগে যোগ দিবেন। রমেশ দত্তের—“মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত” তাঁহার মনে আলোর রেখা সম্পাত করিয়াছে—বাঙ্গালীর জীবন প্রভাত কি হইবে না? গোয়ালিয়র সিন্ধিয়া রাজ্য, মহারাষ্ট্র রাজার অধীন, সেখানে যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করিতে হইবে। চারিজন বন্ধু মিলিয়া ভবানীচরণ গৃহত্যাগ করিলেন, উদ্দেশ্য গোয়ালিয়র যাইবেন। তাঁহাদের সঙ্গে সম্বল মাত্র দুই মাসের কলেজের বেতন। সেই সামান্য অর্থের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা এটাওয়া ষ্টেশন পর্যন্ত চলিলেন। সেই স্থান হইতে পদব্রজে তাঁহারা যাত্রা করিলেন। হঠাৎ মধ্য পথে একজন সহযাত্রী বন্ধুর পিতা তাঁহাদের পথ রোধ করিলেন। তাঁহারা ফিরিতে বাধ্য হইলেন। সৈনিক হওয়ার দ্বিতীয় অভিযান ব্যর্থ হইল।

আত্মীয়-স্বজন ভবানীচরণকে তখন মেট্রোপলিটন কলেজে

ভর্তি করিয়া দিলেন। সুরেন্দ্রনাথ তখন ইংরাজীর অধ্যাপক; তাঁহার বার্কের ফরাসীবিদ্রোহ এবং আমেরিকান বিদ্রোহ (Speeches on the French Revolution and American Taxation) বাঙ্গালী যুবকদের মনে অপূর্ব উন্মাদনা সঞ্চার করিয়াছে। কিন্তু ভবানীচরণ সুরেন্দ্রনাথের বৈধ আন্দোলনের শম্বুকগতির জন্য অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি এবার স্থির করিলেন একাই গোয়ালিয়র যাইবেন; আবার যাত্রা করিলেন—ভবানীচরণ তখন ১৮ বৎসরের যুবক।

ফিরিঙ্গী বিতাড়নের চেষ্টায় সামরিক শিক্ষা লাভের জন্য কিশোর ভবানীচরণ একাকী অপরিচিত, অনিশ্চিত স্থানের উদ্দেশে চলিয়াছেন। সম্বল মাত্র ৩০৲ টাকা আর মনের অদম্য আকাঙ্ক্ষা, গন্তব্য স্থান গোয়ালিয়র। গোয়ালিয়রে আসিয়া প্রথমেই একজন মারাঠা সর্দারের গৃহে তাঁহার পুত্রের শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিলেন। সেই সময়ে বাঙ্গালীর চাকুরীর অভাব হইত না, কারণ বাঙ্গালীরা ইংরাজী জানে বলিয়া ভারতের সর্বত্র খুব সম্মানিত হইত। কিছুকাল সেখানে শিক্ষকতা করিয়া ভবানীচরণ গোয়ালিয়রের সেনাপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। কিন্তু সেনাপতির কোন ক্ষমতা নাই। মহারাজা সিন্ধিয়া ইংরাজ আইনানুযায়ী বাঙ্গালীকে সৈন্যবিভাগে নিযুক্ত করিতে পারেন না—কারণ ইংরাজের নিয়মে বাঙ্গালী "অসামরিক জাতি", সুতরাং সেনাপতি ভবানীচরণকে কোন সাহায্য করিতে পারিলেন না। বিফলমনোরথ হইয়া ভবানীচরণ বাংলা

দেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তাঁহার প্রত্যক্ষ সামরিক শিক্ষার চেষ্টা এইখানেই শেষ হইল।

ভবানীচরণ কিছুকাল বর্ধমান জেলার মেমারীতে শিক্ষকের কাজ করিলেন। সেখানে ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া স্বাস্থ্যলাভের জন্য জব্বলপুর গেলেন। প্রত্যাবর্তনের পথে হিমালয় ভ্রমণে বাহির হইলেন। উদ্দেশ্য—সাধু সাক্ষাৎ। সাধু মহাত্মার কৃপায় যদি কোন প্রকার সাহায্য পাওয়া যায়—যাহার প্রভাবে ভারতবর্ষ স্বাধীন হইতে পারে। কিন্তু সেইরূপ কোন সাধুর সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। দেশে আসিয়া তিনি ফ্রী চার্চ স্কুলে শিক্ষকতা আরম্ভ করিলেন। সেই সঙ্গে সাহিত্য আলোচনায় মনোনিবেশ করিলেন।

১৮৮৬ খৃঃ অব্দে সাহিত্য চর্চা করিবার জন্য ভবানীচরণ কনকর্ড ক্লাব (মিলনী) গঠন করেন এবং কনকর্ড পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই ক্লাবে যুবকদের শরীর, মন ও আত্মার উন্নতি বিষয়ে আলোচনা হইত। অক্সফোর্ড মিশনের যাজক রেভারেণ্ড টাউনসেণ্ড কনকর্ড ক্লাবে বাইবেলের পাঠ দিতেন। তাঁহার পত্রিকায় খৃষ্ট ধর্ম বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। ক্রমশঃ রাজনীতির আলোচনা হইতে লাগিল। কলিকাতায় ক্লাবটি বেশ জনপ্রিয় হইয়া উঠিল এবং বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ইহাতে যোগদান করিলেন। এই সময় কংগ্রেস আরম্ভ হইয়াছে।

তখন কেশব সেনের যুগ। তাঁহার অপূর্ব বাগ্মিতায় সমস্ত দেশ প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। যে সকল যুবক হিন্দু ধর্মকে পূর্ণ বিশ্বাস করে না, অথচ খৃষ্টানধর্মও গ্রহণ করিতে পারে না—

তাহাদের অধিকাংশই কেশব সেনের বক্তৃতায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। কেশব সেন ব্রাহ্মধর্মকে সর্বধর্ম-সমন্বয়ী রূপ দিলেন—হিন্দুর নিরাকার ব্রহ্ম; তার সঙ্গে প্রাচীন প্রথানুযায়ী আরতি, কাঁসর, ঘণ্টা, ধূপ, ধূনা, পুষ্পমাল্য সংযোগ করিয়া দিলেন। চেয়ারে বসিয়া হরি সংকীর্তন ও শাস্ত্রপাঠ করিতে লাগিলেন। কোনদিন ব্রাহ্ম-মন্দিরে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা, কোনদিন জল সংস্কার, কোনদিন খৃষ্টের শুভ ক্রাইডে উৎসব। এই নববিধানের প্রতি ভবানীচরণ আসক্ত হইয়া উঠিলেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হইলেন। এই সময়ে তাঁহার বন্ধু সিন্ধুবাসী হীরানন্দের সঙ্গে কলিকাতায় প্রগাঢ় পরিচয় হয়।

কেশব সেনের মৃত্যুর পর ভবানীচরণের ব্রহ্মধর্মের প্রতি অনুরাগ আরও বৃদ্ধি পাইল। ১৮৮৮ খৃঃ অব্দে ব্রাহ্ম-ধর্ম প্রচারের জন্য হীরানন্দ এবং ভবানীচরণ সিন্ধু দেশে যাত্রা করিলেন। সেখানে কয়েকজন যুবককে ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষিত করিলেন। প্রচার উদ্দেশ্যে ১৮৮৮ খৃঃ অব্দে ইউনিয়ান একাডেমি নামে তিনি একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন। সাধু হীরানন্দ এখানে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন।

এই সময়ে পিতার অসুখের সংবাদে তিনি মূলতানে চলিয়া আসেন। সেখানে পিতার মৃত্যুর পর পুনরায় করাচীতে প্রত্যাবর্তন করেন, কারণ শুনিলেন যে, সিন্ধুদেশে ভীষণ প্লেগ আরম্ভ হইয়াছে। ভবানীচরণ নিজের প্রাণ বিপন্ন করিয়া প্লেগরোগীর সেবা করিয়াছেন। সিন্ধুদেশে ভবানীচরণের

সেবাপরায়ণতার জন্য বাঙ্গালী অপূর্ব শ্রদ্ধা লাভ করিল। ভবানীচরণ প্রায় দশ বৎসর সিন্ধুদেশে অতিবাহিত করিয়াছেন। সেখানে ধর্ম প্রচার, শিক্ষা প্রচার, লোকসেবার জন্য সিন্ধুবাসী তাঁহাকে দেবতার মত শ্রদ্ধা করিতেন। এমন নিঃস্বার্থ, একাগ্র ক্লান্তিবিহীন সেবা ভবানীচরণের পূর্বে সিন্ধুদেশে বর্তমান যুগে কেহ দেখে নাই।

সিন্ধুদেশে ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচারের সময় তিনি "ফিনিক্স" (Phoenix) ও"হারমণি"(Harmony) নামক দুইখানি সংবাদ-পত্রের সম্পাদকেব কাজ করেন। পরে নিজেই "সোফিয়া" (Sophia) নামক পত্রিকা প্রকাশ করেন। সম্পাদকীয় আলোচনার সময় তিনি প্রায়ই খ্রীষ্টের জীবনী আলোচনা করিতেন। "হারমণি" পত্রিকায় খৃষ্ট ধর্মের ভক্তির দিক লইয়া বিচার কবিতেন। কেশব সেনের যুক্তিবাদী ভক্তিব রূপ তাঁহাকে খুব আকর্ষণ করিয়াছিল। তারপর কনকর্ড ক্লাবে রেভারেণ্ড টাউনসেণ্ড সাহেবের বাইবেল আলোচনা দ্বাবা তিনি যীশুর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে মূলতানে ভবানীচরণ রেভারেণ্ড ক্রণোর ক্যাথলিক বাইবেল (Catholic Bible) পাঠ করিয়া চঞ্চল হইয়া উঠেন। করাচীতে সি, এম, এস সংঘে পাদ্রীদের বক্তৃতা শুনিতে আরম্ভ করেন।

১৮৯১ খৃঃ অব্দে ২৬শে ফেব্রুয়ারী ভবানীচরণকে মিষ্টার হিউম খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করেন। তাঁহার এই খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণের পর সিন্ধুর হিন্দু সমাজ অত্যন্ত ক্ষুদ্ধ হইয়া পড়িল। ভবানী-চরণ বন্ধু-স্বজন হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িলেন। সি, এম, এস

মিশন ভবানীচরণকে মিশন স্কুল-আবাসে বাস করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তিনি বিদেশী মিশনারীর সঙ্গে একত্র বাস করিতে সম্মত হইলেন না। তাঁহারা তখন তাঁহার জন্য ভিন্ন ঘর নির্মাণ করার প্রস্তাব করিলেন। তাহাও তিনি প্রত্যাখ্যান করিলেন, কারণ. পরের অনুগ্রহ তিনি গ্রহণ করিবেন না। এমন কি তাঁহাদের গীর্জার প্রার্থনাতে যোগ দিতে সম্মত হইলেন না। তিনি যীশু খৃষ্টের ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু খৃষ্টানমণ্ডলীর হস্তে নিজকে সমর্পণ করেন নাই। তাই খৃষ্টানগণ তাঁকে অহঙ্কারী, আত্মম্ভরী বলিয়া নিন্দা করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা ভবানীচরণের আত্ম-সম্মানবোধ, সমাজপ্রীতি এবং স্বার্থত্যাগের দিকটা ধারণা করিতে পারেন নাই। ভবানীচরণ ইউনিয়ন একাডেমীর সভ্যপদ ত্যাগ করিয়া একটি অত্যন্ত দীন গৃহে, শাকান্ন ভোজন করিয়া আত্মোন্নতির পথের সন্ধানে নিজকে বিলুপ্ত করিয়া দিলেন।

প্রটেষ্টাণ্ট ধর্মসম্প্রদায়ের বিলাস-বিভ্রম ভবানীচরণের ধর্ম-পিপাসাকে তৃপ্ত করিতে পারিল না।, সেখানে ত্যাগের স্থান নাই, আত্মবিলোপের স্থান নাই। সুতরাং ভবানীচরণ ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মধ্যে যীশুর ধর্মের সন্ধান করিতে লাগিলেন। করাচীর রোমান ক্যাথলিক পাদরী ক্রডার তাঁহাকে ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষিত করিলেন। ভবানীচরণের নূতন নাম হইল থিয়োফিলাস Theophilus—ঈশ্বরের বন্ধু। (Theo অর্থ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর ; Philus অর্থ বন্ধু।) তিনি হইলেন ব্রহ্ম-বান্ধব।

এই Theophilus খৃষ্টান জগতে প্রথম Trinity (ভগবানের ত্রয়ীরূপ) শব্দ ব্যবহার করেন। তিনি তাঁহার এই খৃষ্টীয় নামকে বৈদিক আবরণে সমৃদ্ধ করিলেন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার বংশজ উপাধি 'উপাধ্যায়' ত্যাগ করিলেন না। তাঁহার নবীন নামকরণ হইল উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব। তাঁহার অনুসরণে আরও কয়েকজন সিন্ধুবাসী খৃষ্ট-ধর্ম গ্রহণ করিলেন।

এই ধর্মান্তর গ্রহণে তাঁহার বিরুদ্ধে সিন্ধীদের বিরাগ আরও বাড়িয়া গেল। ভবানীচরণ সিন্ধু দেশে কোন বাসস্থান পাইলেন না। তিনি বাধ্য হইয়া একজন ইহুদীর গৃহে বাসস্থান স্থির করিলেন। ব্রহ্মবান্ধবের বিরুদ্ধে নানা-প্রকার বিদ্রূপ ও ইঙ্গিত চলিতে লাগিল। তিনিও পরাজয় স্বীকার করিবার পাত্র নন। তাই "সোফিয়া" নামক সংবাদ-পত্রে ক্যাথলিক ধর্মমত প্রচার করিতে গিয়া বেদান্তের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাঁহার তীক্ষ্ণ মনীষা দ্বারা বুঝিতে পারিলেন যে, বেদান্তের যুক্তিজালকে ছিন্ন করা অপেক্ষা খৃষ্ট-ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বেদান্তের যুক্তি ব্যবহার করিলে ভাল ফল হইতে পারে। খৃষ্ট-ধর্ম উদ্দেশ্যে ব্রহ্মবান্ধব ভাবতে "ইসা-পন্থী" সম্প্রদায় নামক খৃষ্টান সম্প্রদায় গঠন করিতে প্রয়াস পাইলেন। এ বিষয়ে তিনি "জেস্যুট" সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ইগনেসিয়াস লয়োলার অনুসরণ করিতে চেষ্টা করেন।

তিনি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিলেও ইউরোপীয় আচার-ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহার পরিধানে হিন্দু সন্যাসীর

গৈরিক বসন, হস্তে সন্ন্যাসীর দণ্ড, আহারে সংযম, ব্যবহারে মিতাচাব ছিল ; অথচ গলদেশে কৃষ্ণবর্ণের যীশুর ক্রশ ধারণ করিতেন। খৃষ্টধর্ম প্রচারের জন্য ব্রহ্মবান্ধব ১৮৯৫ সালের অক্টোবর মাসে পাঞ্জাবে আসিলেন। এখানে তিনি ঈশ্বরের স্বরূপ এবং মানবের লক্ষ্য বিষয়ে বক্তৃতা করিলেন। তখন পাঞ্জাবে আর্য-সমাজের বিবাট প্রভাব। তবু ব্রহ্মবান্ধবের বক্তৃতা পাঞ্জাবে যথেষ্ট উৎসাহ ও চাঞ্চল্যের সঞ্চার করিল। তাবপব তিনি মিসেস্ এনি বেসাণ্টের থিওসফিকে আঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। থিওসফির বিরুদ্ধে তিনি মাদ্রাজ, বোম্বাই, লাহোর, করাচী, সুক্কুর এবং হায়দাবাবাদ নগরে বক্তৃতা করিলেন। ১৮৯৬ খৃঃ অব্দে আজমীরের ধর্ম-সভায় আহূত হইয়া তিনি খৃষ্টের জীবন সম্বন্ধে এক মর্মস্পর্শী বক্তৃতা করেন। সেখান হইতে তিনি অমৃতসরে শিখ গুরুদ্বার দেখিতে যান।

অমৃতসরে তিনি সংবাদ পান যে করাচীতে প্লেগ চলিতেছে ; তিনি তৎক্ষণাৎ নিজের জীবন তুচ্ছ করিয়া করাচীতে ফিরিয়া আসিয়া আর্তসেবা আরম্ভ করেন। গৃহে প্লেগ আরম্ভ হইলে পিতা পুত্রকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, স্বামী স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়াছে ; আত্মীয় বন্ধুর ত' কথাই নাই। ব্রহ্মবান্ধব রোগীর গৃহে বাস করিয়া, ঔষধ পথ্য সংগ্রহ করিয়া, শেষ পর্যন্ত মৃতদেহের শেষকৃত্য সম্পন্ন করিয়া রোগীব গৃহ ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি খৃষ্টান হইলেও তাঁহার হাতের জল হিন্দু বোগীগণ নিঃসঙ্কোচে পান করিয়া তৃপ্ত হইয়াছে।

১৮৯৬ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে ব্রহ্মবান্ধব বোম্বাই সহরে

হিন্দুধর্ম, থিওসফি এবং খৃষ্টধর্ম বিষয়ে বক্তৃতা করেন। জাষ্টিস্ রাণাডে তাঁহার সেই অভিভাষণের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

১০ বৎসর পরে ১৮৯৭ খৃঃ অব্দে ব্রহ্মবান্ধব বাংলা দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। সন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া তিনি পিতৃগৃহে আশ্রয় নিলেন না। তিনি এক ব্রাহ্ম-বন্ধুর গৃহে বাস করিতেন; স্বপাকে এবং ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করিতেন। প্রথমেই তিনি এলবার্ট হলে বেদান্ত সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দেন। তাঁহার বক্তৃতার মর্মার্থ উপলব্ধি করিয়া রেভারেণ্ড ম্যাক্‌ডোনাল্ড বলেন যে, তিনি জীবনে এমন জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা শুনেন নাই।

১৮৯৮ সালে ব্রহ্মবান্ধবের সিন্ধুদেশীয় জনৈক বন্ধু আসিয়া কলিকাতায় তাঁহার সঙ্গে যোগ দিলেন। তাঁহারা তুইজনে মিলিযা প্রকাশ্য রাজপথে করতাল বাজাইয়া বাংলা ও সংস্কৃত স্তোত্র পাঠ করিয়া ভিক্ষা করিতেন। গৈরিকবসনধারী, দণ্ডপানি, মুণ্ডিত-মস্তক, বক্ষে দোলায়মান ক্রশ, খৃষ্টান সন্যাসী—কলিকাতায় অপূর্ব দৃশ্য!

ধর্মজীবন যাপন উদ্দেশ্যে ১৮৯৮-১৮৯৯ সালে তাঁহারা জব্বলপুরে নর্মদাতীরে আশ্রম স্থাপন করিলেন। সেখানে ১৮৯৯ সালে লেণ্ট এবং গুড্‌ ফ্রাইডে ( Lent and Good Friday ) অনুষ্ঠান করিলেন। কিন্তু সেই আশ্রম-জীবন তাঁহার ধর্মপিপাসা চরিতার্থ করিতে পারে নাই। সব সময়ই মনে হইত কি যেন তিনি সন্ধান করিতেছেন, অথচ সে বস্তুর দর্শন তিনি লাভ করিতে পারিতেছেন না। সুতরাং ব্রহ্মবান্ধব খৃষ্টধর্মের কেন্দ্র রোম নগরীতে তীর্থযাত্রা করিতে মনস্থ

করিলেন। মহীশূরে জনৈক বন্ধুর অর্থ সাহায্যে তিনি ইউরোপ যাত্রা করিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বোম্বাইয়ে জ্বর হওয়ায় করাচীতে ফিরিয়া আসিলেন।

খৃষ্টান মিশনারীগণ সাধারণতঃ ব্রহ্মবান্ধবের অদ্ভুত আচরণ দেখিয়া তাঁহার ধর্মপ্রচেষ্টাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন এবং তাঁহার সঙ্গ পরিহার করিয়া চলিতেন। বেদান্তের যুক্তিগুলিকে খৃষ্টধর্মের জন্য ব্যবহার করাকে ধর্ম-বিগর্হিত আচরণ বলিয়া নিন্দা করিতেন। তাঁহারা "সোফিয়া" পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলিকে প্রকাশ্যে আঘাত করিতে লাগিলেন এবং পাদরীগণকে সোফিয়া পত্র পাঠ করিতে নিষেধ করিলেন। তখন তিনি টুয়েণ্টেথ সেন্‌চুরী ( Twentieth Century) নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করিয়া খৃষ্টধর্ম ও বেদান্তের তুলনা প্রচার করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ তিনি নিজের পরোক্ষে একজন বৈদান্তিক হইয়া পড়িলেন এবং ভারতের সভ্যতা ও ধর্মের প্রতি নূতন করিয়া আকৃষ্ট হইয়া উঠিলেন। এই পত্রিকায় "পঞ্চদশী" নামক বেদান্ত গ্রন্থের একটি ইংরেজী অনুবাদ আরম্ভ করেন।

তখন স্বামী বিবেকানন্দ সমস্ত আমেরিকায় ও ইংলণ্ডে বেদান্ত প্রচার করিয়া আসিয়াছেন, বিশ্বের ধর্মসভায় ভারতের মর্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিবেকানন্দের ভৈরবী-বাণী সমস্ত দেশকে প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ ধর্ম প্রচারের সঙ্গে অনেক সময় ভারতের দুঃখ দুর্দশার সমালোচনা করিতেন। ভারতের দুঃখ দুর্দশার কথা বলিতে

বলিতে তিনি ভারতীয় পরাধীনতার কথা বলিতেন। পরাধীনতাকে ভারতের সমস্ত দুঃখের কারণ বলিয়া অভিযোগ করিতেন—ভারতেব জ্ঞান, ধর্ম ও সম্মানের পুনরুদ্ধার সম্ভব তখনই হইবে যখন ভাবতবর্ষ আত্মনিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে। ইংরেজ শান্তি ও শৃঙ্খলার যাদুমন্ত্রে ভারতবর্ষকে নির্জীব করিয়া বাখিয়াছে। সুতরাং ভাবতবর্ষে ধর্মভাব জাগ্রত করিতে হইলে স্বাধীনতার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

ব্রহ্মবান্ধবের চিন্তা নূতন পথে পরিচালিত হইল। তাঁহার চরিত্রে এক অদ্ভুত তীব্রতা ছিল; যে মন্ত্র একবার স্থির করিতেন উহা সাধনের জন্য তাঁহার চেষ্টার অবধি থাকিত না। ভারতবাসীব অন্তরে আত্মবিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে—সেই বিশ্বাসের বীজ অঙ্কুরেই শিশুমনে বপন করিতে হইবে। সুতরাং তিনি বালকদের শিক্ষার জন্য একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিলেন।

১৯০১ সালে তিনি "স্বারস্বত আয়তন" নামে একটি শিক্ষায়তন স্থাপন করেন। এই আশ্রমে ছাত্রের কোন বেতন ছিল না। তিনি বলিতেন—'বেতন লইয়া বিদ্যাদান ইংরেজের ব্যবসাবুদ্ধিতেই সম্ভব। আমরা হিন্দু, আমাদেব দ্বারা বিদ্যা মূল্য লইয়া বিক্রয় কখনই সম্ভব নয়।' শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলিতেন—'প্রাচীন আদর্শে শিক্ষা দিতে হইবে। তবে গ্রাসাচ্ছাদন-উপযোগী বিদ্যাও ইহার মধ্যে স্থান পাইবে।'

অল্পদিনের মধ্যেই সারস্বত আয়তন খুব জনপ্রিয় হইয়া উঠিল। তখন বোলপুরে রবীন্দ্রনাথও একটি ব্রহ্মচর্যাশ্রমের

পরিকল্পনা করিয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। ব্রহ্মবান্ধব তাঁহার সিন্ধী-বন্ধুব সঙ্গে বোলপুর গেলেন এবং সেখানে তাঁহার আশ্রমের স্থান পরিবর্তন করিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেই শিক্ষায়তনের ভার গ্রহণ করিলেন। রবীন্দ্রনাথ আদর্শের দিক দিয়া ব্রহ্মবান্ধবকে প্রেরণা দিতেন, ব্রহ্মবান্ধব কর্মের দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথের চিন্তাকে রূপ দিতেন। ক্রমশঃ ব্রহ্মবান্ধব রবীন্দ্র-বান্ধব হইয়া উঠিলেন। ব্রহ্মবান্ধবেরই আবেগে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সঙ্গীত "নৈবেদ্য" রচনা করিয়া ভগবৎ চরণে নিবেদন করিলেন। কিন্তু উগ্রপন্থী ব্রাহ্মসমাজ রবীন্দ্রনাথের উপর খৃষ্টান ব্রহ্মবান্ধবের প্রভাব উদার দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন নাই। তাঁহারা আতঙ্কিত হইয়া ভাবিলেন—ব্রহ্মবান্ধবের বন্ধুত্বের ছিদ্রের মধ্য দিয়া ব্রাহ্ম-সমাজে খৃষ্টধর্ম ও খৃষ্টীয় আচার প্রবেশ করিবে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বন্ধুত্ব সত্বেও ব্রহ্মবান্ধবের প্রভাব সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিলেন।

ব্রহ্মবান্ধবের আত্মসম্মান-জ্ঞান খুব প্রখর ছিল। তিনি যখন বুঝিলেন যে, ব্রাহ্মসমাজে রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার সহকর্মিতার জন্য আঘাত সহ্য করিতে হইতেছে—তিনি তখন বোলপুর ত্যাগ করিলেন। প্রত্যাবর্তনের পথে হাওড়া ষ্টেশনে শুনিলেন—স্বামী বিবেকানন্দ দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি অধীর হইয়া উঠিলেন—বিবেকানন্দ তাঁহার বাল্যবন্ধু, কলেজের সহপাঠী। তিনি তৎক্ষণাৎ বেলুড় চলিয়া গেলেন। স্বামিজীর নশ্বর দেহপার্শ্বে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ ভাবিলেন। তারপর স্থির করিলেন, তিনি স্বামীজীর অপূর্ণ ব্রত উদ্‌যাপন করিবেন।

পরে ব্রহ্মবান্ধব লিখিয়াছেন—'আমার প্রেরণা হইল—তোমার যতটুকু শক্তি আছে ততটুকু কাজে লাগাও ; বিবেকানন্দের ফিরিঙ্গী-বিজয়-ব্রত উদযাপন করিতে চেষ্টা কর। কে যেন আমার অন্তরে আসিয়া এই কথা বলিয়া আমার মর্ম্মে আঘাত করিল। আমি অধীর হইয়া উঠিলাম। সেই মুহূর্ত্তেই বিলাত যাইব স্থির করিলাম। বিলাতে গিয়া বেদান্তের প্রতিষ্ঠা করিব।'

তারপর তিনি তাঁহার সারস্বত আয়তনের ভার সিন্ধুদেশবাসী শিষ্যের উপর ন্যস্ত করিয়া বিলাতে রওনা হইলেন। সম্বল মাত্র ২৭৲ টাকা।

১৯০২ সাল, ৫ই অক্টোবর। ভারতীয় সন্যাসী চলিয়াছেন অজানা দেশে। পরিধানে গৈরিক বসন, হস্তে দণ্ড, বক্ষে দোলায়-মান ক্রশ—সম্বলের মধ্যে একখানি কম্বল ও একটি কমণ্ডলু।

জাহাজে আসিয়া তিনি কয়েকজন পরিচিত সিন্ধী বণিকের সাক্ষাৎ পাইলেন ; তাঁহারা সন্ন্যাসীর সুখ-সুবিধার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিলেন। তিনজন বুয়র যুদ্ধের বন্দীর সঙ্গে জাহাজে তাঁহার আলাপ হয়। তাহাদের নিকট বুয়র-যুদ্ধের অনেক সংবাদ জানিলেন এবং একজনের রচিত বুয়র-যুদ্ধের ইতিহাসের পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া ফেলিলেন। একজন বন্দী সৈনাধ্যক্ষের সন্ন্যাসীর কমণ্ডলুর প্রতি খুব লোভ হয় এবং কমণ্ডলুর অজস্র প্রশংসা করেন। তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মবান্ধব তাঁহার একমাত্র সম্বল কমণ্ডলুটি তাঁহাকে দান করিলেন।

১লা নভেম্বর নেপ্‌লসে পৌঁছিয়া রোমের দিকে অগ্রসর

হইলেন। ট্রেণে দুইজন ইউরোপীয় তরুণ-তরুণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল, তাহারা গাড়ীতে বসিয়া সুরাপান করিতেছিল এবং অত্যন্ত লজ্জাহীন আচরণ করিতেছিল। ভারতীয় সন্যাসীর চক্ষে সেই দৃশ্য অত্যন্ত গর্হিত বলিয়া মনে হইল—তাঁহার চক্ষের উপর ভাসিয়া উঠিল বাঙ্গালী ঘরের লজ্জাবতী, অবগুণ্ঠিতা, কল্যাণময়ী কুলবধূ আর সম্মুখে দেখিলেন স্বেচ্ছাচারিণী, লজ্জাহীনা, বিলাসিনী ইউরোপীয় নারী। পরবর্তী জীবনে তিনি বহুবার ঐ দৃশ্যের উল্লেখ করিয়াছেন।

রোমে তিনি সেণ্ট পিটারের গীর্জা, পোপের আবাসভূমি ভেটীকান প্রভৃতি দর্শন করিয়া ৪ঠা নভেম্বর অক্সফোর্ড সহরে উপস্থিত হইলেন। অক্সফোর্ডের কার্ডিনেলের সঙ্গে দেখা করিলেন এবং সংবাদপত্রে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিলেন। তারপর "হিন্দু চিন্তাধারা এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতি" ( Hindu thought and the Western culture ) সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। বিখ্যাত সংস্কৃতবিদ্ মেকডোনাল্ড সেই সভার সভাপতি ছিলেন। কিছুকাল মধ্যে ক্রমশঃ হিন্দুর আস্তিক্যবাদ ( Hindu Theism), হিন্দুর নীতিবাদ ( Hindu Ethics ), হিন্দুর সমাজতত্ব ( Hindu Sociology ) সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। ইহাতে ভারতের সম্মান সুধীসমাজে যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইল। বিখ্যাত দার্শনিক পত্র মাইণ্ড্ ( Mind ) পত্রিকার সম্পাদক তাঁহার প্রবন্ধ প্রকাশ করিলেন এবং মন্তব্যে বলিলেন যে, এই প্রবন্ধে প্রমাণিত হইয়াছে—পাশ্চাত্য দর্শন অপেক্ষা বেদান্ত অধিকতর যুক্তিসম্মত।

ইহার পর বিলাতের বহু স্থান হইতে বক্তৃতা করার জন্য তাঁহার নিমন্ত্রণ আসিতে লাগিল। বার্মিংহামে বক্তৃতা দিয়া তিনি অক্সফোর্ড মহিলা সভায় বক্তৃতা দিলেন। প্রথমে তিনি ভারতীয় নারীর জীবনযাত্রার কথা বলিলেন, তারপর হিন্দু কুমারীদের পুণ্যিপুকুর, যমপুকুর, শিবপূজা, সূর্যব্রত এবং উহাদের উদ্দেশ্য, বিবাহের বিবরণ, ছাদনাতলা, কানমলা, কিল খাওয়া, বাসর-ঘর প্রভৃতি অনেক হাসির কথা বলিলেন। স্নানের ঘাটে মেয়েলী নিন্দা, শাশুড়ী-বউয়ের ঝগড়া, ননদ-বৌদির কোঁদল, গুরুজনের সম্মুখে ঘোমটা দেওয়া—আরও কত কি! এই সব জিনিষের তত্ব ব্যাখ্যা শুনিয়া মেমসাহেবেরা আশ্চর্য হইয়া গেলেন। খ্রীষ্টান পাদরীদের মুখে ভারতের নিন্দা সবচেয়ে বেশী শোনা যায়। অথচ ব্রহ্মবান্ধবও খ্রীষ্টান, সন্ন্যাসী। তাই তাঁহার মুখে এইসব নূতন কথা শুনিয়া মেম সাহেবদের মনে অনেক নূতন প্রশ্নের উদয় হইল। তাঁহারা বহু নূতন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন এবং যুক্তিপূর্ণ উত্তর শুনিয়া বিস্মিত হইলেন।

হিন্দুর বর্ণাশ্রম সম্বন্ধেও অনেক নূতন কথা বলিলেন। তারপর কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রিনীটি কলেজে তিনটি বক্তৃতা দিলেন। প্রথম হিন্দুর নির্গুণ-ব্রহ্ম, দ্বিতীয়—হিন্দুর রাজনীতি, তৃতীয়—হিন্দুর সমাজতত্ব। সভাপতি বিখ্যাত অধ্যাপক ডাঃ মেক্ টেগার্ট (Dr. Mc. Teggart) বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া কয়েকজন অধ্যাপক কেম্ব্রিজে ভারতীয় দর্শনের অধ্যাপক পদ সৃষ্টি করার জন্য ১৯০৩ সালের জুলাই মাসে একটি কমিটি নিযুক্ত করিলেন।

বিলাতে তিনি অত্যন্ত অভাবের মধ্যে ছিলেন। তাঁহার বন্ধুগণ বলিলেন যে, বিলাতের প্রথানুসারে টিকিট করিয়া বক্তৃতা দিলে তাঁহার অর্থকষ্ট লাঘব হইবে। তিনি সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। কারণ, হিন্দু বিদ্যা দান করে, বিদ্যা বিক্রয় করে না।

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় তখন ভারতীয় দর্শনের অধ্যাপক পদের জন্য বার হাজাব টাকা প্রয়োজন বলিয়া স্থির কবিলেন। ব্রহ্মবান্ধব অর্থ সংগ্রহ ও অধ্যাপক নির্বাচনের জন্য ভাবতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

বিলাতে বাসকালীন তাঁহার প্রবন্ধাবলী 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। বিবেকানন্দের আমেরিকা জয়ের পরেই ইংলণ্ডে ভারতীয় সন্ন্যাসীর এই সম্মানে ভারতবাসী নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিল, দেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রে তাঁহাব নাম প্রচাবিত হইয়া গেল।

ব্রহ্মবান্ধব ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করিয়া কেম্ব্রিজে ভারতীয় দর্শনের অধ্যাপকেব জন্য অর্থ ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু অধ্যাপক নিয়োগ ব্যাপারে মতদ্বৈধ হওয়ায় সেই প্রচেষ্টা স্থগিত রহিল।

বিলাতে গিয়া ব্রহ্মবান্ধবের কতকগুলি তিক্ত অভিজ্ঞতা হইয়াছিল। তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিলেন যে, ইউরোপীয় জাতিগুলির বদ্ধমূল ধারণা—শ্বেতকায় জাতিই মানবকুলের শ্রেষ্ঠ, অন্যান্য জাতি তাহাদের দাসত্ব করিতে জন্মিয়াছে। এই ধারণাই পৃথিবীতে বহু অনিষ্ট ও অনাচার আনয়ন করিয়াছে।

এই মনোভাব দূর না হইলে ভারতের অনিষ্টের শেষ হইবে না। প্রথমতঃ, ইংরাজের আসুরিক ভাব দূর করার জন্য ব্রহ্ম-বান্ধব বিলাতে ভারতীয় দর্শন ও ভাবধারা প্রচারের চেষ্টা করিলেন। সেই চেষ্টাকে স্থায়ী কবার জন্য একজন দর্শনেব অধ্যাপক নিযুক্তেব চেষ্টা কবিলেন। কিন্তু তাহা ফলবতী হইল না।

তিনি হতোৎসাহ হওয়ার পাত্র ছিলেন না। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ভাবতবর্ষের সুদিন আসিতেছে। চিরকাল ভারতের দুর্দিন থাকিতে পারে না। সূর্যোদয়েব পূর্বে সন্ধ্যার অন্ধকাব অনিবার্য। তেমনি ভাবতের স্বাধীনতা-সূর্য উদয়ের পূর্বাভাস এই বিদেশীব অধীনতা, এই ধর্মেব গ্লানি। সন্ধ্যার আগমনে ভীত হইবার কিছু নাই। সন্ধ্যার রাজ্য পার হইয়াই দূরের অরুণ কিবণ-ছটা প্রতিভাত হইবে। সুতরাং তিনি প্রকাশ কারিলেন "সন্ধ্যা"—১৯০৪ সালে। উদ্দেশ্য নির্ণয়ে তিনি লিখিলেন—

'তুমি হিন্দু হও, খ্রীষ্টান হও, মুসলমান হও, মনে রাখিও তুমি বাঙ্গালী, তুমি মনে প্রাণে বাঙ্গালী······রাজা ম্লেচ্ছ, রাজা বিদেশী, তোমাকে ম্লেচ্ছের আচাব ত্যাগ করিতে হইবে। তোমাকে বিদেশী ভাব ত্যাগ কবিতে হইবে, তোমাকে মনে প্রাণে স্বদেশী হইতে হইবে।'

সন্ধ্যার ভাষা ছিল নিদারুণ স্বদেশী, গ্রাম্য ও শক্তিশালী। শৈশবে ঠাকুরমার মুখে যে সব ছড়া ও প্রবাদবাক্য শুনিয়াছিলেন তাহাই জাতির অভিজ্ঞতা রূপে তিনি দেশবাসীকে শুনাইলেন। দেশের যুগ যুগান্তের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত ছিল এই

সব প্রবাদবাক্যের মধ্যে। অতি পুরাতন সত্যকে নূতন আবরণে, নূতন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া দেশবাসীকে শুনাইলেন।

কিছুকাল পূর্ব হইতে বাংলার বহুদূরে ভারতের পশ্চিম প্রান্তে এক খণ্ড অসন্তোষের মেঘ জমিয়াছিল। প্লেগের সময় পুণায় খুব অত্যাচার চলিয়াছিল, সেই অত্যাচারের প্রতিবাদ করায় গণেশ চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়ের ফাঁসী হয়। বাল গঙ্গাধর তিলক তখন মহারাষ্ট্র দেশে ব্রিটিশ বিদ্বেষ প্রচার করিতে-ছিলেন। অরবিন্দ ঘোষ "ভবানী মন্দির" স্থাপনের জন্য তাঁহার বিশ্বাসী কর্মী যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাংলা দেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ব্যারিষ্টার পি, মিত্র "অনুশীলন সমিতি" নাম দিয়া বিপ্লবের বার্তা প্রচার করিতেছিলেন। তখন "সন্ধ্যা" প্রকাশিত হইল।

লর্ড কার্জন ১৯০৫ সালে বঙ্গ বিচ্ছেদ করিলেন। বাঙ্গালী দ্বিধাবিভক্ত হইতে অস্বীকার করিল। বাঙ্গালীর আবেদন-নিবেদন সমস্তই ব্যর্থ হইল। বাঙ্গালী তখন ইংরেজকে আঘাত করিবার জন্য নূতন পন্থা আবিষ্কার করিল। বণিক্ ইংরেজের বাণিজ্যের প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিল। "বিদেশী বর্জন, স্বদেশী গ্রহণ"—পন্থা, "বন্দেমাতরম্" - মন্ত্র —এই দুই পন্থা ও মন্ত্র মিলিয়া ভারতবর্ষকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। ব্রহ্মবান্ধব এই বঙ্গ-বিচ্ছেদকে কেন্দ্র করিয়া "সন্ধ্যায়" আহ্বান করিলেন—"আয় বৎস আপন ঘরে ফিরে আয়"। শিক্ষিত সম্প্রদায়কে আহ্বান করিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, সুরেন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ, সুরেশ সমাজপতি; ব্রহ্মবান্ধব আহ্বান করিলেন, জনসাধারণকে।

মুদী, দোকানী, গোমস্তা, তহশীলদার ফেরিওয়ালা—"সন্ধ্যায়" লিখিত ও সন্ধ্যাবেলায় প্রকাশিত গ্রাম্য ছড়া, গান, রূপকথা, হেঁয়ালি, অপভাষা, উপভাষা পড়িয়া ভাবিত—এই ত আমাদেরই ভাষা, আমাদেরই জন্য লেখা। ইহার মধ্যে ছিল ঝাল, মিষ্টি, নোন্তা, টক্—যাহার যেমন রুচি, সে দেখিত তাহার রুচি অনুযায়ী রস পরিবেশন করা হইয়াছে। যেখানে কোন অত্যাচার হইয়াছে সেখানে অত্যাচারীদের পক্ষ সমর্থন করিয়া "সন্ধ্যার" সন্ন্যাসী প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। বার্ণ কোম্পানীর কেরাণী ধর্মঘট করিলে "সন্ধ্যাই" তাহাদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিল। রেল ধর্মঘটের সময়, ছাপাখানার ধর্মঘটের সময় অত্যাচারীদের পক্ষ সমর্থন করিয়া তিনি তীব্র ভাষায় বণিকদিগকে আঘাত করিতে লাগিলেন। বণিকদিগের সমর্থক ইংরেজ সরকার; বণিককে আঘাত করা অর্থ ইংরেজকে আঘাত করা। ইহার পূর্বে খুব অল্প লোকই এইরূপ স্পষ্টভাষায় ইংরেজকে প্রত্যক্ষ আঘাত করিয়াছে। নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে আঘাত করিয়াছিলেন দীনবন্ধু মিত্র "নীলদর্পণে"; হরিশ সরকার করিয়াছিলেন "হিন্দু পেট্রিয়টে" ফলে তাঁহারা অমানুষিক নির্যাতন ভোগ করিয়াছিলেন। বিগত শতাব্দীতে বঙ্কিমের আঘাত ছিল পরোক্ষ, তাহা শিক্ষিত সম্প্রদায়কে চঞ্চল করিয়াছিল। কিন্তু ব্রহ্মবান্ধবের আঘাত দেশের আপামর সকলকেই—ইতর-ভদ্র শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলকেই চঞ্চল করিয়া তুলিল।

"সন্ধ্যা" পত্রিকার বিশেষত্ব ছিল লেখার পশ্চাতে প্রাণের

স্পন্দন, পাঠকের সঙ্গে লেখকের সমবেদনা, প্রকাশের নূতন ভঙ্গিমা। ব্রহ্মবান্ধব তাঁহার পত্রিকাকে ধর্ম্মের উন্মাদনা লইয়া ভগবানের চরণে, দেশের চরণে নিবেদন করিতেন বলিয়াই উহার মধ্যে সকল বাঙ্গালী প্রাণের স্পন্দন অনুভব করিত। বাঙ্গালী "সন্ধ্যা" পত্রিকাকে আপনার নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়া শ্রদ্ধা করিত; অসময়ের আশ্রয়স্থল বিবেচনা করিত। বরিশাল, কৃষ্ণনগর, ঢাকা, নোয়াখালী প্রভৃতি স্থানে ছাত্রগণ বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদের শাস্তি স্বরূপ স্কুল কলেজ হইতে বিতাড়িত হইল, সঙ্গে সঙ্গে পিতৃগৃহেও তাড়না খাইয়া কলিকায় আসিল।

স্কুল-বিতাড়িত, গৃহ-বিচ্যুত যুবকগণ "সন্ধ্যার" আফিসে আশ্রয় গ্রহণ করিল। ব্রহ্মবান্ধব ব্রহ্মচারী মানুষ, তাঁহার গৃহ নাই, আত্মীয় নাই কোন ব্যবস্থা নাই—তবু এই গৃহহীনের গৃহের আশ্রয়টুকু তাহারা স্বচ্ছন্দমনে গ্রহণ করিল। প্রতিদিন দুইবেলা প্রায় এক শত লোক সেখানে ডালভাত, শাকান্ন গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত হইত—কারণ সেখানে সন্ন্যাসীর যজ্ঞকুণ্ড, যাহা কিছু আহুতি দেওয়া হয় তাহাই ভগবানের চরণে নিবেদিত। বঙ্কিমের আনন্দমঠ যেন সত্যই "সন্ধ্যার" গৃহতলে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় "সন্ধ্যার" কুটীরে দেশমাতৃকার পূজা সমারোহে সম্পন্ন হয়। সে পূজায় ফুল বেলপাতার প্রয়োজন হয় না। সেখানে ভক্তির অর্ঘ্য।

নূতন কাজের আহ্বানে সারস্বত আয়তনের ভার এক বন্ধুর উপর ন্যস্ত করিয়া তিনি সম্পূর্ণ ভাবে "সন্ধ্যা"র সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। মনে হইল যেন ভবানীচরণ

শ্রীভগবানের দর্শন লাভের আশায় সমস্ত তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে তাঁহার ঈপ্সিত বিগ্রহের সন্ধান লাভ করিয়াছেন—সেই বিগ্রহের সেবায় নিজেকে নিঃস্ব করিয়া নিবেদন করিলেন। স্বদেশের যাহা কিছু সবই ভাল এবং সব জিনিষেরই একটি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিলেন। তাঁহার সারস্বত আশ্রমে শ্রীসরস্বতীর পূজা অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল, জন্মাষ্টমীতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি উৎসব হইল—'কলির পাপ' ইংরেজ বিনাশনে শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন চক্রের যে অত্যন্ত প্রয়োজন! হিন্দুগণ ব্রহ্মবান্ধব যে খৃষ্টান তাহা ভুলিয়া গেল, ক্যাথলিক খৃষ্টানগণ ব্রহ্মবান্ধবকে ত্যাগ করিয়া গেল। তাঁহার আশ্রমের ভার লইলেন পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ।

ব্রহ্মবান্ধব উৎসাহিত হইয়া "করালী" নামক একখানি অর্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন, উহা "সন্ধ্যার"ই নব-সংস্করণ। উহাতে হিন্দুর দেবী "কালী"র করালী রূপ, উহার ইঙ্গিত খুব স্পষ্ট। তারপর বাহির করিলেন "স্বরাজ" পত্রিকা ১৯০৭ সালে। উহাতে রহিয়াছে ধর্মের আহ্বান, রাজনীতির উচ্ছ্বাসের অন্তঃস্থলে তাঁহার অবচেতন মনে রহিয়াছে একটি গভীর ভগবৎ অনুভূতি। এই ভগবৎ অনুভূতির আভাস "স্বরাজ" পত্রিকায় ফুটিয়া উঠিল।

বঙ্গভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা দেশে বিপ্লবাত্মক কর্ম-ধারা চলিয়াছিল। ঢাকায় পি, মিত্র মহাশয় পুলিন দাসের সহযোগে, মেদিনীপুরে সত্যেন বসুর চেষ্টায়, কলিকাতায়

বারীন্দ্র, উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির যত্নে বিপ্লবের কার্যাবলী জোরের সহিত চলিতেছিল। তখন বাঙ্গালীর মন বেশ চঞ্চল। "রাখী বন্ধন" উৎসবের মধ্য দিয়া বিভক্ত বাঙ্গালীর ঐক্যসূত্র স্থাপিত হইল—৩০শে আশ্বিন বঙ্গভঙ্গের দিনে বাঙ্গালীর ঘরে অরন্ধন ও উপবাস। দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গীত "বঙ্গ আমার জননী আমার", রবীন্দ্রনাথের "বাংলার মাটি বাংলার জল" বাঙ্গালীকে এক নবীন প্রেরণা দিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দেমাতরম্" নূতন প্রাণশক্তি লাভ করিয়া বাংলাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিল। সমস্ত ভারতবর্ষে তখন নূতন জাগরণের স্পন্দন চলিয়াছে। বিপিন পাল মহাশয় প্রকাশ করিলেন—New India. সে পত্রিকা শ্রীঅরবিন্দের হাতে আসিয়া রূপান্তরিত হইল "বন্দেমাতরম্"। অন্যদিকে বিবেকানন্দের ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সম্পাদনায় বাহির হইল "যুগান্তর"। বাংলার বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের প্রতিধ্বনি হইল সুদূর পশ্চিমে পুণার "কেশরী" গর্জনে। • •

চিন্তার দিক দিয়া যেমন বিপ্লব পুস্তকে, গানে, পত্রিকায়, বক্তৃতায় প্রচারিত হইতে লাগিল, তেমনি কর্মের দিক দিয়া বিপ্লবাত্মক সমিতি গঠিত হইতে লাগিল। সেই সব সমিতিতে তলোয়ার, ছোরা, লাঠি খেলা শিক্ষা দেওয়া হইত। আর একটু উপরের স্তরে বন্দুক, পিস্তল ছোড়া এবং বোমা তৈয়ার বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইত। মাণিকতলা বাগানে শ্রীঅরবিন্দের ভ্রাতা, বারীন্দ্র ঘোষের তত্বাবধানে বোমার কারখানা স্থাপিত হইল। সমস্ত বাংলা দেশ বিপ্লবের সুরে উদ্বুদ্ধ হইয়া

উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে স্থাপিত হইল বরিশালে "স্বদেশ-বান্ধব সমিতি", ফরিদপুরে "ব্রতী-সমিতি", মৈমনসিংহে "সাধারণ-সমিতি", নোয়াখালিতে "সুহৃদ-সমিতি"—প্রায় প্রত্যেক সহরেই অনুশীলন সমিতির শাখা বিভিন্ন নামে স্থাপিত হইল।

মুকুন্দ দাস যাত্রাগানের মধ্য দিয়া "মাতৃপূজা" নামে স্বদেশী প্রচার করিতে লাগিলেন। "রাম রহিম না জুদা কর্ ভাই মনটা খাঁটি রাখো জী", "সাবধান, সাবধান, নামিয়া আসিছে ন্যায়ের দণ্ড, রুদ্র দীপ্ত মূর্তিমান"-গানগুলি তখন বাংলা দেশকে মাতাইয়া তুলিয়াছে। এই স্বদেশী প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ গঠনের চেষ্টাও চলিতে লাগিল—বরিশালের অশ্বিনী দত্ত ও জগদীশ মুখোপাধ্যায়, আরাবালিয়র হেড্মাষ্টার সুরেন সেন, কলিকাতার শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, "সন্ধ্যার" ব্রহ্মবান্ধব রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে চরিত্র গঠন এবং ব্রহ্মচর্য-ধারণকে প্রধান অঙ্গ বলিয়া বিবেচনা করিলেন। তাহারাই দেশমাতার পূজার অধিকারী যাহারা চরিত্রবলে ব্রাহ্মণ। চরিত্রবান যুবক সম্প্রদায় মাটসিনি, গারিবল্ডীর জীবনী পাঠ করিয়া স্বদেশের মুক্তির জন্য যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিল; মারাঠা বীর শিবাজীর জীবনী পাঠ করিয়া গরিলা যুদ্ধের সিদ্ধান্ত করিল; বঙ্কিমের আনন্দমঠ পাঠ করিয়া সন্ন্যাসীর ত্যাগমন্ত্র গ্রহণ করিল।

বারীন্দ্র ঘোষের অধিনায়কত্বে মাণিকতলার বাগানে বোমার কারখানা স্থাপিত হইল। উল্লাসকর দত্ত প্রেসিডেন্সি কলেজ পরীক্ষাগারে এক অদ্ভুত শক্তিশালী বোমা আবিষ্কার করিলেন।

মাণিকতলার বাগানে সন্ন্যাসী বেশে উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল প্রভৃতি বহু দেশপ্রাণ, উন্নতমনা গরিলা যুদ্ধের পরিকল্পনা লইয়া ইংরেজ-মারণ যজ্ঞে আত্মনিবেদন করিলেন। বিপ্লবের মত ও পথকে সমর্থন করিয়া বন্দেমাতরম্, যুগান্তর, নবশক্তি ও সন্ধ্যা জনসাধারণকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। ফলে প্রথমেই যুগান্তরের উপর রাজরোষ পড়িল। সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত রাজবিদ্রোহের অপরাধে ধৃত হইলেন। তিনি কিংসফোর্ড সাহেবের আদালতে প্রকাশ্যে বলিলেন—"আমি দুঃখিনী বঙ্গভূমির জন্য যাহা কর্ত্তব্য বুঝিয়াছি তাহাই করিয়াছি, এক্ষণে আপনার যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন।" ভূপেন্দ্রনাথ এক বৎসর কারাদণ্ড লাভ করিলেন। কিন্তু তাঁহার এই নির্ভীক ও স্পষ্ট উক্তি দেশবাসীর অন্তরে নূতন উদ্দীপনা সঞ্চার করিল।

মাণিকতলার বোমার ব্যাপারে ব্রহ্মবান্ধব ছিলেন মন্ত্রগুরু, তিনি প্রতিটি কার্যের সূক্ষ্ম তত্ব অবগত ছিলেন। সন্ধ্যা পত্রিকায় বিপ্লবী প্রচেষ্টা সমর্থন করিয়া তিনি যুবকদের মনে ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করিতেন। তাঁহার ভাষায় ছিল ইঙ্গিত, স্পষ্ট করিয়া কিছুই বলিতেন না। অথচ তাঁহার আভাষ ইঙ্গিত মনকে বিষাক্ত করিয়া তুলিত। এই সময়ে বাংলা দেশে "শিবাজী" উৎসব সমারোহে অনুষ্ঠিত হইল। দেশমাতৃকাকে সিংহবাহিনী রণচণ্ডী কল্পনা করা হইল। সেই মূর্তির চরণে মহারাষ্ট্র বীর শিবাজী তাঁহার অসি অর্ঘ্য প্রদান করিয়া বর প্রার্থনা করিতে-ছেন। পূজা, হোম, যজ্ঞ ইত্যাদি বৈদিক বিধি অনুসারে

দেশমাতার অর্চনা করা হইল। এই উপলক্ষে কথকতা, বক্তৃতা, প্রদর্শনী, আমোদ-প্রমোদ করিয়া বাঙ্গালী জাতি এক অপূর্ব উন্মাদনা অনুভব করিল। পুণা হইতে বালগঙ্গাধর তিলক, অমরাবতী হইতে খাপারদে, নাগপুর হইতে ডাঃ মুঞ্জে আসিয়া উৎসবের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিলেন। ব্রহ্মবান্ধব ইহার কিছুকাল পরে বন্দেমাতরম মন্ত্রের উদ্গাতা ঋষি বঙ্কিমের তিরোভাব উৎসব সম্পন্ন করিলেন তাঁহার জন্মভূমি কাঁঠাল-পাড়ায়। সেই উপলক্ষে আবার দেশমাতৃকার পূজা-উৎসব অনুষ্ঠিত হইল।

ব্রিটিশ সরকার ব্রহ্মবান্ধবকে প্রায় বাতুল বলিয়া উপেক্ষা করিত। তাঁহার ধর্মপরিবর্ত্তন, বিদেশভ্রমণ, বক্তৃতা, সংবাদ-পত্রের সম্পাদকতার মধ্যে অস্থির-চিত্ততার আভাস লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে অবহেলা করিত। "সন্ধ্যায়" প্রকাশিত প্রবন্ধ টিপ্পনীগুলি মুখরোচক জনপ্রিয় সম্পাদকীয় বিন্যাস বলিয়া ব্রিটিশ রাজপুরুষগণ বিশেষ মনোযোগ দেন নাই। কিন্তু শিবাজী উৎসব, বঙ্কিমোৎসব হইল বৈশাখ মাসে। ভাদ্র মাসেই সন্ধ্যা পত্রিকায় প্রকাশিত "এখন ঠেকেছি প্রেমের দায়ে" "ছিদিসানের হুড়ুম গুড়ুম, ফিরিঙ্গীর আক্কেল গুড়ুম" "বোচকাসকল নিয়ে যাচ্ছেন শ্রীবৃন্দাবন"-প্রকাশের জন্য রাজদ্রোহের অপরাধে সন্ধ্যা পত্রিকার আফিস খানাতল্লাস হইল। ব্রহ্মবান্ধব উপস্থিত ছিলেন না, তাঁহার কর্মকর্তাকে গ্রেপ্তার করা হইল। ব্রহ্মবান্ধব এই সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তারের জন্য পুলিসকে খবর দিলেন। পুলিশ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিল,

৭ই ভাদ্র ১৩১৪ সাল! জামিনে তিনি মুক্তিলাভ করিলেন।

ব্রহ্মবান্ধব গৈরিক বসন পরিহিত সন্ন্যাসী। পাপাশ্রয়ী ইংরেজের আদালতে পুণ্যবাস গৈরিক বসন পরিধান করিয়া উপস্থিত হইলে উহার অপমান করা হইবে। সুতরাং তিনি সে সন্ন্যাসীর বেশ পরিত্যাগ করিবেন স্থির করিলেন। আবার হিন্দু হইয়া ব্রাহ্মণের উপবীত গ্রহণ করিবেন। ভাটপাড়ার পণ্ডিত পঞ্চানন তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট বিধান নিলেন। পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন—"আপনার মতন সাধুরা সর্বদাই শুচি অবস্থায় আছেন, আপনাদের প্রায়শ্চিত্ত না করিলেও ক্ষতি নাই। আপনি গঙ্গাস্নানের পর পাঁচটি কড়ি গঙ্গায় ফেলিয়া দিয়া মনে মনে বলিবেন..... আমি হিন্দু ধর্মের বাহিরে কোন কাজ করিব না।" মহালয়ার পুণ্য দিনে ব্রহ্মবান্ধব প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া আবার শ্রীভবানী বন্দ্যোপাধ্যায় নাম গ্রহণ করিলেন। ব্রহ্মবান্ধবের হিন্দুধর্মে প্রত্যাবর্ত্তনে অনেক ইংরেজী শিক্ষিত নব্য তন্ত্রের যুবক এক নূতন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিল।

যজ্ঞোপবীত পরিহিত ব্রাহ্মণতনয় শ্রীমান ভবানীচরণ দুর্ধর্ষ কিংসফোর্ড সাহেবের আদালতে উপস্থিত হইবার সময় এক কৌতুক সৃষ্টি করিতে সিদ্ধান্ত করিলেন। ভবানীচরণ অপর আসামী সন্ধ্যা পত্রিকার মুদ্রাকরকে মাল্যচন্দনে বিভূষিত করিয়া বর বেশ পরিধান করাইয়া শিবিকারোহণ করাইলেন, স্বয়ং পুরোহিতের বেশে শ্বেতচন্দন ললাটে মাখিয়া রেশমবস্ত্র

পরিধান করিয়া গলদেশে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিলেন। সঙ্গে লইলেন বহু শিষ্যভক্ত, ঢাক, ঢোল' ব্যাণ্ড প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র। তিনি চলিয়াছেন কলিকাতার প্রকাশ্য রাজপথে, কিংসফোর্ড সাহেবের এজলাসে যেন আজ বিবাহ দিনের শোভাযাত্রা। পথ চলিতে চলিতে সহস্র সহস্র দর্শক জনতার সঙ্গে বরানুগমন করিল। গৃহতল হইতে পুষ্প ও মাল্য বর্ষিত হইতে লাগিল, শঙ্খ নিনাদ ও উলু ধ্বনিতে সমস্ত পথ মুখরিত হইল। আদালতে উপস্থিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাঙ্গণ জনাকীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কিংসফোর্ড আদালতে উপস্থিত হইয়া ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইলেন—পুলিশের দল হতভম্ব, তাহারাও ব্রাহ্মণের এই রসিকতায় কৌতুক বোধ করিলেন। প্রকাশ্য আদালত, সকলেরই অধিকার আছে আদালতে উপস্থিত হইবার ; সুতরাং পুলিশ বাধা দিতে পারিল না। সেদিন আদালতের কাজ বন্ধ রহিল। কিংসফোর্ড সাহেব তিক্তকণ্ঠে বলিলেন—"এই ব্রাহ্মণ তাহার ধৃষ্টতার জন্য উপযুক্ত শাস্তি পাইবে।" পুরোহিতবেশী ব্রাহ্মণতনয় যজ্ঞোপবীত উত্তোলন করিয়া বলিলেন—"বেটা ফিরিঙ্গীর সাধ্য কি যে ব্রাহ্মণকে শাস্তি দেয় ?"

আদালত হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি পেটে অসহ্য বেদনা অনুভব করিলেন। কারণ তাঁহার অন্ত্রবৃদ্ধি (হার্ণিয়া) রোগ ছিল। আদালতে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া সেই বেদনার প্রকোপ বৃদ্ধি পাইল। ক্যাম্‌বেল হাঁসপাতালে অস্ত্রোপচার করা হইল। কিন্তু হঠাৎ ২ দিন পরে তিনি হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া দেহত্যাগ করিলেন। সত্যই ব্রাহ্মণ সন্তানকে

ফিরিঙ্গী বিচারক স্পর্শ করিতে পারে নাই জানিয়া দলে দলে লোক পুণ্যদর্শনের আশায় হাসপাতালে উপস্থিত হইল। তাঁহার পুণ্যদেহ স্পর্শ করিবার জন্য লোকের কি আকুল আগ্রহ! শবাধার বহন করিয়া সহস্র সহস্র নাগরিক নিমতলা ঘাটের দিকে চলিল। কলিকাতার জনপথে সেদিন কি বিষম উদ্দীপনা! দুই পার্শ্বে অগণিত নরনারীর সমাবেশ—গৃহতল হইতে কুল-ললনা শঙ্খধ্বনি সহকারে পুষ্প অর্ঘ্য দান করিয়া অভ্যর্থনা জানাইল—যেন সত্য ব্রাহ্মণ কুমার বরবেশে যাত্রা করিয়াছেন ; এ যাত্রা আর কৌতুকের নয়, অতি তীব্র সত্য। কলিকাতার বিখ্যাত জননেতা বিপিন পাল, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, সুরেশ সমাজপতি, পাঁচকড়ি বন্দ্যো-পাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অরবিন্দ ঘোষ সকলেই শবানুগমন করিলেন। ঘৃত ও চন্দনকাষ্ঠের সজ্জিত চিতায় ব্রহ্মবান্ধবের নশ্বর দেহ স্থাপিত করা হইল। অযুত কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠিল বিপ্লবের বাণী “বন্দেমাতরম্”।

---

১৮৭২ খৃঃ অব্দ—

বিপ্লববাদী বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝি, শ্রীঅরবিন্দ সেইরূপ সন্ত্রাসবাদী, একমাত্র অস্ত্র-শস্ত্রে বিশ্বাসী বিপ্লবী ছিলেন না। তাঁহার মন্ত্র ছিল—"অন্য লোকে স্বদেশকে একটা জড় পদার্থ, কতগুলি মাঠ, ক্ষেত্র, বন, পর্ব্বত, নদী বলিয়া জানে; আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি, ভক্তি করি, পূজা করি······"। শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার "সাধনার পথ" নামক প্রবন্ধে দেশবাসীকে উদাত্তকণ্ঠে আহ্বান করিলেন, "হে ক্ষুদ্র, হে ক্লান্ত, হে বিমুখ, তুমি বোধ হয় ভগবানকে চাও না, আজ যে তিনি তোমার দ্বারে ভিখারীরূপে দণ্ডায়মান—স্বদেশের মূর্ত্তি ধরিয়া সেবামাত্র চাহিতেছেন।" জীবনের শেষ অধ্যায়ে

শ্রীঅরবিন্দ সংকল্প করিলেন—"প্রাচীন ভারতের মানব সত্তার শ্রেষ্ঠতম বিকাশ হইয়াছিল, ভাবী ভারতের মানব সত্তার দিব্য বিকাশ সম্ভাবনা হইবে।" ইহার জন্যই পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দ সাধনায় নিমগ্ন। যোগী শ্রীঅরবিন্দ পৃথিবীর সমগ্র মানব-জাতিকে মানবতার এক স্তরে উন্নীত করিবার জন্য ধ্যানে নিমগ্ন। আজ একমাত্র ভারতের স্বাধীনতাই তাঁহার কাম্য নয়। তিনি বিশ্বমানবের জন্য নূতন পৃথিবীর পরিকল্পনা করিতেছেন। তাঁহার কল্পনা মূর্ত করিবার জন্য তিনি আজ বিশ্বব্যাপী নূতন বিপ্লবের সূচনা করিয়াছেন।

শ্রীঅরবিন্দের জীবন একখানি নাটক। সেই নাটকে চারিটি অঙ্ক।

প্রথম অঙ্ক—ভারতের বাহিরে ইংলণ্ডে শিক্ষাজীবন—১৮৭২-১৮৯৩ ;

দ্বিতীয় অঙ্ক—বাংলার বাহিরে বরোদায় কর্মজীবন—১৮৯৩-১৯০৬ ;

তৃতীয় অঙ্ক—বাংলা দেশে রাষ্ট্রনীতির আবর্তে—১৯০৬-১৯১০ ;

চতুর্থ অঙ্ক—ফরাসী পণ্ডিচেরীতে সাধনজীবন—১৯১০....। জীবনের প্রত্যেক অঙ্কেই যেন কেহ তাঁহার জন্য পূর্বাহ্ণে ঘটনাবলী কল্পনা করিয়াছেন, দৃশ্যের পর দৃশ্য নেপথ্যে রচনা করিয়াছেন ; শ্রীঅরবিন্দ সেই নাটকের অভিনেতা মাত্র।

শ্রীঅরবিন্দ ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বাংলা দেশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষ, মাতামহ রাজনারায়ণ বসু।

পিতা ছিলেন আই, এম, এস ডাক্তার—সম্পূর্ণ বিদেশী সভ্যতায় সমুজ্জ্বল, অথচ শিশুর মত সরল, শিবিরাজার মত দয়াবান। মাতামহ রাজনারায়ণ বসু নিষ্কাম দেশপ্রেমিক ছিলেন। ১৮৬১ সালে তিনি "জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী" নামে এক সভা প্রতিষ্ঠা করেন। এই সভার শাখা বাংলার প্রত্যেক জেলায় স্থাপিত হয়। ১৮৬৭ সালে রাজনারায়ণ কয়েকজন বন্ধু সহ "হিন্দু মেলা" স্থাপন করিয়া স্বদেশী শিল্প প্রচারের চেষ্টা করেন। সেই যুগে তিনি জাতীয় আন্দোলন প্রবর্তন করিয়াছিলেন, স্বদেশী গ্রহণের জন্য দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে আমরা পিতৃ-মাতৃ উভয় কুলের প্রভাব দেখিতে পাই।

পিতা ডাঃ কে, ডি, ঘোষের ইউরোপীয় শিক্ষার উপর এত বেশী শ্রদ্ধা ছিল যে, তিনি ১৮৭৯খৃঃ অব্দে সস্ত্রীক ও তিন পুত্র বিনয়কুমার, মনোমোহন ও অরবিন্দকে সঙ্গে লইয়া বিলাতে যান্। পথে সমুদ্রবক্ষে ইংলণ্ডে জাহাজ পৌছিবার পূর্বে বারীন্দ্রকুমারের জন্ম হয়। শ্রীঅরবিন্দের বয়স তখন মাত্র সাত বৎসর। প্রথমে শ্রীঅরবিন্দ মান্চেষ্টারে এক ইংরেজ পরিবারে বাস করিতেন। ইংরেজ পরিবারে বাল্যজীবন যাপন করিয়া তিনি ইংরেজের জীবনযাত্রার সঙ্গে সবিশেষ পরিচয়ের সুযোগ লাভ করেন। তের বৎসর বয়সে তিনি লণ্ডনের সেণ্ট্ পলস্ স্কুলে প্রবেশ করেন। আঠার বৎসর বয়সে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করেন এবং কিংস্ কলেজে যোগদান করেন।

আঠার বৎসর বয়সেই তিনি আই, সি, এস, পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। বিশ বৎসর বয়সে কেম্বি্রজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সর্বাপেক্ষা কঠিন পরীক্ষায় কৃতকার্য হন। তিনি গ্রীক ও লাটিন পরীক্ষায় যত নম্বর পাইয়াছিলেন তাহা আর কেহ ইতিপূর্বে পায় নাই। এই দুই বৎসর তিনি কেম্বি্রজে আই, সি, এস-এর শিক্ষানবিশী করেন। এই সময়ে তিনি গ্রীক, লাটিন, ফরাসী জার্মাণ, ইতালীয় ভাষায় অদ্ভুত পার-দর্শিতা লাভ করেন। সর্বশেষ পরীক্ষার সময় অশ্বচালনা পরীক্ষা দিতে তিনি অস্বীকার করেন; কাহারও মতে অরবিন্দ এই পরীক্ষায় অকৃতকার্য হন। শ্রীযুক্ত চারু দত্ত আই, সি, এস মহাশয় বলেন যে, তিনি পরীক্ষায় উপস্থিত হন নাই। সুতরাং সফলতা বা বিফলতার কথা আসে না। যাই হউক আই, সি, এস তিনি হন নাই এই কথা সত্য। ভারতের তিন জন মহাগুণী লোক আই, সি, না হইয়া দেশকে সমুজ্জ্বল করিয়াছেন—সুরেন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, সুভাষ। সুরেন্দ্রনাথ রাষ্ট্রগুরু, অরবিন্দ জ্ঞানগুরু, সুভাষ কর্মগুরু।

আই সি, এস, পরীক্ষার শেষ অধ্যায়ে শ্রীঅরবিন্দের এই প্রকার আচরণে অনেক ভারতবাসী একটু আশ্চর্য হন। এই সময়ে বরোদার মহারাজা সয়াজী রাও লণ্ডনে ছিলেন। তিনি অরবিন্দের আশ্চর্য মেধা ও প্রতিভার কাহিনী শুনিয়া-ছিলেন। একদা শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ উপলক্ষে তিনি তাঁহাকে বরোদা রাজ্যে সিভিল সার্ভিসে যোগ দিতে অনুরোধ

করেন। প্রথম কয়েক মাস তিনি গায়কোয়াড়েব ব্যক্তিগত কর্মসচিব রূপে কাজ কবেন। তাবপব তাঁহারই সঙ্গে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন সয়াজী রাওয়েব বয়স তেইশ বৎসর, শ্রীঅরবিন্দের একুশ বৎসব।

প্রথমতঃ ইংলণ্ডে বাসেব সুযোগে ইংরাজ জাতি, ইংরাজ মনীষা ও ইউবোপীয় সভ্যতাব সঙ্গে শ্রীঅববিন্দেব গভীব পরিচয় হয়। ইংবাজ মনীষীদেব সঙ্গে ব্যক্তিগত সান্নিধ্য লাভ কবিয়া তিনি ব্যক্তিগত মনীষা স্ফুবণের সুযোগ লাভ কবেন। ভবিষ্যৎ জীবনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতাব তুলনামূলক সমালোচনা কবিয়া তিনি উভয় সভ্যতাব অপরূপ সমন্বয় কবিতে পাবিয়াছেন। ইউবোপীয় বাজনীতির ছল-চাতুবী খেলা উনবিংশ শতাব্দীব শেষভাগে তাঁহাব চোখেব উপব দিয়াই চলিয়াছিল। সে দৃশ্য তাঁহাব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়াছিল। ইউরোপীয় সমাজনীতি ও বাজনীতির সঙ্গে গভীর পবিচয় তাঁহাব ভবিষ্যৎ কর্মধাবা নির্ণয়ে সাহায্য করিয়াছিল।

ববোদা রাজ্যে আসিয়া প্রথমে শ্রীঅববিন্দ ভূমি-ব্যবস্থা বিভাগে, পবে বাজস্ব বিভাগে কাজ কবেন। কাজটি তাঁহার মনোমত না হওয়ায় তিনি অধ্যাপকেব কাজ গ্রহণ কবেন। প্রথমে তিনি সাহিত্যেব অধ্যাপনা করেন। পরে কলেজের সহকারী অধ্যক্ষেব কাজ করেন। যদিও তিনি শিক্ষা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তবু মহারাজা সয়াজী রাও বহু বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। মহারাজা তাঁহার সহিত অন্যান্য

কর্মচারীর ন্যায় ব্যবহার করিতেন না। তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া একসঙ্গে আহার করিতেন এবং বন্ধুর ন্যায় আলাপ-আলোচনা করিতেন।

দশ বৎসর শ্রীঅরবিন্দ বরোদায় বাস করিয়াছেন। এই দশ বৎসর তাঁহার রত্ন আহরণের যুগ। এই সময়ে তিনি ভারতীয় কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, ধর্মশাস্ত্র, উপনিষদ্ প্রভৃতি বহু বিষয়ের গ্রন্থ আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন। প্রতি মাসে তাঁহার জন্য রেল পার্শেলে বহু পুস্তক আসিত। তিনি বরোদায় প্রায় এক সহস্র মুদ্রা বেতন পাইতেন। উহার অর্ধেকের বেশী ব্যয়িত হইত পুস্তক-মূল্যে। এই সময়ে তিনি মহাভারতের কয়েকটি উপাখ্যান ইংরেজী ভাষায় ও ছন্দে অনুবাদ করেন। মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত মহাভারতের কিয়দংশ অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং মহাভারতের অনুবাদকরূপে ইউরোপে তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। শ্রীঅরবিন্দের অনুবাদ পাঠ করিয়া রমেশচন্দ্র তাঁহাকে লিখিলেন—"তোমার এই সব কবিতা পাঠ করিয়া রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদে আমি কেন পণ্ডশ্রম করিয়াছি তাহা ভাবিয়া দুঃখ হইতেছে। তোমার এই কবিতা আমি আগে দেখিলে আমার লেখা কখনও ছাপাইতাম না। এখন মনে হইতেছে ছেলেখেলা করিয়াছি।" বরোদা বাসের সময়ে শ্রীঅরবিন্দের রচিত বহু কবিতা, নাটক, পদ্য, গদ্য, প্রবন্ধ, অনুবাদ পরে পুলিস নষ্ট করিয়া দিয়াছিল। শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার "কারা-কাহিনীতে" সেইগুলির জন্য বেশ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।

অথচ আশ্চর্য সংবাদ এই যে বরোদায় আসিবার সময় শ্রীঅরবিন্দ বাংলা ভাষা সম্বন্ধে প্রায় অনভিজ্ঞ ছিলেন। ভাল করিয়া বাংলায় কথাবার্তা বলিতেও পারিতেন না। তাঁহাকে বাংলা ভাষা শিক্ষা দেওয়ার জন্য সুলেখক দীনেন্দ্র-কুমার রায়কে আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। অচিরকাল মধ্যেই শ্রীঅরবিন্দ বাংলাভাষা আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন। তিনি "ভবানীস্তব", "ভবানীপূজা" নামক দুইখানি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। বিবেকানন্দের বাংলা রচনা শ্রীঅরবিন্দ অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তিনি বলিয়াছেন—"স্বামিজীর ভাষায় প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়, ভাষায় ভাবের এরূপ ঝঙ্কার, শক্তি ও তেজ অন্যত্র দুর্লভ।" রবীন্দ্র-কাব্যের উপর শ্রীঅরবিন্দের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল।

শ্রীঅরবিন্দের বরোদা-জীবন সম্বন্ধে দীনেন্দ্রকুমার রায় বলিয়াছেন, "তাঁহার গৃহ বিলাস বিবর্জিত, পরিচ্ছদ আড়ম্বর-বিহীন প্রাচ্য-দেশীয়, শয্যা অতি সাধারণ, আহারে মিতাচারের পরাকাষ্ঠা। মাঝে মাঝে তাঁহার সহধর্মিণী মৃণালিনী দেবী, ভগ্নী সরোজিনী ঘোষ, ভ্রাতা বারীন্দ্র বরোদায় বাস করিতেন। আত্মীয়-স্বজনকে তিনি খুব ভালবাসিতেন; কিন্তু সে ভালবাসা ছিল নিস্পৃহ বন্ধনহীন।"

শ্রীঅরবিন্দ ইতিহাস পাঠ ও আলোচনায় অত্যন্ত আগ্রহান্বিত ছিলেন। বিভিন্ন জাতির রাষ্ট্রনৈতিক বিবর্তন আলোচনা করিয়া তিনি অন্যান্য জাতির সঙ্গে ভারতের অবনতির কারণ অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করেন। জীবনের বিভিন্ন দিক

দিয়া উন্নতি কবিলেও ভাবতবাসীর বাজনীতি ক্ষেত্রে পরাধীনতা শ্রীঅরবিন্দকে চঞ্চল কবিয়া তুলিত। সুতবাং তিনি ভাবতের তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস ও উহাব কর্তৃপক্ষেব আদর্শ ও কার্যক্রম অভিনিবেশ সহকাবে লক্ষ্য কবিতেন। ইউবোপে অবস্থানকালে প্রাচীন গ্রীস, ইতালীব স্বাধীনতা লাভেব পন্থা, আযাবলণ্ডেব গুপ্ত সমিতিব কাযকলাপ, বাশিযাব নূতন মনস্তত্ব বিশেষ নিষ্ঠাব সঙ্গে পর্যালোচনা কবিতেন। শ্রীঅরবিন্দ প্রথম ভাবতবাসীব দৃষ্টি আকর্ষণ কবিলেন তাঁহাব বোম্বাইয়েব **"ইন্দুপ্রকাশ"** পত্রিকায় প্রকাশিত **"ইংরেজ জেল পরিচালনা"** প্রবন্ধ বচনা দ্বাবা। সেই প্রবন্ধ বড়লাট লর্ড এলগিন সাহেবেব দৃষ্টি আকর্ষণ কবে। বড়লাটেব অনুবোধে জাষ্টিস বাণাডে ববোদায় গিয়া শ্রীঅরবিন্দকে ভাবতীয় কাবাগাবেব তত্ত্বাবধানেব ভার লইতে বলেন। কিন্তু তিনি উহা প্রত্যাখ্যান কবেন।

এই সময়ে তিনি **"তরুণ সমিতি"** ( Youth League ) নামক একটি সঙ্ঘ স্থাপন করেন—উদ্দেশ্য যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে দেশসেবাব প্রবৃত্তি জাগ্রত কবিবেন। তারপর তিনি **"ইন্দু-প্রকাশ"** পত্রিকায় কংগ্রেসেব কার্যধারাব সমালোচনা করিয়া প্রবন্ধ লিখিলেন। তাহাতে কংগ্রেসেব দোষ-ক্রটীর বিচক্ষণ সমালোচনা পাঠ কবিয়া নবীন সম্প্রদায়েব মধ্যে বেশ একটা চাঞ্চল্যের আভাস দেখা দিল। তিনি ১৮৯৬ সালে পুণায় ঠাকুব সাহের প্রতিষ্ঠিত **"সিক্রেট সোসাইটি"** ( গুপ্ত সমিতিব ) সভাপতি হন। শ্রীঅরবিন্দ তাঁহাব "কাবাকাহিনীতে"

বলিয়াছেন যে—"১৮৯৬ সালে আমি ইন্দুপ্রকাশ পত্রিকায় কংগ্রেসেব নিবেদন-নীতিব তীব্র প্রতিবাদপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ কবিয়াছিলাম—"। সেই সময তিনি বাণাডের অনুবোধে কংগ্রেসেব প্রতিকূলতামূলক সমালোচনা লেখা হইতে বিরত হইলেন।

১৮৯৭ সালে মহাবাণী ভিক্টোবিযাব হীবক-জুবিলী উৎসব উপলক্ষে চাপেকাব ভ্রাতৃদ্বয ব্যাণ্ড ও মিঃ আয়ার্ষ্টকে হত্যা কবিলে তাঁহাদেব ফাঁসী হয। তাবপব তিলকেব পবামর্শ অনুযাযী পুণাব "গুপ্তসমিতি", অববিন্দেব "তরুণ সমিতি", এবং চাপেকাব ভাইদেব "হিন্দুধর্ম সঙ্ঘ" একসঙ্গে মিলিত হয। শ্রীঅববিন্দ উহাব সভাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত হন। তখনও তিনি রাজনীতির গতি পর্যবেক্ষণ কবিতেছিলেন। তিনি বুঝিযাছিলেন যে ভাবতকে পুনবায তাহাব প্রাচীন সত্বা ও পূব গৌবব লাভ কবিতে হইলে তাহাকে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ কবিতে হইবে। আবেদন-নিবেদনেব মধ্য দিযা বিজেতাব অনুগ্রহের উপব নির্ভব কবিয়া 'আংশিক বাজনৈতিক সুবিধা লাভ কবিলে চলিবে না। ভাবতেব স্বাধীনতা লাভেব জন্য ভাবতকে স্বাবলম্বী হইতে হইবে, অর্থনৈতিক 'ভিত্তি সুগঠিত কবিতে হইবে, স্বদেশী ব্যবহাবেব আন্দোলন কবিতে হইবে।

১৯০২ খৃঃ অব্দ হইতে ১৯০৩ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত তিনি নীরবে বরোদায় তাঁহাব কর্মপন্থা সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছিলেন। লর্ড কার্জন বাঙ্গালীর প্রতিভা, বুদ্ধি ও রাজনৈতিক চেতনাকে সংযত কবিবাব জন্য ১৯০৫ সালে বাংলার বিচ্ছেদ করিলেন।

মুসলমানপ্রধান পূর্ববঙ্গ ও আসাম লইয়া নূতন একটি প্রদেশ সৃষ্টি কবিলেন। মুসলমানকে হিন্দু-বিদ্বেষী করিবার জন্য রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তনেব চেষ্টা করিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতা হ্রাস করিয়া বাঙ্গালীর চিন্তা-স্বাধীনতাকে পঙ্গু করিবাব অপচেষ্টা করিলেন। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থের মধ্যে উচ্চ-নীচ ভেদ সৃষ্টি করিয়া বাঙ্গালীর মধ্যে গৃহবিবাদ সূচনা করিলেন। বাঙ্গালী তথা ভার াসী সকলেই লর্ড কার্জনেব প্রতি বিরক্ত হইয়া প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। লর্ড কার্জন এই আন্দোলনেব ভবিষ্যৎ মূর্তি কল্পনা কবিতে পাবেন নাই—অতি-বুদ্ধিমানও সময় বিশেষে ভীষণ মাবাত্মক ভুল করে।

শ্রীঅরবিন্দেব বাংলাদেশের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় খুব অল্প হইলেও বহুদিন-দৃষ্ট স্বপ্নের মত শৈশবের ক্রীড়াভূমির প্রতি তাঁহাব একটা প্রবল মোহ ছিল। বরোদার কর্মজীবনের সময় তিনি কলিকাতা, দেওঘব, ভাগলপুরে আসিয়াছিলেন। ভাগলপুর তখন বাংলার অধীন ছিল। বিবাহের সময় একবার বাংলা দেশে আসিয়াছিলেন। ইহার পূর্বে ১৯০২ সালে বরোদার রাজার দেহরক্ষী যতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভবানী মন্দির স্থাপনের জন্য তিনি সরলা দেবীর নিকট বাংলা দেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই যতীন্দ্রনাথ ১৯০২ সালে বাংলায় প্রথম গুপ্ত সমিতি স্থাপন করেন।

বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ স্বরূপ স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীঅরবিন্দ বরোদা ত্যাগ করিয়া

বাংলাদেশে তাঁহাব কর্মক্ষেত্র নির্ধাবণ কবিলেন। প্রথমে শ্রীঅরবিন্দ নব প্রতিষ্ঠিত জাতীয় শিক্ষা পবিষদে যোগদান কবেন এবং ন্যাশনাল কলেজে অধ্যক্ষেব পদ গ্রহণ কবেন। লর্ড কার্জন বিশ্ববিদ্যালয়কে সেক্রেটারিয়েটেব একটি অংশরূপে পবিণত কবিয়া শিক্ষালয়গুলিব স্বাধীনতা হবণেব চেষ্টা করেন। উহাবই প্রতিবাদস্বরূপ প্রতিষ্ঠিত হইল ন্যাশনাল কলেজ। সেই প্রতিষ্ঠানকে নব চিন্তাব কেন্দ্ররূপে পবিকল্পনা কবিয়া শিক্ষাব মধ্য দিয়া শ্রীঅববিন্দ জাতীয় আন্দোলন কবা স্থিব করেন, কিন্তু অল্প দিনেব মধ্যেই পবিষদের সঙ্গে তাঁহাব মতভেদ হইল—বিষয় ছাত্র ভর্তি। তখন ছাত্র পীড়নেব যুগ, অতি তুচ্ছ কাবণেও স্কুল-কলেজ হইতে ছাত্র বিতাড়িত হইত। শ্রীঅববিন্দ এ সমস্ত স্কুল-কলেজ-বিতাড়িত ছাত্রকে ভর্তি কবিতে ইচ্ছা কবেন। তাঁহাব মতে অতীত ভুলিয়া ছাত্র নূতন আবেষ্টনেব মধ্যে আসিলে নূতন জীবন লাভ কবিয়া নূতন আদর্শে উদ্বোধিত হইবে। কিন্তু স্বদেশীভাবাপন্ন হইলেও কলেজেব কর্তৃপক্ষ পুবাতন বীতি অনুসরণ করিয়া বাজনীতিকে জাতীয় শিক্ষা পবিষদেব আবহাওয়া হইতে দূবে বাখা স্থিব কবেন। সুতবাং তাঁহাবা নির্দেশ দিলেন—রাজনৈতিক কারণে বিতাড়িত ছাত্রগণকে ন্যাশনাল কলেজে স্থান দেওয়া হইবে না। এই মতান্তবকে কেন্দ্র কবিয়া শ্রীঅরবিন্দ অধ্যাপকেব পদ ত্যাগ কবেন। গ্রহণ ও বর্জন উভয়েব মধ্যে তাঁহার কোন আকর্ষণ ছিল না। অধ্যক্ষ-পদ যেমন সহজে গ্রহণ কবিয়াছিলেন তেমনি সহজে বর্জনও কবিয়াছিলেন।

এইবার তিনি তাঁহার জাতীয় আদর্শ প্রচারের জন্য **"বন্দে-মাতরম্"** নামক ইংরাজী সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া জাতিকে প্রেরণা দিতে আরম্ভ করেন। এবার সত্যই শ্রীঅরবিন্দ রাজনীতিতে প্রকাশ্যভাবে যোগদান করেন এবং দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এই সময়ে শ্রীঅরবিন্দ দেশকে একটি আদর্শের প্রতীক রূপে কল্পনা করিতেন, সেবা করিতেন—সত্যই তাঁহার চক্ষে দেশ ছিল—মাতা, তিনি সেই দেশ-মাতৃকার সেবক, সে দেশ শুধু বাংলা নয়, সমগ্র ভারতবর্ষ।

কংগ্রেস দলে তখন মধ্যপন্থীর প্রভাব। আবেদন-নিবেদনের মধ্য দিয়া ব্রিটীশ রাজপুরুষদের কৃপা-কটাক্ষ লাভ করিয়া দেশের উন্নতি করাই ছিল কংগ্রেস কর্মপন্থা। তাঁহারা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ব শাসনের উর্ধ্বে কিছুই চিন্তা করিতে পারিতেন না। সুতরাং পূর্ণ স্বাধীনতাকামী স্বার্থগন্ধহীন শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে মধ্যপন্থী কংগ্রেস নেতাদের মতান্তর ছিল অবশ্যম্ভাবী। শীঘ্রই মতান্তর মনান্তরে পর্যবসিত হইল, ফলে রাজপুরুষগণও শ্রীঅরবিন্দকে ব্যক্তিগত শত্রু, রাষ্ট্রের শত্রু, ব্রিটীশের শত্রু বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার জীবনে এবার সত্যই অগ্নিপরীক্ষা আরম্ভ হইল।

**বন্দেমাতরম্** পত্রিকার মধ্য দিয়া তিনি নূতন ভারতীয়তার বাণী প্রচার করিতে আরম্ভ করেন; নির্ভীক মতবাদ প্রচার করেন। ১৯০৬ সালে দাদাভাই নওরোজী **"স্বরাজ"** ভারতের আদর্শ বলিয়া ঘোষণা করিলেও স্বরাজ শব্দটির পূর্ণ ব্যাখ্যা করেন নাই। "স্বরাজের" অর্থ লইয়া বহুদিন বাগ্‌বিতণ্ডা চলিয়া-

ছিল। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ দ্বিধাহীনচিত্তে "স্বরাজের" অর্থ "পূর্ণ স্বাধীনতা" ঘোষণা করিলেন, এবং নির্ভীকভাবে স্বাধীনতার বাণী প্রচার আরম্ভ করেন।

রাজা সুবোধ মল্লিক "বন্দেমাতরম" প্রেস স্থাপন করেন। শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, বিপিনচন্দ্র পাল, উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি নবীন লেখকগণ এই স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই ভারতে ইংরেজী সংবাদপত্রের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় সৃষ্টি হইল। শ্রীঅরবিন্দ যেন তাঁহার রচনার মধ্য দিয়া নিজকে পরিপূর্ণ ভাবে বিকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সাধনা যেন মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া বন্দেমাতরমের মধ্য দিয়া দেশ-মাতৃকার চরণে অর্ঘ্য নিবেদন করিতে লাগিল।

এইরূপ লেখা শুধু বুদ্ধির সাহায্যে লেখনীর মধ্য দিয়া প্রকাশ করা সম্ভব নয়; এ যেন কোন দৈবশক্তি-প্রণোদিত উদ্দীপনা, অপার শক্তির মূর্ত প্রকাশ। বন্দেমাতরম্ পাঠ করিয়া জাতির প্রাণে নবীন আশা সঞ্চারিত হইল, জাতি হৃদয়ে নূতন বল অনুভব করিল, জাতি দ্বিধাহীন-চিত্তে দুঃখ বরণ করিতে শিখিল, শ্রীঅরবিন্দের অনুকরণে সর্বস্ব ত্যাগ করিতে শিখিল। 'বন্দেমাতরম্' সত্যই দেশমাতার বন্দনার মন্ত্র হইয়া দাঁড়াইল। যে মন্ত্র "সন্ন্যাসী" ও "সন্তান"দিগের মুখ দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র উচ্চারণ করাইয়াছিলেন, শ্রীঅরবিন্দ সেই মন্ত্র দেশমাতৃকার সমস্ত সন্তানদের অন্তরে ছড়াইয়া দিলেন; সত্যই বন্দেমাতরমের মধ্য দিয়া দেশে "**বিপ্লব**" সৃষ্টি হইল।

এই বিপ্লবের আর একটা দিক ছিল। পাশ্চাত্য রাজনীতিতে ধর্মগন্ধ ছিল না। ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ। শ্রীঅরবিন্দ প্রতি কার্যের মধ্যে ভগবৎ-প্রেরণা অনুভব করিতেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল—ভারতবর্ষকে স্বধর্মের মধ্য দিয়া রাষ্ট্রনৈতিক সত্তা অনুভব করিতে হইবে। তিনি নিজেও দেশাত্মবোধের মধ্যে ভগবৎ-প্রেরণা উপলব্ধি করিতেন। দেশকে দেশজননীর মূর্তরূপ বলিয়া অর্চনা করিতেন—সুতরাং দেশবাসীকেও সেই উপলব্ধির আনন্দ উপভোগ করিতে উৎসাহিত করিতেন। পাশ্চাত্য-পন্থী সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি নেতৃগণ শ্রীঅরবিন্দ প্রবর্তিত রাজনীতির মধ্যে ধর্ম-বারি সিঞ্চনকে উপহাসের চক্ষে দেখিতেন এবং বাতুলতা বলিয়া প্রথম অপেক্ষা করিলেন ; কিন্তু পরে তাঁহারা শ্রীঅরবিন্দের প্রভাব,"বন্দেমাতরমের" জনপ্রিয়তা দেখিয়া বিরোধ আরম্ভ করিলেন। এইবার মধ্যপন্থীদের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ পরিচালিত চরমপন্থীদের প্রকাশ্য মনোমালিন্য আরম্ভ হইল। সুরেন্দ্রনাথ শ্রীঅরবিন্দকে কখনও ক্ষমা করেন নাই।

নিপীড়িত, পরাজিত ভারত শ্রীঅরবিন্দের ঐশী বাণীতে নব জাগরণের স্পন্দন অনুভব করিল ; সমস্ত দেশ শ্রীঅরবিন্দকে ভারতের নেতা বলিয়া বন্দনা করিল। তাঁহার বাণী অনুসরণ করিয়া সকল প্রদেশেই বুদ্ধিজীবী তরুণ সম্প্রদায় জাতীয় দল গঠন করিতে লাগিল। মহারাষ্ট্রে বালগঙ্গাধর তিলক সম্পূর্ণভাবে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে যোগ দিলেন।

শ্রীঅরবিন্দ এবার চরমপন্থী দল গঠনে মনোনিবেশ

করিলেন। মেদিনীপুরে বঙ্গীয় প্রদেশিক সম্মেলনের অধিবেশনে, সুরাট কংগ্রেসে শ্রীঅরবিন্দ ও তিলকের নেতৃত্বে আত্মনিয়ন্ত্রণের নূতন আদর্শে কংগ্রেস গঠনের প্রস্তাব করিলেন। তাঁহারা দুই জনে কংগ্রেসের মধ্যে ভাব-বিপ্লবের সৃষ্টি করিলেন। কংগ্রেস আর মুষ্টিমেয় মধ্যপন্থী ব্রিটীশের দান-ভিখারী "বড়লোকের" প্রতিষ্ঠান রহিল না, উহা ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সমগ্র জাতীর প্রতিষ্ঠান হইয়া উঠিল।

জাতীয় দলের এই প্রতিপত্তি দেখিয়া ব্রিটীশ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। এবার তাঁহারা দণ্ডনীতি আরম্ভ করিলেন। ১৯০৫ সালে বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের অধিবেশনে পুলিস অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করিল। মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা প্রথম অহিংস অসহযোগ পন্থা অবলম্বন করেন এই বরিশালেই। বন্দেমাতরমে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের জন্য শ্রীঅরবিন্দ ১৯০৭ সালে রাজদ্রোহ অপরাধে ধৃত হন। বিপিনবাবু পরোক্ষে প্রবন্ধটি লেখা ও প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া ছয় মাস কারাবরণ করেন। শ্রীঅরবিন্দ মুক্তিলাভ করিলেন। ১৯০৮ সালে বালগঙ্গাধর তিলক তাঁহার "কেশরী" পত্রিকায় বোমা সম্বন্ধে প্রকাশিত প্রবন্ধের জন্য রাজদ্রোহ অপরাধে দ্বীপান্তরে নির্বাসিত হন। এবার দমননীতিতে গভর্ণমেণ্ট **"পন্থা-বিপ্লব"** সৃষ্টি করিলেন। দমননীতির প্রতিক্রিয়া অনেক সময় দমনকারীকে সমভাবে অভিভূত করে, বাংলা দেশেও তাহাই হইল।

আইনের নামে ব্রিটীশের ক্রমবর্ধমান অত্যাচারের সঙ্গে

অপমান ও লাঞ্ছনা ভারতবাসীর মনকে আরও তিক্ত করিয়া তুলিল। একশ্রেণীর নবীন সম্প্রদায় নূতন পন্থা আবিষ্কার করিল—অস্ত্র দ্বারা দেশের স্বাধীনতা লাভ করা সহজ হইবে; অন্ততঃ শাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করা যাইবে। ইহার পূর্বেও বোম্বাই ও পুনা সহরে সন্ত্রাসবাদীদল কয়েকজন ইংরেজ কর্মচারীকে হত্যা করিয়াছিলেন। বুয়রযুদ্ধে আফ্রিকায় সভ্যজাতির সফলতা ভারতবর্ষে নূতন দৃষ্টিভঙ্গি সূচিত করিয়াছিল। এইসময়ে চীনে বক্সার ও অন্যান্য দল **সানইয়াৎ সেনের** নেতৃত্বে সন্ত্রাসবাদ দ্বারা স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করিয়াছিল। ১৯০৪-৫ সালে রুশ-জাপানের যুদ্ধের পর প্রাচ্যজাতির মনে নবীন আশার সঞ্চার হইয়াছিল—প্রাচ্যশক্তি সুযোগ পাইলে প্রতীচ্য শক্তিকে পরাভূত করিতে পারে। যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণের **মাটসিনি, গারিবল্ডীর জীবনী** বাংলায় প্রকাশিত হওয়ার পর যুবকদের মনে অপূর্ব উন্মাদনার উন্মেষ হইল; ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের **"সন্ধ্যা"** পত্রিকার প্রবন্ধগুলি অম্ল-মধু-কটু রসের অবতারণা করিয়া ব্রিটীশ বিদ্বেষ ঘনীভূত করিল। সখারাম গণেশ দেউস্করের **দেশের কথা** পড়িয়া ব্রিটীশ রাজত্বে ভারতবর্ষের জাতীয় অবনতি ও অর্থনৈতিক দুর্গতির কথা জানিয়া যুবকমন চঞ্চল হইয়া উঠিল।

দেশের কয়েকজন যুবক মিলিয়া সন্ত্রাসবাদী দল সৃষ্টি করিলেন। এই দলের মস্তিষ্ক ছিলেন ব্যারিষ্টার পি, মিত্র। ১৯০৪ সালে ইষ্ট ক্লাব প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়া তিনি সক্রিয়

সন্ত্রাসবাদ প্রত্যক্ষভাবে আরম্ভ করেন। তাঁহার প্রধান কর্মী ছিলেন শ্রীঅরবিন্দের ভ্রাতা বারীন্দ্র ঘোষ। মজঃফরপুরে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী বোমা দ্বারা দুই ইউরোপীয় নারীকে হত্যা করার পর যখন মাণিকতলা বোমার কারখানার কাহিনী প্রকাশিত হইয়া পড়িল, ব্রিটীশ সরকার স্বভাবতঃ সন্দেহ করিল যে রাজনীতিক্ষেত্রে শ্রীঅরবিন্দ যখন প্রকাশ্য নেতা, তখন বিপ্লববাদী দলেরও গুপ্ত নেতা তিনি—বিশেষতঃ তাঁহার ভাই বারীন্দ্র ও সহকর্মী উপেন্দ্র যখন এই দলে আছেন। এইবার শ্রীঅরবিন্দও বিপ্লবীদের সঙ্গে কারাগারে প্রেরিত হইলেন—১৯০৮ সাল, ৫ মে। অবশ্য শ্রীঅরবিন্দ এই সব সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে পরোক্ষে জড়িত ছিলেন নিঃসন্দেহ।

সরকার পক্ষ নানা ছলে ও কৌশলে শ্রীঅরবিন্দকে দোষী প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন। এক বৎসর কাল শ্রীঅরবিন্দ আলীপুরের "শ্রীঘরে" বাস করেন। সেই সময়ে মাদ্রাজ হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার নর্টন সাহেব শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবের সঙ্গে সম্পর্কের প্রত্যক্ষ প্রমাণাভাবে বিরাট সাক্ষ্যজাল বিস্তার করিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন যে, ব্রিটীশবিদ্বেষ-প্রণোদিত হইয়াই শ্রীঅরবিন্দ স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করিতেন। শ্রীঅরবিন্দের সমস্ত কিছুর মধ্যেই তিনি সন্ত্রাস-সৃষ্টির স্পর্শ দেখিতে পাইলেন। বারীন্দ্রের নিকট একখানা পত্রে লেখা ছিল "এইবার মিষ্টান্ন ছড়াইবার সময়।" নর্টন সাহেব অর্থ করিলেন "মিষ্টান্ন" অর্থাৎ বোমা। শ্রীঅরবিন্দের বারিষ্টার চিত্তরঞ্জনের ব্যাখ্যায় ও যুক্তিতে

এসেসারগণ সিদ্ধান্ত করিলেন যে এ চিঠি জাল, এবং বোমা উকিল ও পুলিসের মনে—শ্রীঅরবিন্দের পত্রে নয়।

শ্রীঅরবিন্দের সহপাঠী বিচক্রফ্‌ট সাহেবের আদালতেই মোকর্দমার বিচার হয়। এই বিচ্‌ক্রফ্‌ট সাহেব আই, সি, এস,পরীক্ষার সময় শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে গ্রীক্ ও লাটীন পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে আনীত প্রমাণের মূল কথা ছিল এই যে—রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি যে সমস্ত স্বাধীনতার বাণী প্রচার করিয়াছেন উহারই প্রচারের পরোক্ষ ফলে ভারতবর্ষে সন্ত্রাসবাদী দলের সৃষ্টি হইয়াছে, সুতরাং ইহার ফলে যে সমস্ত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে উহার জন্য তিনি দায়ী। চিত্তরঞ্জন স্বাধীনতা-প্রচারের ব্যাখ্যা করিলেন অন্যরূপ। তাঁহার ব্যাখ্যায় স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার কোনমতেই ন্যায়বিরুদ্ধ কাজ হইতে পারে না, বরং তিনি উহার জন্য তাঁহাকে বিচারকের সম্মুখে শত মুখে প্রশংসা করিয়া বলিলেন,—

"Long after this controversy is hushed in silence, long after this turmoil, this agitation ceases, long after he is dead and gone he will be looked upon as the poet of patriotism, as the prophet of nationalism and the lover of humanity. Long after he is dead and gone, his words will be echoed and re-echoed not only in India but across the distant seas and lands".

অর্থাৎ :—এই বাগ্‌বিতণ্ডা যেদিন নীরব হইয়া যাইবে, যেদিন এই বিক্ষোভ শান্ত হইয়া যাইবে, যেদিন এই আন্দোলন বন্ধ হইয়া যাইবে—তাহার বহুকাল পরে যখন শ্রীঅরবিন্দ এই পৃথিবীতে থাকিবেন না, এমন দিন আসিবে যখন এই অরবিন্দকে স্বদেশপ্রেমের চারণ, জাতীয়তায় অবতার, মানব-প্রেমিক বলিয়া অভিনন্দিত করা হইবে। তাঁহার তিরোধানের বহুকাল পরেও তাঁহার বাণী শুধু ভারতে নয়—সাগরের অপর পারে, দূরে, দেশান্তরে প্রতিধ্বনিত হইবে ”

বিচক্রফ্‌ট সাহেব তাঁহার বিচারে সিদ্ধান্ত করিলেন—“স্বাধীনতার জন্য আদর্শরূপে দেশপ্রেম প্রচার করা কোন দূষণীয় অপরাধ নয়।” শ্রীঅরবিন্দ মুক্তিলাভ করিলেন। শ্রীঅরবিন্দ“কারাকাহিনীতে” তাঁহার বৎসরব্যাপী কারাজীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়াছেন, “এই কারাগারে আমার অন্তরে নূতন বিপ্লব সৃষ্টি হইয়াছিল। এই এক বৎসর কারাবাস আশ্রমবাস।” তিনি কারাগারে “ভগবানকে গুরুরূপে, সখারূপে” প্রত্যক্ষ করিলেন। কারাগারেই তিনি ভগবানের “দর্শনলাভ” করিলেন। এইখানেই এই কারাগারের ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দের জীবনের এক অধ্যায়ের বিশেষ পরিসমাপ্তি হইল। তিনি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, “আমি মুক্তি চাই না। অপরে যাহা চায় এমন কোন জিনিষই আমি চাই না। আমি চাই এই যে, ভারতের লোকসকলকে আমি যেন ভালবাসি, যেন এদের জন্য আমার জীবন উৎসর্গ করতে পারি।”

মুক্তির পরেই শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার 'ধর্ম্ম' ও কর্ম্মযোগিন্" কাগজে যখন তাঁহার পরমার্থিক মুক্তি আন্দোলনের দীপ্তধারাকে রূপ দান করিয়া বাংলা দেশে ধর্ম ও কর্ম সমন্বয় করিতেছিলেন, তখন ব্রিটীশ রাজপুরুষগণ স্থির করিলেন তাঁহাকে বিনা-বিচারে অন্তরীণ করা হইবে। এই সংবাদ ভগিনী নিবেদিতা জানিতেন। ভগিনী নিবেদিতা ছিলেন ভারতের মুক্তি-পথে শ্রীঅরবিন্দ দলের নিত্যসঙ্গিনী। তিনি এই সংবাদ শুনিয়া শ্রীঅরবিন্দকে সাবধান করিয়া দিলেন। তাঁহারই ইঙ্গিতে শ্রীঅরবিন্দ ব্রিটীশ সাম্রাজ্য ত্যাগ করিয়া প্রথমে ফরাসী চন্দননগরে, পরে পণ্ডীচেরীতে গমন করিলেন ; সেখানে তিনি নূতন তপস্যা আরম্ভ করিলেন।

সত্যই শ্রীঅরবিন্দের এই প্রার্থনা দ্বারা উদ্বোধিত হইয়া দেশের যুবকগণ এক অদ্ভুত প্রেরণা লাভ করিল—দেশের চিত্তে এক নূতন বিপ্লব সৃষ্টি হইল। তিনি বাণী লাভ করিলেন— "ভারতের স্বাধীনতা ভারতবাসীর নিজেদের জন্য নয়, পরন্তু সমগ্র জগতের জন্য। ভারতের স্বাধীনতা জগৎ সেবার জন্য। শ্রীঅরবিন্দ আজ জগৎ সেবার জন্য এক নূতন সাধনা আরম্ভ করিয়াছেন। তপস্যা দ্বারা পৃথিবীর সভ্যতাকে এক নূতন স্তরে উন্নীত করিবেন।

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"।

**এই ত শ্রীঅরবিন্দের বিপ্লব।**

( ১৮৮৯—১৯০৮ খৃঃ অঃ )

১৯০২ সাল। বঙ্কিমের "ভবানী মন্দির" ও "বন্দেমাতরম্" শ্রীঅরবিন্দকে মুগ্ধ করিয়াছে, প্রেরণা দিয়াছে। সেই প্রেরণার আবেগে শ্রীঅরবিন্দ "ভবানী স্তব"—"ভবানী পূজা" নামক দুইখানি পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি সমস্ত ভারতবর্ষে "ভবানী মন্দির" স্থাপন করিবার মানসে বরোদা রাজার দেহরক্ষী যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাংলা দেশে প্রেরণ করেন। এই যতীন্দ্রনাথ অদ্ভুত প্রকৃতির লোক। বাঙ্গালী জাতি শ্রমবিমুখ, দুর্বল শরীর, সামরিক কার্যে অপারগ বলিয়া ব্রিটিশ রাজপুরুষ কর্তৃক নিন্দিত ছিল। অথচ কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস বিদেশে ব্রেজিলে সেনাপতি পদলাভ করিয়া সেই অপবাদ ভিত্তিহীন প্রমাণ করিলেন। যতীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষে বাঙ্গালীর ভীরুতার অপমান নষ্ট করিবার সংকল্প করিলেন। তিনি ভারতের বহু দেশীয় রাজ্যে সৈন্য বিভাগে যোগ দেওয়ার

চেষ্টা করিলেন। উত্তর আসিল—বাঙ্গালী ভীরু, দুর্বল, সৈন্য বিভাগের অনুপযুক্ত। যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গালী "বন্দ্যোপাধ্যায়" উপাধি ত্যাগ করিয়া অবাঙ্গালী "উপাধ্যায়" উপাধি গ্রহণ করিয়া একদিনেই সৈন্য বিভাগের উপযুক্ত হইয়া উঠিলেন। বলিষ্ঠ দেহ, গৌরকান্তি, জ্যোতির্ময় চক্ষু—যতীন্দ্র নাথ রাজপুত ব্রাহ্মণরূপে পরিচিত হইলেন। অল্পকাল মধ্যে বরোদার সামান্য সৈনিক হইতে মহারাজের দেহরক্ষী সেনাপতি পদে উন্নীত হইলেন। সেই সময় শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হইল বরোদায়; শ্রীঅরবিন্দ তাঁহাকে স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের পথে আকর্ষণ করিলেন।

যতীন্দ্রনাথ ১৯০২ সালে বাংলা দেশে আসিয়া কলিকাতায় একটি গুপ্ত সমিতি স্থাপন করেন এবং অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা মিষ্টার পি, মিত্র মহাশয়ের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন। তারপর তিনি মেদিনীপুরে "ভবানী মন্দির" নামে গুপ্ত সমিতি স্থাপন করেন। ইহার পূর্বেই রাজনারায়ণ বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ বসু মেদিনীপুরে একটি 'সিক্রেট সোসাইটি' ( Secret Society ) স্থাপন করিয়াছিলেন। বুয়র যুদ্ধের শেষে বাঙ্গালী যুবকগণ পাশ্চাত্য শক্তির বিরুদ্ধে প্রাচ্য জাতিরা যুদ্ধ করিতে পারে, এই ধারণায় অনুপ্রাণিত হইয়াই কয়েকটি স্থানে "সমিতি" গঠন করিয়াছিল—এই সব সমিতির উদ্দেশ্য, আদর্শ এবং কার্যধারার বিশেষ সুনির্দিষ্ট পথ ছিল না। যতীন্দ্রনাথ আসিয়া সেই সিক্রেট সোসাইটির রূপ পরিবর্তন করিয়া দিলেন। প্রথমতঃ তরবারী স্পর্শ করিয়া শপথ গ্রহণ—

নাম দিলেন দীক্ষা ; দীক্ষার মন্ত্র ছিল সংস্কৃত ভাষায়—যেমন আনন্দমঠে সন্তানগণ দীক্ষা নিতেন।

এই দীক্ষার মধ্যে একটু মধুর আকর্ষণ ছিল। সেই আকর্ষণের মধ্য দিয়া কর্মের সম্বন্ধ স্থাপন করাতে ধর্ম সংস্কারে পুষ্ট ভারতীয় মনকে বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত করিল। পূর্বে সিক্রেট সোসাইটির সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক ছিল না। এবার ভগবানের নামে তরবারী সাক্ষ্য করিয়া মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক শপথ করার মধ্যে নূতন প্রেরণা আসিল, দেশমাতার সেবক বলিয়া বাঙ্গালী নিজেকে উৎসর্গ করিল। সেই উদ্দেশ্যে লাঠি খেলা, তলোয়ার খেলা, তীর চালনা, বন্দুক ছোড়া, ঘোড়ায় চড়া, সাঁতার, কুস্তি এবং বকসিং দ্বারা শরীর ও মন উভয় নূতন উন্মাদনা লাভ করিত। চঞ্চল তরুণ মন যেন নূতন মন্ত্রের স্পর্শে বসন্ত পল্লবের মত মঞ্জুরিত হইয়া উঠিল। সেই সঙ্গে গারিবল্ডী, মাট্‌সিনীর জীবনী, দেবী চৌধুরাণী, সীতারাম, আনন্দমঠ, পলাশীর যুদ্ধ, দেশের কথা, নীলদর্পণ, কুলিকাহিনী, বিবেকানন্দের বক্তৃতা, গীতা প্রভৃতি পুস্তক নিয়মিত পাঠের ব্যবস্থা ছিল।

ক্ষুদিরাম চৌদ্দ বৎসর বয়সে সত্যেন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় মেদিনীপুরে ১৯০৩ সালে গুপ্ত সমিতির দীক্ষা গ্রহণ করেন।

ক্ষুদিরামের জন্ম দরিদ্র পরিবারে। পিতা ত্রৈলক্যনাথ বসু নাড়াজোল জমিদারের অধীনে তহশীলদার ছিলেন। তাঁহার তিন কন্যা অপরূপা,সরোজিনী ও ননীবালা, কিন্তু বড় দুই ভাই মৃত।

সুতরাং মাতা লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী ভাবিলেন, তাঁহার পুত্র-সন্তান বাঁচিবে না ; অতএব সন্তানকে বিক্রয় করিয়া দিলেন— বিশ্বাস—পরের সন্তান হইলে হয়ত বাঁচিতে পারে ; তবে মূল্য হইল তিন মুষ্টি চাউলের "ক্ষুদ"-সুতরাং এই সন্তানের নাম হইল "ক্ষুদিরাম।" মা ভাবিলেন যমকে ফাঁকি দিলেন, কিন্তু যমরাজ এই তিন মুষ্টি ক্ষুদের পরিবর্তে জীবনের দৈর্ঘ্য নির্ধারণ করিলেন—আঠার বৎসর। এই আঠার বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালীর জীবনে ক্ষুদিরাম এক অপূর্ব ইতিহাস সৃষ্টি করিলেন। বিধাতা অলক্ষ্যে এই শিশুকে বিরাট কর্মের জন্য প্রস্তুত করিতে লাগিলেন।

শৈশবে সাত বৎসর বয়সে পিতার মৃত্যুর ছয় মাসের মধ্যে মাতার মৃত্যু হয়, সুতরাং তাঁহার আর ঘরে কোন আকর্ষণ রহিল না। জ্ঞাতি ভ্রাতার গলগ্রহ হইয়া বিড়ম্বিত জীবন তাঁহাকে ক্রমশঃ পারিবারিক আবেষ্টন হইতে দূরে সরাইয়া দিতে লাগিল। জ্ঞাতি ভ্রাতার স্ত্রীটি অবাঞ্ছিত ক্ষুদিরামের সহিত বাড়ীর ভৃত্যের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। সমস্ত দিন পরিবারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্যে তাঁহাকে নিয়োজিত থাকিতে হইত ; পারিশ্রমিক' অর্ধাহার, কখনো বা উপবাস। তাহার উপর পড়াশুনার বিশেষ আগ্রহ নাই ; খেলাধূলায়, শরীর গঠনে, দুঃসাহসিক কাজে অসীম উৎসাহ। সুতরাং প্রতিদিন ভ্রাতৃবধূর সঙ্গে মনোমালিন্য—এবং তাহার ফলে প্রহার, অনাহার, অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া একদিন ক্ষুদিরাম মেদিনীপুরে তাঁহার ভগ্নিপতি

অমৃতলাল রায়ের গৃহে চলিয়া আসিলেন। এবং সেখানে কলেজিয়েট স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন।

এই সময় ক্ষুদিরামের স্কুল-জীবনের ইতিহাস খুব মনোরম নয়। তাঁহার উৎসাহ লেখাপড়া ভিন্ন অন্য সমস্ত বিষয়েই ছিল। কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক আশু মাষ্টারের তখন প্রবল প্রতাপ —শিক্ষা তিনি দিবেনই। ছাত্রেরা যখন বেতন দেয় তখন প্রতি-দানে অন্ততঃ বেত নিতেই হইবে, কারণ তাঁহার দেওয়ার মত আর কোন জিনিষ ছিল না। এই আশু মাষ্টারের মস্তিষ্কে অদ্ভুত উদ্ভাবনী শক্তি ছিল—প্রতিদিন ছাত্রদের কাহাকেও "চৌদ্দ-পোয়া", কাহাকে "একঠেঙ্গা" কাহাকে বা 'সূর্যমুখী', কাহাকে বা 'কুমড়ো পটাস্' করিয়া রাখিতেন। "চৌদ্দপোয়া"—সাড়ে তিন সের ওজনের ইট হাতের তালুতে রাখিয়া দুই পা ফাঁক করিয়া দাঁড়াইতে হইবে এক ঘণ্টা ; "একঠেঙ্গা"—এক পায়ের উপর দাঁড়াইতে হইবে ; "সূর্যমুখী"—ছাত্রকে দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া চক্ষু মেলিয়া দাঁড়াইতে হইবে ; "কুমড়া পটাস"—ছাত্র দুই হাঁটুর নিচে দুই হাত দিয়া কান ধরিয়া মাথা মাটির দিকে রাখিবে। তাহার উপর বেত, গাধার টুপী। আশু মাষ্টারের শাস্তির পরিমাণ যতই বাড়িতে লাগিল, ক্ষুদিরামের অবাধ্যতা ও দুষ্ট বুদ্ধি ততই বাড়িতে লাগিল। ক্ষুদিরাম ছাত্রদের লইয়া দল তৈয়ার করিলেন। সেই দলের অন্যতম কাজ ছিল "ভূতধরা"। যে বাড়ীতে ভূতের ভয় ছিল, সে বাড়ীর পার্শ্বে বড় বটগাছ বা তেঁতুলগাছে বসিয়া সেই দল ভূত ধরিতে চেষ্টা করিত এবং মানুষকে ভয় দেখাইত। এই

ভাবে অন্ধকার রাত্রি, ঝড়জল ও অনিশ্চয়তার সঙ্গে ক্ষুদিরামের নিবিড় পরিচয় হয়। তাঁহার বিরুদ্ধে প্রায় প্রত্যহই প্রতিবেশীর অভিযোগ আসিতে লাগিল। স্কুলে আশু মাষ্টারের তাড়না; বাড়ীতে ভগ্নিপতির সহিত বড়দিদির ভাইকে কেন্দ্র করিয়া মনোমালিন্য; সুতরং ক্ষুদিরাম স্কুল ছাড়িয়া দিলেন।

এবার তাঁহার বিরামহীন অবসব; তিনি সম্পূর্ণভাবে প্রাণ ভরিয়া "ভবানী মন্দিরের" কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন। সত্যেন বসু তাঁহাকে খুব নিবিড়ভাবে আপন করিয়া লইলেন,--ঘরে স্নেহের অভাবে বাহিরের সামান্যতম স্নেহের জন্য ক্ষুদিরামের প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। স্নেহের টানে আকৃষ্ট হইয়া ক্ষুদিরাম তাঁহার সমস্ত সত্বা দেশের কাজে নিয়োজিত কবিলেন।

১৯০৫ সাল, ১লা অক্টোবর—তখন বঙ্গবিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে; শুধু পার্লামেণ্টে আইন প্রণয়ন অবশিষ্ট। সমস্ত বাঙ্গালী জাতি একসঙ্গে প্রতিবাদ আরম্ভ করিল। সংবাদপত্রে, পুস্তকে, রাজপথে, সভাসমিতিতে সর্বত্রই বাঙ্গালীর বিক্ষোভ পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। পথে পথে যুবক ও ছাত্রগণ বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত গাহিয়া অপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করিতে লাগিল। দ্বিজেন্দ্রলাল লিখিলেন—

"বঙ্গ আমার, জননী আমার।"

ইতিমধ্যেই ঢাকায় "অনুশীলন সমিতি", বরিশালে স্বদেশ 'বান্ধব সমিতি', ময়মনসিংহে "সাধনা সমিতি" ফরিদপুরে "শ্রী-সমিতি", নোয়াখালিতে "সুহৃদ্ সম্মিলনী" স্থাপিত

হইয়াছিল। ঢাকায় পুলিন দাস, বরিশালে অশ্বিনী দত্ত খুব তীব্র আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। বরিশালের মুকুন্দ দাস "মাতৃপূজা" নামক যাত্রাভিনয়ের মধ্য দিয়া স্বদেশী গ্রহণের আবরণে জনসাধারণের মনকে বিপ্লবের দিকে টানিতে লাগিলেন। ১৬ই আগষ্ট, ১৯০৬ সালে বঙ্গভঙ্গের দিন নির্ধারিত হইয়াছিল। তাহার পূর্বেই বিদেশী বর্জনের প্রস্তাব কিশোরগঞ্জে গৃহীত হয়। ৭ই আগষ্ট কলিকাতা টাউন হলে বঙ্গভঙ্গের নিন্দা করিয়া বিদেশী বর্জন ও স্বদেশী গ্রহণের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইংলণ্ড আমেরিকার উপর ষ্টাম্প-অ্যাক্ট প্রণয়ন করিয়া শুল্ক আদায় করিয়াছিল ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে। আমেরিকায় তখন বিলাতী বর্জন করিয়া অদ্ভুত সাফল্য লাভ করিয়াছিল এবং পরে আমেরিকা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল। এই দৃষ্টান্তই ভারতবাসীকে বিলাতী বর্জনের প্রেরণা দিল এবং কর্মপন্থা নির্দশ করিল।

১৬ই আগষ্ট বঙ্গভঙ্গের দিনে বাংলার সর্বত্র রাখীবন্ধনের ব্যবস্থা হইল। রবীন্দ্রনাথ সেই উৎসবের জন্য রচনা করিলেন—

"ভাই ভাই একঠাঁই
ভেদ নাই ভেদ নাই।"

সেই উপলক্ষে বাংলার প্রতি সহরে, গ্রামে এক নূতন উদ্দীপনা অনুভূত হইল। মেদিনীপুর তখন পশ্চিমবঙ্গের আদর্শ।

সত্যেন্দ্র বসু, নির্মল রায় ( নিরাপদ ), বিভূতি সরকার প্রভৃতি বিপ্লবপন্থীগণ বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করিয়া বিদেশী বাণিজ্যের উপর

তীব্র আঘাত করিলেন। বিভূতি সরকার তাঁতশালা খুলিয়া ছেলেদের আকৃষ্ট করেন। মেদিনীপুরের বড়বাজারে "ছাত্র ভাণ্ডার" খুলিয়া কলিকাতার ছাত্র ভাণ্ডারের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। উভয়েরই উদ্দেশ্য ছিল স্বদেশী প্রচারের সুযোগে বিপ্লববাদ প্রচার করা। এই সময় শ্রীরামপুর বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস্, কলিকাতা ন্যাশনাল টেনারী, বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রভৃতি স্বদেশী প্রতিষ্ঠান আরম্ভ করা হয়। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য দিয়া জাতীয়তা প্রচারের চেষ্টা করা হয়। মেদিনীপুরের ছাত্র ভাণ্ডারের অফিসে কলিকাতার উগ্রপন্থী সংবাদপত্র সন্ধ্যা ও বন্দেমাতরম্ আসিত। তরুণদল এই সব পত্রিকা বেদ ও গীতার ন্যায় নিষ্ঠার সহিত পাঠ করিত।

তখন স্বাস্থ্য চর্চা ও সভাসমিতির ধূম পড়িয়া গিয়াছিল। সহরের পাড়ায় পাড়ায় আখড়া, লাঠিখেলা, তলোয়ার খেলা, দেশী ডন, রামকৃষ্ণ জন্ম বার্ষিকী, বিবেকানন্দ উৎসব, দরিদ্র-নারায়ণ সেবা, নৈশ বিদ্যালয় আরও কত কি! তরুণ বাঙ্গালী কর্ম-চঞ্চল হইয়া উঠিল। সত্যেন বসুর বাড়ীর পার্শ্বে একটি জীর্ণ গৃহে ছিল গুপ্ত সমিতির চক্র। উঁহার পার্শ্বে কালীমাতার মন্দির। হঠাৎ দেশটা বিশেষভাবে কালীভক্ত হইয়া উঠিল; অসুর-দলনী কালী আর সুদর্শনধারী শ্রীকৃষ্ণ যেন বাংলাকে পাইয়া বসিল। কালীমাতার সম্মুখে "সাদা পাঁঠা" বলি দেওয়ার কথা যেন যুবকদের মধ্যে এক সহজ রহস্যের মতন হইয়া উঠিয়াছিল। সত্যেনের এই মিলনচক্রের নাম হইল

"আনন্দমঠ" ; ঋষি বঙ্কিমের "আনন্দমঠ" ও "সনাতন ধর্ম" বাঙ্গালীকে এক অদ্ভূত প্রেবণা দিল।

এই সময় মেদিনীপুরের হেমচন্দ্র কানুন্‌গো (দাস) নিজের বাড়ীঘব বিক্রয় কবিয়া শিক্ষালাভেব জন্য ফরাসী দেশে গিয়াছিলেন। তিনি শিক্ষালাভ কবিলেন ফবাসী বিপ্লবেব সক্রিয় কর্মধাবা ও সশস্ত্র বিপ্লব আন্দোলন এবং তাব জন্য অনুশীলন কবিলেন ও বসায়ন তৈয়াব কবিলেন "বোমা"। হেমচন্দ্র মেদিনীপুবে আসিয়া সত্যেনেব সঙ্গে দেখা কবেন এবং আনন্দমঠেব "কালীমূর্তি" দেখিয়া এই কবাল-মূর্তি স্থাপনেব কাবণ জিজ্ঞাসা কবেন। সত্যেন উত্তব দিলেন—"সকলেই এই বকম একটা কিছু চায। হঠাৎ কি জানি কেন দেশটা বেশী বকম কালীভক্ত হয়ে উঠেছে।" সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদিবাম বলিযা উঠিলেন—"আব যাই হোক্, কালীব কৃপায পাঁঠা খেতে মিলে, আব পাঁঠাব লোভে ভক্তও জোটে।" ক্ষুদিবাম এই সময প্রায সমস্ত দিনই আনন্দমঠে থাকিতেন।

১৯০৬ সালেব ফেব্রুয়াবী মাসে মেদিনীপুবে মাবাঠা কেল্লায একটি শিল্প প্রদর্শনী হয। ছেলেবা প্রদর্শনীব প্রবেশ-পথে "সোনাব বাংলা" নামক একখানি "গবম পুস্তক" বিলি কবিতেছিল। ক্ষুদিবাম চীৎকাব কবিয়া সকলেব দৃষ্টি "সোনাব বাংলাব" প্রতি আকর্ষণ কবিতেছিলেন। একজন হাবিলদাব আসিয়া ক্ষুদিবামেব হাত ধবিল, উদ্দেশ্য তাহাকে গ্রেপ্তাব করিবে। ক্ষুদিবাম তখন মাত্র নূতন বক্‌সিং শিখিতেছেন, তাই তাঁহাব নূতন শিক্ষালব্ধ গুণের প্রত্যক্ষ পবীক্ষা কবিতে চেষ্টা

করিলেন ; সুতরাং ক্ষুদিরাম হাবিলদারের নাকে এক ঘুসি চালাইয়া দিলেন। হাবিলদার একহাতে নাকের রক্ত মুছিতে লাগিল আর একহাতে ক্ষুদিরামকে ধরিল—অনেকেই দৃশ্যটি উপভোগ করিতেছিলেন। হঠাৎ সেইখানে সত্যেন বসু উপস্থিত। তিনি প্রদর্শনীর সহকারী সম্পাদক এবং কাচারীতে ডেপুটী বাবুর কেরাণী। তাঁহাকে হাবিলদার চিনিত। হাবিলদারকে দেখিয়া সত্যেন আশ্চর্যান্বিত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"ইয়ে কেয়া কিয়া জমাদার সাহেব, ইয়ে ডিপ্‌টী সাহেবকা লেড়কা হ্যায়, উস্‌কো পাক্‌ড়া কাঁহে ?"

হাকিমের লেড়কা—তখনকার দিনে ডিপুটী ছিল ব্রিটিশের ক্ষমতার জীবন্ত প্রতিনিধি, ডেপুটীর নামে পুলিসের নাকের রক্ত শুকাইয়া গেল। বিশেষতঃ ক্ষুদিরামের গৌরকান্তি, সুন্দর মুখমণ্ডল, নির্ভীক মূর্তি দেখিয়া পুলিস ভাবিল সত্যই ডেপুটী বাবুর লেড়কা। তার উপর কেরাণীবাবু বলিয়াছেন—নিঃসন্দেহ। পুলিস পুঙ্গবের হস্ত শিথিল হইয়া গেল। ক্ষুদিরাম ছাড়া পাইয়া দৌড়াইয়া পলাইল। পাশের লোকজন হাততালি দিয়া উঠিল—চারিদিকে অট্টহাসি। হাবিলদার নিজের ভুল বুঝিতে পারিল ; তখন ক্ষুদিরাম বহুদূরে।

বিপ্লববাদী একজন বন্ধুর পরামর্শে ক্ষুদিরাম তমলুকে আত্মগোপন করিয়া রহিলেন। পলাতকের নিঃসংগ, কর্মহীন অবস্থা তাঁহার ভাল লাগিল না—দেশের সমস্ত কাজ সম্মুখে পড়িয়া আছে, আর ক্ষুদিরাম নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকিবে ? সুতরাং তিনি কৌশল করিয়া অলিগঞ্জের তাঁতশালায় আসিয়া পুলিশের

কাছে ধরা দেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার বিরুদ্ধে বাজদ্রোহের মোকর্দমা আনেন। বাংলাদেশে এই প্রথম রাজদ্রোহের মোকর্দমা; সুতবাং ক্ষুদিরামের নাম সর্বত্র প্রচাব ছড়াইয়া পড়িল।

মোকর্দমা সেসানে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। রাজদ্রোহের গুরুতর অপবাধ; দ্বীপান্তব, ফাঁসী সবই হইতে পাবে। সুতবাং জজ্ সাহেব স্বয়ং বিচার কবিবেন। সমস্ত মেদিনীপুর চঞ্চল হইয়া উঠিল। ১৩ই এপ্রিল ক্ষুদিরামেব বিচাব শেষ হইল—অর্থাৎ গবর্ণমেণ্ট মামলা উঠাইয়া নিলেন কারণ প্রমাণাভাব। একমাত্র ফল হইল—সত্যেনের পদচ্যুতি। তাঁহাকে ম্যাজিষ্ট্রেট জিজ্ঞাসা কবিলেন—ক্ষুদিরাম ডেপুটীবাবুর ছেলে বলিয়াছিলে কেন? সত্যেন উত্তব দিয়াছিলেন অবশ্য ব্যঙ্গ করিয়া—আমি মনে করিয়াছিলাম, সে ডেপুটী সাহেবেরই ছেলে! আমার এমনি মনে হইয়াছিল।

এই উত্তরের মধ্যে খুব বহস্য ছিল, শ্লেষ ছিল—একটা নির্ভীক ভাব ছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট অপমানিত বোধ করিলেন, কেবাণী হইয়া হাকিমের সঙ্গে পরিহাস! সুতবাং কেবাণীর প্রতি মাবণ-অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইল—পদচ্যুতি।

সত্যেন বাঁচিয়া গেলেন, এইবার সম্পূর্ণভাবে গুপ্তসমিতির কাজে আত্মনিয়োগ করিতে পারিবেন।

এই সময় ক্ষুদিরাম মেদিনীপুরেব সমস্ত গুপ্তসমিতির আখড়াগুলি পরিদর্শন করিয়া লাঠি খেলা, প্যারালাল বার, তীর ছোঁড়া শিখাইতে লাগিলেন। কিছুকাল তাঁহার কর্মস্থল ছিল

কাঁথি মহকুমা। সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী বর্জনের চেষ্টা চলিতে লাগিল। প্রথমতঃ লোকদের বিলাতী দ্রব্য ক্রয় না করিতে অনুরোধ করা হইত; না শুনিলে জোর করা হইত; সুবিধা পাইলে কাপড় পোড়ান হইত। কখনো কাপড়ের দোকানে আগুন লাগান হইত, পিকেট করা হইত; বিলাতী মালের নৌকা ডুবাইয়া দেওয়া হইত। এই সকল কাজে ক্ষুদিরামের আশ্চর্য সাহস অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

১৯০৭ সালে পূজার সময় ক্ষুদিরাম তাঁহার দিদির সঙ্গে হাটগেছা গ্রামে যান। কালীপূজার পর একদিন সন্ধ্যার পরে অন্ধকারে ডাকহরকরা মেইলব্যাগ লইয়া আসিবার সময় ক্ষুদিরাম উহা কাড়িয়া লন। ক্ষুদিরাম এই কাজ করিবার সময় কারো আদেশ লন নাই—নিজের দায়িত্বে এই কাজ করিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, গুপ্ত সমিতির অর্থাভাব মোচন। অনেকগুলি তরুণ তখন ঘর ছাড়িয়া গুপ্ত সমিতিতে যোগ দিয়াছিল—তাহাদের ভরণপোষণের জন্য অর্থের প্রয়োজন। ক্ষুদিরাম পরোক্ষে বিপ্লবীদের সম্মুখে অর্থাভাব দূরীকরণের নূতন পথের সন্ধান দিলেন। এই সময় বাংলা দেশে অনেক "স্বদেশী ডাকাতি" হইয়াছিল।

ইহার কিছুকাল পরে ১৯০৭ সালে মেদিনীপুরে রাজনৈতিক সম্মেলন হয়। তখন সুরেন্দ্রনাথের মধ্যপন্থীদল ও শ্রীঅরবিন্দের উগ্রপন্থীদলের মধ্যে বিরোধ আরম্ভ হয়। সেই সভায় লোকারণ্য, উদ্দীপনা প্রচুর, ক্ষুদ্র সহর চঞ্চল। ক্ষুদিরাম সংগঠনের দিক দিয়া এ সময় অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া সকলের

প্রীতি অর্জন করিলেন। এই উপলক্ষে কলিকাতার অনেক নেতার সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ পরিচিত হইলেন।

১৯০৬-৭ সালে বঙ্গভঙ্গের বিরোধী আন্দোলন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দেশীয় সংবাদপত্র যুগান্তর, বন্দেমাতরম্, নবশক্তি, সন্ধ্যা প্রভৃতি কাগজের সুর ক্রমশঃ উচ্চ গ্রামে উঠিতে লাগিল। আন্দোলন মাত্র কথা ও লেখার স্তর ছড়াইয়া যাইতে লাগিল এবং কাজের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল। নারায়ণগড়ে লেপ্‌টেনান্ট এনড্রু ফ্রেজারের ট্রেণ ধ্বংস করার চেষ্টা হইল, গোয়ালন্দে এলেন সাহেবকে হত্যা করা হইল, কুষ্টিয়াতে হিগিনবোথাম সাহেবকে হত্যার চেষ্টা করা হইল। পূর্ববঙ্গের গভণর বমফাইড ফুলারকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত হইল।

বিপ্লবীদের কর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে সরকারের দমননীতিও দেশবাসীকে খুব উত্যক্ত করিয়া তুলিল। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধ লাগাইবার অপচেষ্টা চলিতে লাগিল—ঢাকার নবাব সলিমুল্লা সাহেব হিন্দু-বিদ্বেষ প্রচার করিতে লাগিলেন।

বরিশালে সুরেন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করিয়া চারিশত টাকা জরিমানা করা হয়। যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা) এবং প্রেসের মালিক অবিনাশ ভট্টাচার্য অভিযুক্ত হন। বিচারক চিফ্‌ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ডের এজলাসে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বলিলেন—"আমি দুঃখিনী জন্মভূমির জন্য যাহা কর্ত্তব্য বুঝিয়াছি তাহাই করিয়াছি, এখন তোমার যাহা ইচ্ছা করিতে

পার।" ফলে ভূপেন্দ্রনাথের ১ বৎসর কাবাবাস হয়। পরে আবাব যুগান্তর আফিস খানাতল্লাসের সময় অবিনাশ বাবুর ভ্রাতা স্বর্ণেন্দু ও নরেন ভট্টাচার্য ( মানবেন্দ্রনাথ রায় ) এর সঙ্গে পুলিশের মারামারি হয়। অবিনাশেব ভ্রাতা শৈলেন্দ্রকে কিংসফোর্ড সাহেব তিন মাস জেল দেন। তারপর যুগান্তর মুদ্রাকর বসন্ত ভট্টাচার্যকে কিংসফোর্ড তুই বৎসব জেল দেন।

"সন্ধ্যা" পত্রিকার ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের বিচার কিংসফোর্ড সাহেবের এজলাসে আবস্ত হয়। ব্রহ্মবান্ধব বিচারের দিনে তাঁহার মুদ্রাকবকে মাল্য-চন্দন-ভূষিত কবিয়া বরবেশে সজ্জিত করিলেন—এবং স্বয়ং পুরোহিতেব বেশে সহস্র বরযাত্রীর সঙ্গে ইংরাজী ব্যাণ্ড ও দেশী ঢাক ঢোল বাজাইয়া আদালতে উপস্থিত হইলেন। ইহা এক অদ্ভুত রসিকতা! সুসজ্জিত বর এবং উপবীত-ধারী পুরোহিত রাজদ্বারেব মণ্ডপে উপস্থিত হইলে জনসাধারণ উলুধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করিয়া আদালতকে বিবাহ-বাসরে পরিণত করিল। কিংসফোর্ড সাঁহেব ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন, ব্রাহ্মণের ধৃষ্টতার চবম শাস্তি দিবেন বলিয়া শাসাইলেন। ব্রহ্মবান্ধব মোকর্দমা বিচারের পূর্বেই দেহত্যাগ করিলেন। মুদ্রাকবের তুই বৎসর জেল হইল।

তারপর বন্দেমাতবম্ পত্রিকা মামলার অপরাধী শ্রীঅরবিন্দ কিংসফোর্ড সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন—"যদি স্বাধীনতার বাণী প্রচার কবিলে অপরাধ হয়, তবে আমি সর্বপ্রধান অপবাধী (If to anounce freedom is a crime then I am the first criminal)। কিন্তু এই উক্তিতেই শাস্তি দেওয়া যায় না"

প্রমাণ করিতে হইবে প্রবন্ধটি শ্রীঅরবিন্দের লেখা। লেখা-প্রমাণের জন্য কিংসফোর্ডের আদালতে মোকর্দ্দমা আরম্ভ হয়। এই মোকর্দ্দমায় বহুলোক আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল। দর্শকদের মধ্যে একটি ১৩ বৎসরের বালক—সুশীল সেন জনতার মধ্যে একজন সার্জ্জেণ্টকে ঘুসি দেয়। বিচারে প্রমাণ হইল সার্জ্জেণ্ট প্রথম ঘুসি দিয়াছিল। কিন্তু কিংসফোর্ড সাহেব ভাবিলেন "পরাধীন জাতির ছেলে রাজার জাতের গায়ে হাত তোলে।" সুতরাং সুশীলের শাস্তি হইল ১৫ বেত। সুশীলকে হাত পা বাঁধিয়া ১৫ বার বেত্রাঘাত মারা হয়। সুকুমার শিশু অচেতন হইয়া যায়। সেই অবস্থায় সুশীলকে আত্মীয়দের হস্তে সমর্পণ করা হয়।

সমস্ত তরুণ সম্প্রদায় এই পাশবিক শাস্তিতে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। রাস্তায় কিংসফোর্ড সাহেব বাহির হইলেই ছেলের দল হাততালি দেয়, অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখায় "সাদা পাঁঠা"—চীৎকার করিয়া উঠে "বন্দেমাতরম্।" বন্দেমাতরমের জ্বালায় কিংসফোর্ডে সাহেবের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া উঠিল। কিংসফোর্ড সাহেব "বন্দেমাতরম্" অর্থ করিলেন "বোমা মারো"। সরকার কিংসফোর্ডের কলিকাতায় বাস সমীচীন মনে করিলেন না। তাঁহাকে দূর বিহারের এক শহরে বদলী করা হইল মজঃফরপুরে। কিন্তু বিপ্লবীদল স্থির করিলেন কিংসফোর্ডকে শাস্তি দিতে হইবে। অরবিন্দ, চারু দত্ত (পরে আই, সি, এস) এবং সুবোধ মল্লিক সিদ্ধান্ত করিলেন যে শাস্তি হইবে মৃত্যু। এই কার্যের জন্য কয়েকজন কর্মীর নাম স্থির হয়। তাঁহাদের অন্যতম প্রফুল্ল

চাকী। তিনি কিছুকাল পূর্বে ফুলার সাহেবের হত্যার ব্যাপারে খুব ক্ষিপ্রতা, সাহস, বুদ্ধি ও নির্ভীকতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আর একজন হইলেন নরেন গোঁসাই, শ্রীরামপুরের বিখ্যাত গোস্বামী পরিবারের সন্তান, পিতার একমাত্র পুত্র—বিবাহিত। নরেন গোঁসাই একবার আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে শেষ দেখা করিতে শ্রীরামপুরে গেলেন কিন্তু তারপর আসেন নাই। সুতরাং হেমচন্দ্র কানুনগো ক্ষুদিরামের নাম প্রস্তাব করিলেন,কারণ তিনি মেদিনীপুরে ক্ষুদিরামের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং তাঁহার সাহস ও শক্তির উপর আস্থা রাখিতেন। মেদিনীপুরে সত্যেন বসুকে লেখা হইল, ক্ষুদিরামকে কলিকাতায় প্রেরণ করা হউক। ক্ষুদিরাম কলিকাতায় পৌঁছিলেন ২৮শে এপ্রিল, ১৯০৮ সাল।

কিংসফোর্ডকে হত্যার জন্য হেমচন্দ্র এবং উল্লাসকর ১৫নং গোপীমোহন দত্ত লেনের বাড়ীতে একটি বিশেষ শক্তিশালী বোমা তৈরী করেন ; বোমাটীর সঙ্গে একটি কাঠের হাতল জোড়া ছিল। ইতিমধ্যে আর একটি Book Bomb ( খুব পাতলা ধরণের বোমা, যাহা কাগজের ভাঁজের মধ্যে রাখা যায় ) কিংসফোর্ডের কাছে পোষ্ট পার্শেলে পাঠান হয়। বইটি খুলিলেই বোমা ফাটিয়া যাইবে। কিন্তু ভাগ্যগুণে কিংসফোর্ড সাহেব সে বইখানি না খুলিয়াই রাখিয়া দিলেন।

বারীন ঘোষ ৩৮।৫ নং রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটে বোমা সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। সেখানে হেম দাসকে বিপ্লবীদের জন্য তিনটি পিস্তল, গুলি, টাকা, মজঃফরপুরের ম্যাপ এবং প্রয়োজনীয় উপদেশ দেওয়া হয়।

পুলিশের চোখে ধূলি দিয়া কলিকাতা হইতে মরণ অভিসারে চলিয়াছে দুইটি বালক, প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম,—কেহ কাহাকে জানে না; ষ্টেশনে প্রথম পরিচয়, পরিচয়ের সূত্র দেশপ্রেম, উদ্দেশ্য শত্রুহত্যা। প্রফুল্ল চাকী বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষিত হন কলিকাতা মুরারীপুকুরের বাগানে বারীন্দ্রের নিজের হাতে। ভূপেন্দ্র দত্ত বলেন—প্রফুল্ল চাকী অত্যাচারী রাজপুরুষের প্রাণ-হরণ করার জন্য নিজের জীবন ত্যাগকে ধর্মের সাধনা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্ষুদিরামের বাল্য জীবনের কিছু অংশ জানা যায়; কিন্তু প্রফুল্ল চাকীর সম্বন্ধে প্রায় সবই অজ্ঞাত। প্রফুল্ল চাকী রংপুর গুপ্ত সমিতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। প্রফুল্ল রংপুর জিলা স্কুলের ছাত্র ছিলেন; রাজনৈতিক সভায় যোগ দানের জন্য তাঁহার নাম ছাত্র-তালিকা হইতে কাটিয়া দেওয়া হয়। তখন প্রফুল্ল জাতীয় বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এই ঘটনার চার মাস পরে প্রফুল্ল বারীন্দ্র ঘোষের সঙ্গে পরিচিত হন। প্রফুল্ল বারীন্দ্রের সঙ্গে কলিকাতায় আসিয়া "দীক্ষা" গ্রহণ করেন। ১৯০৬ সাল থেকে ১৯০৮ সালের ১লা মে পর্যন্ত প্রায় সমস্ত বৃহৎ বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার সহিত প্রফুল্ল চাকীর যোগ ছিল। ফুলার সাহেব বধের জন্য প্রফুল্ল প্রথম রংপুর ষ্টেশনে চেষ্টা করেন তার পর গোয়ালন্দে; সর্বশেষে কলিকাতায় প্রথম বোমা, পরে রিভলবার। বীর ফুলার সাহেব কলিকাতায় আসিয়াই বিলাতে পলাইয়া যান—বলেন তাঁহার চাকুরী শেষ হইয়াছে। বারীন্দ্রের সঙ্গে প্রফুল্ল চাকী অনেকগুলি ডাকাতি প্রচেষ্টায় সংশ্লিষ্ট ছিলেন—প্রথমতঃ ১৯০৬

সালে রংপুর সহরের ১২ মাইল দূরে ; তারপর ১৯০৭ সালে বাঁকুড়ার কাছে হাসানডাঙ্গায় ; সর্বশেষ মেদিনীপুরে কাঁথি রোডে। প্রফুল্ল এণ্ড্রু ফেজারের হত্যা-প্রচেষ্টায় জড়িত ছিলেন ; বিশেষতঃ নারায়ণগড়ে। প্রফুল্লর সাহস, বুদ্ধি ও দেশপ্রেমের উপর সকলেরই গভীর বিশ্বাস ছিল।

প্রফুল্ল চাকী ক্ষুদিরামের সঙ্গে একত্র যাওয়ার জন্য ষ্টেশনে মিলিত হইলেন। তখন বিপ্লবীদলে সাধারণতঃ ছদ্ম নামেই পরিচয় হইত ; প্রফুল্লের ছদ্ম নাম ছিল দীনেশ, ক্ষুদিরামের নাম ছিল দুর্গাদাস সেন। তাঁহারা মজঃফরপুর ধর্মশালায় দুই বার আসেন। চিঠিপত্র লিখিতেন বারীন ঘোষের কাছে—সুকুমার তথা সুকুদা সম্ভাষণে।

পাচ ছয় দিন চেষ্টার পর প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম তাঁহাদের কর্ম-সূচী স্থির করিয়া ফেলিলেন। ক্লাব হইতে ফিরিবার পথে কিংসফোর্ড সাহেব প্রত্যহ ফিটনে আসেন, তাঁহার গাড়ীর ঘোড়া সাদা। প্রত্যাবর্তনের পথে গাড়ীর মধ্যে বোমা নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করিতে হইবে।

৩০ শে এপ্রিল সন্ধ্যার সময় দুইটি তরুণ কি ভীষণ কার্যের অপেক্ষায় বসিয়া আছেন, মনে কি ভীষণ চাঞ্চল্য—প্রতি মুহূর্ত যেন তাঁহাদের কাছে মূর্ত, নিজের নিঃশ্বাসের সঙ্গে নিজেই সচেতন হইয়া উঠিতেছেন—আর এক মুহূর্ত বাকী—ঐ অদূরে অশ্বের ক্ষুরধ্বনি—সেই শ্বেত অশ্ব, ঐ কিংসফোর্ড আসিতেছেন! অমনি অন্ধকারে ক্ষুদিরাম বোমা নিক্ষেপ করিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই গাড়ীতে ছিলেন দুইজন মহিলা

—মিসেস্ এবং মিস্ কেনেডী। আগ্রহের আতিশয্যে যুবকদের সময় নাই গাড়ীর ভিতর দেখিয়া লইবার; মুহূর্তের মধ্যে আগুন ধরিয়া গেল গাড়ীতে, তৎক্ষণাৎ দুইজন নিরপরাধ মহিলার মৃত্যু হইল।

হত্যার সংবাদ পাওয়া মাত্র পুলিশ সাহেব আসিলেন; ঘোষণা করিলেন দোষী ধরাইয়া দিলে ৫০০০ টাকা পুরস্কার। চারিদিকে সমস্ত থানায়, রেল স্টেশনে টেলিগ্রাম করা হইল। সমস্ত পথ পুলিশে ভরিয়া গেল। ক্ষুদিরাম চলিয়াছেন সমস্তি-পুরের দিকে—প্রফুল্ল পাটনার পথে।

প্রফুল্ল মোকামাঘাটে আসিয়া একখানি ইন্টার ক্লাস গাড়ীতে উঠিয়াছেন। পথে প্রফুল্ল তাঁহার জামা, জুতা, কাপড় সমস্ত পরিবর্তন করিয়া নূতন পোষাক পরিধান করিয়াছেন। সেই কামরায় ছিল মজঃফরপুরের সরকারী উকিল বাবুর পৌত্র নন্দলাল। সে পুলিশের দারোগা। প্রফুল্লের পোষাক দেখিয়া তাহার সন্দেহ হয়। প্রফুল্লের সঙ্গে সে পরিচয় করে এবং মজঃফরপুরের মেম সাহেবদের হত্যার কাহিনী বর্ণনা করে। প্রফুল্ল মন দিয়া শোনেন এবং মাঝে মাঝে দুই একটি প্রশ্ন করেন। কারণ একটু পূর্বেই নন্দলাল স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া প্রফুল্লের বিশ্বাসভাজন হইয়া-ছিল। প্রফুল্ল নন্দলালের সঙ্গে মোকামায় গঙ্গা পার হইয়া ট্রেণের দিকে অগ্রসর হইলেন। ইতিমধ্যে নন্দলাল রেলওয়ে পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টার পেনিকেট্‌কে তাহার সন্দেহের কথা জানায়। পাঁচ মিনিটের মধ্যে সমস্ত রেলওয়ে প্লাটফরম পুলিশ

দ্বারা সুসজ্জিত করা হইল। প্রফুল্ল নিশ্চিন্ত মনে পথের বন্ধু নন্দলালের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। সমস্ত বন্দোবস্ত হইয়া গেলে হঠাৎ নন্দলাল একজন কনেষ্টবলকে বলিয়া উঠিল— "ঐ,ঐ" কনেষ্টবল প্রফুল্লকে ধরিতে গেল।

প্রফুল্ল স্তম্ভিত! শুধু চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন— "আপনি না বাঙ্গালী? বাঙ্গালী হয়ে আমাকে ধরিয়ে দিলেন।"

প্রফুল্ল গঙ্গার দিকে দৌড় দিলেন—বোধ হয় উদ্দেশ্য ছিল গঙ্গায় ঝাঁপ দিবেন। কিন্তু সম্মুখেই পুলিশ; সে প্রফুল্লকে প্রায় ধরিয়া ফেলিল, প্রফুল্ল তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া দিলেন, মুহূর্ত্ত মধ্যে পিস্তল বাহির করিয়া লইলেন। অমনি আর একজন পুলিশ—সম্মুখে, পশ্চাতে, দক্ষিণে, বামে পুলিশ, যেন সপ্তরথী-বেষ্টিত অভিমন্যু। প্রফুল্ল গুলি ছুড়িতে লাগিলেন। এই কয়দিনের উত্তেজনা, পরিশ্রম, গত রাত্রির অনিদ্রা, প্রফুল্ল অবসন্ন। দুইদিন প্রায় অনাহার, তবু দৃঢ়মুষ্টি। প্রফুল্লর লক্ষ্য নন্দলাল কিন্তু সে তখন পিস্তলের লক্ষ্যের বাহিরে। প্রফুল্ল জীবন্ত পুলিশের কাছে ধরা দিবে না। পিস্তল নিজের দিকে লক্ষ্য করিলেন, চিবুক ভেদ করিয়া গুলি চলিয়া গেল। দ্বিতীয় গুলিতে প্রফুল্লের মৃতদেহ লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল পুণ্যসলিলা জাহ্নবীর তীরে—তাঁহার কণ্ঠ-নিঃসৃত শেষ শব্দ "বন্দেমাতরম্" —দূরে নন্দলাল স্তম্ভিত! সে অতটা ভাবে নাই।

প্রফুল্ল চাকীর মস্তক দেহচ্যুত করিয়া কলিকাতায় প্রেরণ করা হয়। সনাক্ত করিবার পর সেই মস্তক ৫৭-বি ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীটের বাড়ীতে সমাহিত করা হয়।

অন্যদিকে ক্ষুদিরাম পঁচিশ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া ওয়াইনি ষ্টেশনে উপনীত হইলেন—নগ্নপদ, মলিন বস্ত্র, রুক্ষ কেশ, সঙ্গে ভারি জিনিষ। পরিশ্রান্ত ও তৃষ্ণার্ত ক্ষুদিরাম মুদির দোকানে আসিয়া একটু জল চাহিলেন। মুদি জল দিয়াছে, পান-পাত্র মুখের সম্মুখে ; হঠাৎ দুইজন পুলিশ তাঁহাকে দেখিতে পাইল। পুলিশ দেখিয়া ক্ষুদিরাম স্থির কবিলেন উঠিয়া যাইবেন। এমন সময় পুলিশ আসিয়া পড়িল ও তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে লাগিল, তাঁহার উত্তর শুনিয়া পুলিশের সন্দেহ হইল। পুলিশ তাঁহাব হাত ধরিয়া ফেলিল, ক্ষুদিরাম হাত ছাড়াইবার জন্য জোবে টান দিল, অমনি কোমর হইতে পিস্তল পড়িয়া গেল। ক্ষুদিরাম দ্বিতীয় পিস্তল বাহির করিবার পূর্বেই আর একজন পুলিশ তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল—সেদিন ছিল ১লা মে, বেলা একটা।

তখন ক্ষুদিরাম জানেন না যে কিংসফোর্ড মরে নাই। আসামী গ্রেপ্তার হইয়াছে ও মজঃফরপুরে সংবাদ আসিয়াছে। সহব চঞ্চল, সন্ধ্যার সময় গাড়ীতে আসামী আসিতেছে। সমস্ত অধিবাসী ষ্টেশনে চলিল বোমাব আসামী দেখিবে। ষ্টেশন লোকারণ্য। গাড়ী অতি ধীরে ষ্টেশনে প্রবেশ করিল, সকলেই নীরব, যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া রহিয়াছে। সেই নীরবতা ভঙ্গ হইল অতি মৃদু কণ্ঠস্বরে “বন্দেমাতরম্।”

অকস্মাৎ আবার বন্দেমাতরম্—অমনি অযুত কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠিল—বন্দেমাতরম্ ; ট্রেনের মধ্য হইতে ঘন ঘন ধ্বনি উঠিতেছিল “বন্দেমাতরম্”। এমন সময় অতি শান্ত মুখ,

সস্মিত দৃষ্টি, চিন্তাহীন, সংশয়বিহীন একটি তরুণ বাঙ্গালী যুবক প্রথম শ্রেণী হইতে বাহিব হইয়া আসিলেন—ক্ষুদিরাম।

ক্ষুদিবামেব বিচাব আবম্ভ হইল ৮ই জুন। ইহাব মধ্যে তাঁহাব দুইবাব জবানবন্দী হইয়া গিয়াছে। দীনেশ, তথা প্রফুল্লকে বাঁচাইবাব জন্য তিনি সমস্ত দোষ নিজের স্কন্ধে নিয়াছেন। প্রফুল্লব জন্য তাঁহাকে কিছু মিথ্যা বলিতে হইয়াছিল। সে মিথ্যা ভাষণেব পাপ ক্ষুদিবাম দেশেব বৃহত্তব স্বার্থেব জন্য নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ কবিয়াছিলেন। বিচারের দিনে জজ মিঃ কাবেণডফ্ জিজ্ঞাসা কবিলেন—

"তুমি এই অপবাধ কবেছ ?"

উত্তব :—"হাঁ, আমি এই কাজ কবেছি।"

বিচারগৃহে সব লোক হতবাক্, মরণ-পাগল তরুণ বাঙ্গালী নিঃসংকোচে অপরাধ স্বীকাব কবিল। পবেব দিন কিংসফোর্ড সাক্ষ্য দিতে আসেন, ক্ষুদিবাম তাঁহার দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। শুধু একটি দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। বোধ হয় নিবাপরাধ দুইটি মহিলাব জন্য—তাহাদেব মৃত্যু ত ক্ষুদিরাম কামনা কবেন নাই!

এদিকে গবর্ণমেণ্ট পক্ষে উকিল; ব্যারিষ্টাব, পুলিশ, সাক্ষী চলিতেছে। ক্ষুদিবামেব পক্ষে বিনা পয়সায় কয়েকজন উকিল —মজঃফবপুরের কালিদাস বসু এবং পরে রংপুবেব ফুলকমল সেন, নগেন লাহিড়ী এবং সতীশ চক্রবর্তী। ক্ষুদিরাম তাঁহার মোকর্দমায় কোন উৎসাহ দেখান নাই, মাঝে মাঝে মোকর্দমার সময় তিনি নিদ্রায় অভিভূত হইতেন; হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইলে

স্বপ্নোত্থিত শিশুর মত চারিদিক চাহিয়া দেখিতেন। তারপর একদিন মোকর্দমার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হইল। জজ বলিলেন—

"মিসেস্ কেনেডী ও তাঁর কন্যাকে হত্যার অপরাধে ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসির আদেশ দেওয়া হইল।"

ফাঁসির আদেশ শুনিয়া ক্ষুদিরাম হাসিয়া উঠিলেন। জজ মনে করিলেন - বোধ হয় ক্ষুদিরাম দণ্ডাদেশ শুনে নাই বা বুঝে নাই। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন—

"তুমি তোমার দণ্ডাদেশ বুঝেছ?"

ক্ষুদিরাম হাসিমুখে উত্তর দিলেন—"হাঁ বুঝেছি, ফাঁসি ত, বেশ"—মুখে কোন চাঞ্চল্যের আভাস নাই।

জজ ক্ষুদিরামকে বলিলেন—"তুমি হাইকোর্টে আপিল করতে পার।"

ক্ষুদিরাম বলিলেন—"আমার কিছু বক্তব্য আছে।"

জজ বলিলেন—"সময় নেই। জেল সুপারিণ্টেন্ডেণ্টকে বলো—"

ক্ষুদিরাম উত্তর দিলেন—"আমি বোমা তৈয়ারী সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই।

জজ ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে পুলিশেকে আদেশ দিলেন—"জল্দি জেলমে লে যাও।" আদেশ পালিত হইল তৎক্ষণাৎ।

কালিদাস বাবু অনেক চেষ্টা করিয়া হাইকোর্টে আপিল করিলেন; কিছুই হইল না। তারপর ছোট লাটের নিকট প্রাণ ভিক্ষা করিলেন তাঁহার ভগ্নী, কোন ফল হইল না। কালিদাসবাবুর আগ্রহে শেষবার আবার করুণা ভিক্ষার জন্য

বড়লাটের নিকট আবেদন করা হইল। ব্রিটিশের সেই বদান্যতা নাই। শত্রুর প্রতি চিরকাল তারা নির্মম, নিষ্করুণ,—জোয়ান অব আর্ক হউক, নেপলিয়ানই হউক আর ক্ষুদিরামই হউক।

১০ই আগষ্ট ১৯০৮সাল—আগামী কাল ক্ষুদিরামের ফাঁসী। ফাঁসীর আদেশের পর হইতেই তিনি গীতা পাঠ করিতেন। মাঝে মাঝে রামকৃষ্ণদেবের উপদেশ, বঙ্কিমচন্দ্র পাঠ করিতেন।

মৃত্যুর পূর্বদিন ক্ষুদিরামের অন্তিমবন্ধু কালিদাস বাবু তাঁহার সঙ্গে দেখা করেন। এমন বন্ধু মানুষ জীবনে কমই পায়। কালিদাসবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার অন্তিম-বাসনা থাকেতো বল।" ক্ষুদিরাম বলিলেন ঃ—

"আগামী কল্য মৃত্যুর পূর্বে চতুর্ভুজার প্রসাদ খেয়ে বধ্যভূমিতে যেতে ইচ্ছা করে।" কালিদাসবাবু তাঁহার এই শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছিলেন।

১১ই আগষ্ট মঙ্গলবার ক্ষুদিরাম ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যাত্যাগ করিলেন, স্নান করিয়া ভগবানের নাম করিলেন,তারপর জল্লাদ অপেক্ষা করিতে লাগিল। জল্লাদ আসিয়া তাঁহার হস্তদ্বয় পশ্চাৎ দিকে বদ্ধ করিয়া দিল, চক্ষুদ্বয় বস্ত্রাবৃত করিয়া দিল। মৃত্যুজয়ী বীর অতি অতি ধীর পদক্ষেপে ফাঁসির মঞ্চের দিকে অগ্রসর হইলেন। মুখে অপূর্ব প্রশান্তি! জল্লাদ ম্যাজিষ্ট্রেটের ইঙ্গিতে ফাঁসির রজ্জু পরাইয়া দিল। ক্ষুদিরাম বলিয়া উঠিল—"ফাঁসির দড়িতে আবার মোম দেওয়া কেন?" মরণকে সে যে মরণরূপেই পাইতে চায়, মরণের অঙ্গুলি আবার কোমল হইবে কেন? মরণবিজয়ী ছেলের পক্ষেই এই ভাবে মৃত্যুকে

পরিহাস সম্ভব! মুহূর্ত মধ্যে তাঁহার পদনিম্ন হইতে কাষ্ঠখণ্ড দূরে সরিয়া গেল। বাঙ্গালার প্রথম বিপ্লবী নশ্বরদেহ পিঞ্জর ত্যাগ করিয়া অমরধামে চলিয়া গেল।

৯ টার সময় মৃতদেহ জেলের বাইরে আনয়ন করা হইল, তখনও সঙ্গে ছিলেন অন্তিমের বন্ধু কালিদাস বাবু। ছয় জন শ্মশান-বন্ধু শব স্কন্ধে গণ্ডক নদীর তীরে লইয়া গেলেন। গভর্ণমেণ্টের নিষেধ সত্বেও সহস্র সহস্র নরনারী ক্ষুদিরামের মৃতদেহের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশের জন্য গণ্ডকের তীরে উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যার রক্তিম আকাশে গণ্ডক তীরে সূর্যের শেষ রশ্মির সঙ্গে চিতার অগ্নিশিখায় ক্ষুদিরামের পুণ্যদেহ ভস্মীভূত হইয়া গেল—

আজও ভিখারী পথে পথে গান গাহিয়া বেড়ায়ঃ—

মাগো! বিদায় দে মা, ঘুরে আসি
হাঁসি হাঁসি গলায় পরব ফাঁসি,
দেখবে ভারতবাসী।
কলের বোমা তৈরী করে, বসেছিলাম গাছটি ধরে
জজ সাহেবকে মারব বলে, মারলাম দুইটি নির্দোষী,
বিদায় দে মা ঘুরে আসি।
হাতে যদি থাকতো ছোরা, ক্ষুদিরাম কি পড়ত ধরা,
রক্তে হ'ত ছড়াছড়ি (মা) দেখতো ভারতবাসী।

*    *    *    *

দশমাস দশদিন পরে, ক্ষুদিরাম তোর আসবে ফিরে
( মাগো ক্ষুদিরাম তোর আসবে ফিরে )
চিনতে যদি না পারো মা, দেখবে গলায় ফাঁসি
বিদায় দে মা ঘুরে আসি।

১লা মে ১৯০৮সাল—কলিকাতার সমস্ত সংবাদপত্রে প্রচারিত হইল মজঃফরপুরে বোমা চলিয়াছে, প্রফুল্ল চাকী মোকামা ষ্টেশনে আত্মহত্যা করিয়াছে। ওয়াইনি ষ্টেশনে ক্ষুদিরাম ধরা পড়িয়াছে; আত্মহত্যা করিতে পারে নাই। ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীর সংবাদ পাইয়া বারীন্দ্র ঘোষ সকল বিপ্লব-কেন্দ্রকে যথাসম্ভব সতর্ক করিয়া দিলেন। অনেক বিপ্লবী পলাইয়া গেল; উল্লাসকর দত্ত কতকগুলি বোমার বাক্স লইয়া ৫।৬ হ্যারিসন রোডের বাড়ীতে আত্মগোপন করিলেন। হেমচন্দ্র মাণিকতলার বাগান হইতে ১১নং গোপী মোহন দত্ত লেনের বাসায় চলিয়া আসিলেন। মাণিকতলা বাগানের অস্ত্রগুলি ও বোমা নির্মাণের কারখানার জিনিষপত্র ভূগর্ভে প্রোথিত করা হইল। রাত্রি শেষের পূর্ব হইতে পুলিশ মাণিকতলা বাগান ঘেরিয়া ফেলিল। প্রভাতের পূর্বেই পুলিশ ৩০ জনকে গ্রেপ্তার করিল। মাটি খুঁড়িয়া অস্ত্রশস্ত্র বাহির করিল। হেমচন্দ্র গোপীমোহন দত্ত লেনে, উল্লাসকর হ্যারিসন রোডে, অরবিন্দ গ্রে ষ্ট্রীটে "নবশক্তি" অফিসে গ্রেপ্তার হইলেন। শ্রীঅরবিন্দকে

পুলিশ হাতকড়ি লাগাইয়া কোমরে দড়ি বাঁধিয়া রাস্তা দিয়া সাধারণ অপরাধীর মত লইয়া চলিল।

তাহার পরদিন গ্রে ষ্ট্রীটের বাসা হইতে দেবব্রত বসু ( পরে প্রজ্ঞানন্দ স্বামী ) গ্রেপ্তার হইলেন। নরেন গোঁসাইও গ্রেপ্তার হইল, সেইদিনই গোপীমোহন দত্ত লেনে কানাইলাল ও নিরাপদ রায়কে গ্রেপ্তার করা হইল—মোট গ্রেপ্তার হইলেন ৪৭ জন।

বাংলার বিভিন্ন স্থানে খানাতল্লাসী ও গ্রেপ্তার চলিল। মেদিনীপুরে সত্যেন বসু, যোগজীবন, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি গ্রেপ্তার হইলেন; শ্রীহট্টে সুশীল সেন, তাহার দুই ভাই বীরেন ও হেমচন্দ্র, মালদহে কৃষ্ণজীবন, যশোরে বীরেন ঘোষ, খুলনায় সুধীর।

বারীন্দ্র ঘোষ একটু ভাবপ্রবণ, উদাসী ; তাই তিনি সমস্ত অপরাধ স্বীকার করিয়া নিজের উপর দায়িত্ব লইলেন। তিনি বলিলেন—"আমি আমার বন্ধু অবিনাশ ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে লইয়া বিপ্লব কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি। আমিই উল্লাসকর ও উপেন্দ্রকে লইয়া বিপ্লব কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি—আর সকলেই নির্দ্দোষ"। স্থিরবুদ্ধি উপেন বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন—ইংরেজ গভর্ণমেন্টের উচ্ছেদ সাধন করিবার জন্যই আমি বিপ্লবীদের নেতৃত্ব করিতাম।" সত্যাশ্রয়ী উল্লাসকর বলিলেন—"ইংরেজ রাজত্বের উচ্ছেদ সাধনই আমার জীবনের ব্রত, এই মহৎ কার্য্য সম্পাদনের জন্য আমি নিজে জীবন পণ করিয়া বোমা আবিষ্কার করিয়াছি,আমারই তৈরী বোমা ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী কিংস-

ফোর্ডের গাড়ীতে ছুঁড়িয়া মারিয়াছিল। আমিই বারীনদার সঙ্গে নারায়ণগঞ্জে গিয়া বোমার সাহায্যে ছোট লাটের ট্রেণ উল্টাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম……

কিন্তু এই সমস্ত দায়িত্ব লওয়া সত্বেও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আসামীদের সকলকেই বিচারের জন্য পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীরামপুরের নরেন গোস্বামী সরকার পক্ষের সাক্ষী হইয়া অনেক গোপন তথ্য প্রকাশ করিয়া দিল। তাহাকে শাস্তি দিবার জন্য আলীপুর জেলে ষড়যন্ত্র করিল সত্যেন বসু ও কানাইলাল দত্ত।

কানাইলালও শ্রীরামপুরের লোক। জন্ম ১৮৮৭ সাল; স্থান,—চন্দননগর, ডাকনাম কানাই, ভাল নাম সর্ব্বতোষ; পিতা চুণীলাল দত্ত, মাতা ব্রজেশ্বরী দেবী। কানাই শ্যামবর্ণ, দীর্ঘদেহ, আয়ত চক্ষু, বুদ্ধিব্যঞ্জক উন্নত ললাট। পাঁচ বৎসর মাতুলালয় চন্দননগরে, তারপর চারি বৎসর বোম্বাইয়ে পিতার নিকট লেখাপড়া করেন। ১৯০৩ সালে চন্দননগরে আসিয়া তিনি ডুপ্লে কলেজে ভর্তি হন। ডুপ্লে কলেজ হইতে এণ্ট্রাস ও ফার্ষ্ট আর্টস পাশ করেন। ফরাসী ভাষায় তাঁহার বেশ পটুতা ছিল; তাঁহার অনুসন্ধিৎসা ও পাঠানুরুচি অধ্যাপকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কানাই বিখ্যাত অধ্যাপক চারুচন্দ্র রায়ের অতি প্রিয় ছাত্র হইয়া উঠিলেন। হুগলী কলেজে ইতিহাসে অনার্স পড়ার সময় চারুবাবু বিশেষ যত্নসহকারে তাঁহাকে সাহায্য করেন। চারুবাবুর প্রভাবে কানাইলাল স্বদেশী ভাবাপন্ন হইয়া উঠিলেন।

চন্দননগর তখন বিপ্লবীদের পীঠস্থান, কারণ ফরাসীদেশে অস্ত্র আইনের শিথিলতা বিপ্লবীদের অস্ত্র আমদানী করার সুযোগ দিয়াছে। ১৯০৬ সনের শেষ দিকে চন্দননগরে অনেক অস্ত্রশস্ত্র ফরাসী দেশ হইতে আনা হয়। কিশোরী শ্যামপুঁই ২২টী পিস্তল ফ্রান্স হইতে পার্শেলে আনান। এইগুলি বারীন্দ্র ঘোষ ও অবিনাশ ভট্টাচার্যের হাতে গিয়া পড়ে। চারুবাবুকে কেন্দ্র করিয়া একটী বিপ্লবচক্র গড়িয়া উঠে। সেখানে লাঠিখেলা, মুষ্টিযুদ্ধ, বক্সিং, ব্যায়াম, বন্দুক ছোড়া শিক্ষা দেওয়া হইত। কিন্তু ইংরেজের পরামর্শে চন্দননগরের ফরাসী কর্তারা আইন করিয়া অস্ত্র আমদানী বন্ধ করিবার চেষ্টা করেন। এই ব্যাপার লইয়া চন্দননগরে বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। তাহার কিছুদিন পরে চন্দননগরে একটী স্বদেশী সভার আয়োজন করা হয়। কিন্তু চন্দননগরের মেয়র মঁশিয়ে তার দি ভেল সেই আয়োজন নষ্ট করিয়া দেন। বিপ্লবীরা তার দি ভেলের জীবন-নাশের চেষ্টায় তাঁহার গৃহে বোমা নিক্ষেপ করে। মেয়র তখন নীচের ঘরে আহার করিতেছিলেন। বিপ্লবীরা জানালার শিকের ভিতর দিয়া হাত গলাইয়া বোমা নিক্ষেপ করে। কিন্তু বোমার মধ্যে পিক্রিক এসিড পুরাতন থাকায় বোমা ভাল কাজ করিল না। ইহাতে চন্দননগরে ভীষণ চাঞ্চল্য জাগে।

কানাইলালও এই চাঞ্চল্য হইতে মুক্তি পান নাই। তাঁহার দাদার বন্ধু উপেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ছিল। ১৯০৭ সালের শেষ ভাগে কানাইলাল কলিকাতায় গিয়া উপেন্দ্রনাথের

সঙ্গে দেখা করিলেন এবং বিপ্লব কেন্দ্রে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু উপেনবাবু তাহাকে বলিলেন "বি, এ, পরীক্ষার দেরী নাই, পরীক্ষাটা শেষ ক'রে এসো।"

বি, এ, পরীক্ষার পর কানাইলাল আবার কলিকাতায় গিয়া যুগান্তর অফিসে উপেনবাবুর সঙ্গে দেখা করেন। বারীন্দ্র ঘোষের সহিত এই সময়ে তাঁহার বিশেষ পরিচয় হয়। তখন যুগান্তরের অফিস ছিল চাঁপাতলায়। বারীনবাবু তাঁর ম্যালেরিয়াগ্রস্ত শরীর দেখিয়া স্বাস্থ্য লাভের জন্য তাঁহাকে পুরীতে পাঠাইয়া দেন। কিছু কাল পরে বায়ু পরিবর্তন করিয়া তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

তখন মাণিকতলা বাগানে বোমার কাজ খুব জোরে চলিয়াছে। সেখানে ধর্ম ও কর্মের সমন্বয় চলিতেছে। উপেন বাবু এই কেন্দ্রের "মোহন্ত"। তাঁহার অধীনে নবাগত বিপ্লবীরা ইতিহাস, রাজনীতি ও ধর্মগ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিত এবং বারীন্দ্র ও উল্লাসকরের অধীনে অতি বিশ্বাসী বিপ্লবীরা বোমা প্রস্তুত-প্রণালী শিক্ষা করিত। কানাইলালের ধর্মের বহিরাবরণের প্রতি বিশেষ কোন আকর্ষণ ছিল না বলিয়া তাঁহাকে মাণিকতলার বাগানে রাখা হইল না ; তাঁহাকে চট্টগ্রামে পাঠান হইল। কিন্তু সেখানে ভাল না লাগায় তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। সেখান হইতে তাঁহাকে ভবানীপুরে হেমচন্দ্র কানুনগোর অধীনে বোমা তৈয়ারী শিক্ষার জন্য পাঠান হইল। অতিশয় নিপুণ হস্তে অসাধারণ নিষ্ঠার সঙ্গে কানাইলাল নিজেকে নির্দিষ্ট কর্মে নিয়োজিত করিয়া দিলেন।

কানাইলাল চিরকালই স্বল্পভাষী এবং নীরব কর্মী, সুতরাং তিনি সহজে বিপ্লবী কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিলেন না; কিন্তু যে কার্যের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হইত সে কার্য নিপুণভাবে সম্পন্ন করিতেন।

প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরামকে মজঃফরপুরে পাঠাইবার পরে ভবানীপুরের বাড়ী ত্যাগ করিয়া তিনি ১৫নং গোপীমোহন দত্তের লেনে চলিয়া আসেন। সেখানে কানাইলাল ও নিরাপদ রায়ের উপরে সমস্ত জিনিষ রক্ষণাবেক্ষণের ভার দেওয়া হয়।

২রা মে পুলিশ সে বাড়ী ঘেরাও করিয়া কানাইলাল, নিরাপদকে গ্রেপ্তার করে। কানাইলালের উপরে অজস্র অত্যাচার হইলেও তিনি পুলিশের কাছে নিজের নামধাম পর্যন্ত প্রকাশ করেন নাই।

এই বিচিত্র কল্পনা, বিপুল কর্মপ্রচেষ্টা, বিরাট আয়োজনের কি শোচনীয় পরিণাম! সমস্ত জিনিষটা যেন স্বপ্নের মত প্রভাতের আলোকে বিলীন হইয়া গেল। বারীন্দ্র বলিয়া উঠিলেন—"My misson is over"—আমার কাজ সমাপ্ত; উপেনবাবু বলিলেন—"সে কথার প্রতিধ্বনি ত নিজের মধ্যে খুঁজিয়া পাইলাম না।" সামান্য পাহারাওয়ালারও প্রাণ নিয়া এই রকম ছিনিমিনি খেলা ভাল লাগে নাই,—পাহারাওয়ালা পথে বলিয়াছিল, "বাবুজি আপ লোগ কি তরফসে আগর একঠো ভি গোলি চল্‌তি তব হাম লোগ ভাগ পড়তা।" দেশী পুলিশদেরও সহানুভূতি ছিল। একজন পুলিশ সার্জেণ্ট উপহাস করিয়া বলিয়াছিল, "These boys are so simple that

they did not not feel it ncessary to keep a watch on the way"—এই বালকগুলি এমন সুশীল যে একটি পাহারা পর্যন্ত পথে নাই। বাস্তবিকই এখন মনে হয় নেতৃবৃন্দ আগুন লইয়া খেলা করিয়াছিলেন ; আগুন যে নিজেদের ঘর জ্বালাইয়া দিতে পারে, নিজের হাত পোড়াইয়া দিতে পারে, তাহা কল্পনা করেন নাই। অভিজ্ঞতার অভাব ছাড়া কি বলিব ?

কয়েকদিনের মধ্যেই সমস্ত আসামীদের পুলিশ কোর্টে উপস্থিত করা হইল। বারীন্দ্র ঘোষের বিলাতে জন্ম ; সুতরাং "কালা চামড়া" হইলেও "কালাপানির" অপর পারে জন্ম বলিয়া তাঁহার বিচার হাইকোর্টে হইবে স্থির হইল। জুরীর বিচার হইবে, কারণ বিলাতী মাটির গুণে অস্ত্র আইনের প্রয়োগ সেখানে নাই। কিন্তু বারীন্দ্র সেই সুযোগ প্রত্যাখ্যান করিলেন। সকলের মোকর্দমা আলীপুর কোর্টে আরম্ভ হইল। একমাত্র উল্লাসকরের মামলা হাইকোর্ট ও আলীপুর দুই জায়গায় আরম্ভ হইল।

গভর্ণমেণ্ট ভাবিলেন—এই মোকর্দমার উপরই ভারত-সাম্রাজ্যের ভিত্তি নির্ভর করে। সরকার পক্ষে ছিলেন বিখ্যাত ব্যারিষ্টার নর্টন, বার্টন, উইথহল'এবং আশু বিশ্বাস। তদ্বিরকারক হইল পুলিশের সি, আই, ডি ইন্‌স্পেক্টর মৌলবী সামসুল আলম। গভর্ণমেণ্ট সত্যই এই সব বিপ্লবীদের কার্যে অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন। আসামীদের বেলা ৯টার সময় হাতকড়া ও কোমরে দড়ি বাঁধা অবস্থায় গাড়ী ভর্তি করা হইত। দুইখানি ঘোড়ার গাড়ীর চারিদিকে থাকিত বহু সশস্ত্র পুলিশ

প্রহরী, গাড়ীর অগ্রে পশ্চাতে মার্চ করিয়া চলিত অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যবাহিনী! সেই জালে ঘেরা গাড়ীর মধ্য হইতে তেজোদীপ্ত কণ্ঠে "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি উত্থিত হইত, ভক্তিপ্লুত কণ্ঠে উদাত্তস্বরে দেশমাতৃকার সংগীত উচ্চারিত হইত। গাড়ীগুলি যখন রাজপথ অতিক্রম করিত তখন উভয় পার্শ্বের পথচারী পথিক অবাক বিস্ময়ে সেই অপরূপ দৃশ্য অবলোকন করিত, এবং এই উন্মাদনাকারী ধ্বনি শ্রবণ করিত। এই সব আসামীদের একটিবার দেখিবার জন্য সহস্র সহস্র নাগরিক পথিপার্শ্বে সমবেত হইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত করিত, তাহার পর তাহারাই আদালত-প্রাঙ্গণ পূর্ণ করিয়া ফেলিত। এখানে "বন্দেমাতরম" ধ্বনি উত্থিত হইয়া আদালত প্রাঙ্গণ প্রকম্পিত করিত। পুলিশ আসিয়া জনতা ছত্রভঙ্গ করিয়া দিত। আদালতের ভিতর একটি সুবৃহৎ লৌহ পিঞ্জর ছিল, আসামীদের আনিয়া তাহাব মধ্যে একে একে বসান হইত। হেমচন্দ্র, উল্লাসকর সেই পিঞ্জরের মধ্যে বসিয়াই গান জুড়িয়া দিতেন। শ্রীঅরবিন্দ ভিন্ন সকল আসামীই তাহাতে যোগ দিতেন। এমন সময় দেখা যাইত নরেন্দ্র গোস্বামীকে রাজসম্মানে আদালত গৃহে প্রবেশ করান হইতেছে এবং বিচারকের পার্শ্বে রক্ষিত একটি আসনে তাহাকে সমাদরে উপবেশন করান হইতেছে।

জেলের জীবন যে সেই যুগে কি ভীষণ ছিল তাহা উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের "নির্ব্বাসিতের আত্মকথা," ও অরবিন্দের "কারা কাহিনীতে" পাওয়া যায়।

জেলের মধ্যে আসিয়া সকলেই বেশ একটু রসিক হইয়া উঠিলেন। কানাইলালের সহজগম্ভীর জীবন তখন নূতন স্পর্শে আমোদিত হইয়া উঠিল। বন্দী ছেলেদের অনেকেই সারাদিন কোর্টের কাঠগড়ায় কেউ নিদ্রার সাধনা করে, কেউ উকিলদের হাতনাড়া লক্ষ্য করে, সাক্ষীদের বিব্রত অবস্থা দেখিয়া হাসিয়া উঠে। রাত্রিতে আসিয়া তাহারা অভিনয় করে—কেহ জজ হয়, কেউ উকিল, কেউ সাক্ষী, কেউ আসামী, কেহ গান গায়, কেহ নাচে। অরবিন্দ, দেবব্রত বসু, বারীন্দ্র এই সবে যোগ দিতেন না। বারীন্দ্র যেন কেমন হইয়া গিয়াছিলেন; তিনি একটি চাদর গায়ে দিয়া মাথামুড়ি দিয়া শুইয়া থাকেন আর ভাবেন। কানাইলালের জেল জীবন সম্বন্ধে উপেন্দ্রনাথ বলেন :—

"কানাইলাল প্রভৃতি চার পাঁচজন নিদ্রার কাজটা সন্ধ্যার পরেই সারিয়া লইত, রাত ১০টা-১১টার সময়ে সকলে যখন ঘুমাইয়া পড়িত তখন তাহারা বিছানা ছাড়িয়া কাহার কোথায় সন্দেশ, আম বা বিস্কুট লুকান আছে তাহার সন্ধান করিয়া ফিরিত। যে দিন সে সব কিছু মিলিত না, সেদিন একগাছা দড়ি দিয়া কাহারো হাতের সহিত অপরের কাছা বা কাহারো কাপড়ের সহিত অপরের পা বাঁধিয়া দিয়া ক্ষুন্নমনে শুইয়া পড়িত। একদিন রাত্রি প্রায় ১টার সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখি কানাই একজনের বিছানার চাঁদরের তলা হইতে প্রায় একটা বিস্কুটের টিন চুরি করিয়া মহানন্দে বগল বাজাইতেছে। অরবিন্দবাবু পাশেই শুইয়া ছিলেন। আনন্দের সশব্দ অভিব্যক্তিতে

তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। কানাই অমনি খান-কয়েক বিস্কুট লইয়া তাঁহার হাতের মধ্যে গুঁজিয়া দিল, বিস্কুট লইয়া অরবিন্দবাবু চাদরের মধ্যে মুখ লুকাইলেন। নিদ্রাভঙ্গের আর কোন কারণ দেখা গেল না; চুরিও ধরা পড়িল না।”

এই সমস্ত খাবার আসিত আসামীদের আত্মীয়-স্বজনদের বাড়ী হইতে—আসামীরা প্রায় সকলেই সম্ভ্রান্ত বিত্তশালী ঘরের সন্তান।

জেলের মধ্যে স্বীকারোক্তি করাইবার জন্য, সংবাদ সংগ্রহের জন্য প্রায়ই সি, আই, ডির শুভাগমন হইত। উপেন বাবু বলেন—“ইহার সপ্তাহ খানেক পরে নরেন্দ্র গোস্বামী যেন হঠাৎ একটু বেশী অনুসন্ধিৎসু হইয়া দাঁড়াইল। বাংলা ছাড়া ভারতের অন্য কোথাও বিপ্লবের কেন্দ্র আছে কি না, আর থাকিলে নেতাদের নাম কি ইত্যাদি অনেক রকম প্রশ্নই সে আমাদের জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। জেলের কর্তৃপক্ষের এক আধ জনের কথা শুনিয়া বুঝিলাম একটা গোলমাল কোথাও লাগিয়াছে।”

হৃষীকেশ একদিন আসিয়া আমাকে বলিল—“গোটা দুই তিন বেয়াড়া রকমের মাদ্রাজী বা বর্গি টর্গির নাম বলিয়া দিতে পারিস?”

“কেন?”

“নরেন বোধ হয় পুলিশকে খবর দিচ্ছে। গোটা কতক উদ্ভট্ রকমের নাম বলে দিতে পারলে স্যাঙাৎরা দেশময় অশ্বডিম্ব খুঁজে খুঁজে বেড়াবে খন। তাহাই হইল। মহারাষ্ট্রীয়

কেন্দ্রের সভাপতি হইলেন শ্রীমান পুরুষোত্তম নাটেকার, গুজরাটের সভাপতি হইলেন কিষণজী ভাওজী বা এই রকমের কেহ। কিন্তু মাদ্রাজের ভার লইবেন কে? মাদ্রাজী নাম যে তৈয়ারী করা শক্ত। খবরের কাগজে তখন চিদাম্বরম্ পিলের নাম দেখা গিয়াছিল। হৃষীকেশ বলিল, যখন চিদাম্বরম্ মাদ্রাজী নাম হইতে পারে তখন বিশ্বম্ভরম্ কি দোষ করিল? আর পিলের বদলে যকৃৎ বা অমনি একটা কিছু পুরিয়া দিলেই চলিবে।"

এই ভাবে তীব্রধী উপেন বাবু ও রসিক হৃষীকেশ পুলিশকে খুব হয়রান করিয়াছিলেন। মাসের পর মাস তাহারা নরেনের কাছে এই সব নাম পাইয়া মাদ্রাজ, বোম্বে, পুণা, সাতারা, গুজরাট তন্ন তন্ন করিয়া অযথা বহু লোককে বিপর্যস্ত করিয়াছিল ও নিজেরাও বিপর্যস্ত হইয়াছিল।

বিচার চলিতে লাগিল, কিন্তু কাগজপত্র প্রস্তুত হয় নাই বলিয়া কিছুদিনের জন্য মামলা স্থগিত রহিল। এই সময়ে পুলিশ স্বীকারোক্ত সাক্ষীর সন্ধান করিতেছিল। নরেন্ গোস্বামীর পিতা দেবেন বাবু, একজন মোক্তার এবং সামসুল আলম জেলে আসিয়া নরেন গোস্বামীর সঙ্গে গোপনে কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন। এই সময়ে নরেন গোস্বামীকে সুযোগ দেওয়ার জন্য সমস্ত আসামীকে এক জায়গায় একটি ছোট ঘরে রাখা হয়। কারণ, সে সকলের সঙ্গে মিশিয়া খবর বাহির করিবার সুযোগ পাইবে। ক্রমশঃ প্রায় সকলেই নরেনের স্বরূপ

বুঝিতে পারিল। নরেনকে বোকা বানাইবার জন্য এবং সেই সঙ্গে পুলিশকে জব্দ করিবার জন্য সম্ভব-অসম্ভব অনেক গুপ্ত কথা এবং মিথ্যা লোকের নাম বলিয়া দেওয়া হয়। তাহাতে অনেক নিরপরাধ লোককে হয়রাণ হইতে হয়।

যুবকদের মধ্যে কেহ কেহ নরেনকে শাস্তি দিতে মনস্থ করিল। সুশীল সেন বলিল—"নরেনকে গলা টিপে মেরে ফেলব। নচেৎ ইট ছুড়ে মাথা গুঁড়ো করব।" কিন্তু বারীন্দ্রকুমার তাহাতে আপত্তি করেন; কারণ ইহাতে শ্রীঅরবিন্দও জড়াইয়া পড়িবেন। কৃষ্ণজীবন নরেনের সঙ্গে কথান্তরে পেটে ভীষণ লাথি মারিল। ক্রমশঃ নরেন বুঝিল তাহাকে অনেকে সন্দেহ করে। সে নিরাপদ নয়। সে স্থির করিয়াছিল যে বোমার মামলার পর সে দেশ ছাড়িয়া সপরিবারে বিলাত চলিয়া যাইবে। তখন পুলিশ তাহাকে জেলের ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডে রাখিল। দুইজন ইউরোপীয় কয়েদী তাহার শরীররক্ষী রূপে দেওয়া হইল। সকলেই বুঝিল নরেনের সব স্বীকারোক্তি যদি সাক্ষীর সময় জুরীর সম্মুখে প্রমাণ করিতে পারে তবে আসামীদের পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক হইবে।

এই ব্যাপার লইয়া উপেন্দ্র, উল্লাসকর. বারীন্দ্র, হেমচন্দ্র প্রভৃতি নেতা খুব বিচলিত হইয়া উঠিলেন। বারীন্দ্রের মস্তিষ্কে কতকগুলি উদ্ভট কল্পনা আসিয়াছিল। তিনি একবার বলিলেন—"জেলখানায় অনেকগুলি রিভলভার আনিয়া সকল রাজবন্দী একসঙ্গে পলায়ন করিয়া কাবুল চলিয়া যাইবে। খানাতল্লাসীর সময় প্রাপ্ত সমস্ত বোমা রিভলভার ভরা একটি কাঠের বাক্স জেলখানায় ছিল। উহা দখল করিয়া ভাঙ্গিতে

হইবে।” এই প্রচেষ্টার কথা পুলিশের কানে যায়। তখন অতিরিক্ত প্রহরীর ব্যবস্থা করা হইল। এই উদ্দেশ্যে হেমচন্দ্র মাত্র একটি পুরাতন পিস্তল যোগাড় করিতে পারিয়াছিলেন। তারপর যে ভাবেই হউক নরেনকে হত্যা করাই সাব্যস্ত হইল। কিন্তু ব্যাপার খুব সহজ নয়। যাহা হউক, বাহিরে যে সব বিপ্লবী ছিল তাহাদের উপর গোঁসাই বধের ভার দেওয়া হইল। কিন্তু বাহিরের দল তখন অত্যাচারের মুহ্যমান; প্রধান নেতার সব জেলে। দ্বিতীয় শ্রেণীর বিপ্লবী দল আত্মরক্ষায় ব্যস্ত।

সত্যেন বসু নরেনের ব্যাপার শুনিয়া প্রথম হইতেই নরেনকে হত্যা করবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হন। তিনি হেমচন্দ্রকে বলেন—“যদি রিভলভার যোগাড় হয় তবে আমি চেষ্টা করিতে পারি।” তাঁহাকে পুরাতন পিস্তলটী দেওয়া হইল। আলিপুরে আসার পূর্বেই সত্যেনের ক্ষয়কাশ হইয়াছিল। তিনি প্রথমেই জেলের হাসপাতালে থাকিতেন। সত্যেন পূর্বে গভর্ণমেণ্ট আফিসের কেরাণী ছিলেন। মোকর্দমায় পরিণতি সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল। সুতরাং তিনি নরেন গোঁসাই-এর স্বীকারোক্তির গুরুত্ব অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। তারপর ভাবিলেন, “আমার জীবন আর কয় দিন! ক্ষয়কাশ-রোগী, সুতরাং বৃথা মরা অপেক্ষা নরেনকে মারিয়াই মরিব!”

হেমচন্দ্র রিভলভার আনয়নের চেষ্টায় রহিলেন। নরেন গোঁসাইয়ের বধ-যজ্ঞে সত্যেনের জীবনের পূর্ণাহুতি

হইবে বলিয়া স্থির হইল। নরেনের বিশ্বাস উৎপাদন করিতে হইবে। সত্যেন নরেনকে বলিয়া পাঠান যে, জেলের কষ্ট তাঁহার সহ্য হইতেছে না, তিনি নরেনের মত সরকারী সাক্ষী হইতে চান। সুতরাং পুলিসের কাছে কি কি বলিতে হইবে তাহা যদি দুইজনে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া স্থির করে, তাহা হইলে আদালতে জেরার সময় কষ্ট পাইতে হইবে না। তবে নরেনকে অনুগ্রহ করিয়া পুলিসের সঙ্গে তাঁহার মুক্তির ব্যবস্থা করিতে হইবে। মানুষের স্বভাব এই যে মন্দ কাজের জন্য সঙ্গী চায়, তাহাতে মনের জোর হয় এবং অন্তরের দোষ-প্রবৃত্তি একটা অবলম্বন পায়। মন তখন ভাবে, আমার মতন আরও লোক পৃথিবীতে আছে। সুতরাং মন অসৎ কাজে আরও বেশী অগ্রসর হয়। নরেন পুলিসের সি, আই, ডি সামস্থল আলমকে বলিয়া দিল যে সত্যেনও স্বীকারোক্তি করিতে চায়। সামস্থল আলমের উপদেশ মত নরেন সত্যেনকে কি কি বলিতে হইবে তাহা শিক্ষা দিতে লাগিল।

এদিকে আর বেশী দিন নাই, ১লা সেপ্টেম্বর নরেনের সাক্ষী হইবে। তাহার সাক্ষীর উপর মোকর্দমার অনেকটা নির্ভর করে। সেদিন কোর্টে নরেন অনেক নূতন তথ্য প্রকাশ করিবে ইহা সত্যেন জানিত। সুতরাং ১লা সেপ্টেম্বরের পূর্বেই তাহাকে শেষ করিতে হইবে। ভাল পিস্তলের জন্য অপেক্ষা করা যায় না। বিপ্লবীদের অসাধ্য কিছুই ছিল না। মরণ যাদের খেলার সাথী তাদের আবার ভয় কি? নূতন পিস্তল আসিয়া পৌঁছিল বুদ্ধির জোরে, টাকার জোরে, সাহসের জোরে। কিন্তু পিস্তল

হাঁসপাতালে সত্যেনের কাছে পৌঁছিবে কি করিয়া? কানাই-লাল সে ভার লইলেন। কানাই একটু পরেই সেলে আসিয়া চাদর ঢাকা দিয়া শুইয়া পড়িলেন। সবাই জিজ্ঞাসা করিল, কি হইয়াছে? উত্তর, "আমি শব সাধনা করছি"। কানাইলালের ভীষণ পেটে যন্ত্রণা হইল, অসম্ভব চীৎকার করিতেছেন। ডাক্তার আসিল এবং মন্তব্য করিল এখনই একে হাঁসপাতালে পাঠান দরকার। কানাইলাল আধ ঘণ্টার মধ্যেই হাঁসপাতালে পৌঁছিয়া গেলেন। পিস্তল যথাস্থানে পঁহুছিল।

এদিকে সত্যেন স্থির করিয়াছেন—কাল ১লা সেপ্টেম্বর, ভোরে ৭টার সময় নরেন ও সত্যেন শেষবার তাঁহাদের স্বীকারোক্তি গুলিকে মাজিয়া ঘসিয়া লইবেন। সত্যেন ও কানাই স্থির করিলেন, ভোর ৭টার সময় শেষ চেষ্টা করিবেন; গোঁসাই-বধ যজ্ঞের শেষ আহুতি দিতে হইবে। তাঁহারা তখন নরনেকে মারিবার জন্য মরিয়া হইয়া উঠিয়াছেন। ব্যবস্থা হইল, ভোরে সত্যেন ডিস্‌পেনসারীর ঘরে আসিয়া নরেনের সঙ্গে পরামর্শ করিতে বসিবে। কানাইলাল বাহিরের বারান্দায় দাঁতন করিবেন। সত্যেন প্রথম গুলি চালাইবেন, তাহা যদি ব্যর্থ হয় তবে কানাই চেষ্টা করিবেন।

১লা সেপ্টেম্বর নরেন ভোরবেলা ডিস্‌পেন্সারীর ঘরে আসিয়াছে, সত্যেন পূর্ব হইতে সেখানে অপেক্ষা করিতে-ছিলেন। আজ সর্বশেষ গোপন পরামর্শ, সুতরাং নরেনের দেহরক্ষী শ্বেতাঙ্গ কয়েদী হিগিন্‌স্ অন্যত্র সরিয়া গেল। কানাই এতক্ষণে বাহিরের বারান্দায় দাঁত মাজিতেছেন।

কথা শুনিতে শুনিতে সত্যেন তাঁহার নিজ মূর্তি ধারণ করিলেন। হাতে হাতিয়ার, সম্মুখে শত্রু, অন্তরে প্রতিহিংসা। নরেন চীৎকার করিয়া উঠিল, পলাইতে চেষ্টা করিল; সত্যেন গুলি চালাইলেন, নরেনের উরুদেশে গুলি বিদ্ধ হইল। পিস্তলের শব্দ ও নরেনের চীৎকার শুনিয়াই কানাই বুঝিলেন— আর সময় নাই, তিনি পলায়মান নরেনকে গুলি করিলেন। গুলি নরেনের গায়ে না লাগিয়া প্রাচীর গাত্রে বিদ্ধ হয়। হিগিন্স নামক শ্বেতাঙ্গ কয়েদীটি গুলির শব্দে ছুটিয়া আসিয়া সত্যেনকে ধরিতে চেষ্টা করেন। সত্যেনের একটি গুলি হিগিন্সের মণিবন্ধ ভেদ করে। সত্যেন এক পদাঘাতে তাহাকে ভূপাতিত করিয়া নরেনের পশ্চাদানুসরণ করিলেন। আহত হইয়াও নরেন ততক্ষণে হাঁসপাতালের গেট পার হইয়া গিয়াছে। প্রহরী গেটের তালাবন্ধ করিয়া দিল, কানাই গেটের সম্মুখে আসিয়া দেখিলেন দ্বার রুদ্ধ, তিনি গেটকিপারের বুকের উপর পিস্তল লক্ষ্য করিয়া গেট খুলিয়া দিতে আদেশ করিলেন। বেচারা গেটকিপার কানাইয়ের সংহার মূর্তি দেখিয়া প্রাণভয়ে দরজা খুলিয়া দিল। সেই সময়ে ক্ষয়রোগগ্রস্ত সত্যেনও রুদ্রবেগে কানাইয়ের সঙ্গে একত্রিত হইলেন। অন্যদিকে জেলার ও লিণ্টন নামক অপর একটি শ্বেতাঙ্গ কয়েদী নরেন্দ্রের সাহায্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সত্যেন তাহাদের প্রতি পিস্তল লক্ষ্য করিলেন। জেলার বেচারা প্রাণভয়ে কারখানা ঘরের একটা ভাঙ্গা বেঞ্চির নীচে আত্ম-গোপন করিয়া রহিল। লিণ্টন সত্যেনকে জড়াইয়া ধরিল।

সত্যেন লিণ্টনকে ভীষণ জোরে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিলেন। এমন সময় কানাইয়ের গুলি লিণ্টনের কানের পাশ দিয়া চলিয়া গেল। গুলি নরেনকে বিদ্ধ করিল, লিণ্টন হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এতক্ষণে সত্যেন আবার গুলি করিলেন নরেন্দ্রকে। লিণ্টন কানাইকে ধরিতে চেষ্টা করে। কানাই লিণ্টনকে গুলি করিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার লক্ষ্য নরেন; তিনি গুলি অযথা ব্যবহার করিবেন না। সুতরাং তিনি লিণ্টনকে পিস্তলের কুন্দা দিয়া কপালে আঘাত করিলেন। ইতিমধ্যে নরেন, গুলি খাইয়া নর্দমার মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে। কানাই নর্দমার মধ্যেই নরেনকে আবার গুলি করেন। সত্যেন ও কানাই নরেনকে সর্বসমেত ৯টি গুলি করেন - ৪টি নরেনের শরীরে বিদ্ধ হয়, ডিস্‌পেন্সারীতে একটি, প্রাচীরে দুইটি, হিগিন্‌সের গায়ে লাগে একটি। শেষ গুলি নর্দমার ভিতর নরেনের বুকে, আর গুলি নাই। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে মনে করিয়া উভয়ে পিস্তল ফেলিয়া দিলেন, নির্ভয়ে নিঃসংকোচে সানন্দে তাঁহারা গ্রেপ্তারের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

জেলারবাবু ততক্ষণে তাঁহার আশ্রয়স্থল বেঞ্চির নীচ হইতে আত্মপ্রকাশ করিলেন। কানাই জেলারের অবস্থা দেখিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"আসুন, জেলার বাবু, আপনার ভয় নাই, রিভলভার ফেলে দিয়েছি। নির্ভয়ে গ্রেপ্তার করুন। আমার কার্যোদ্ধার হয়ে গেছে।"

কানাইকে জিজ্ঞাসা করা হইল—একটি গুলিও নিজের জন্য রাখা হয় নাই কেন? কানাই উত্তর দিয়াছিলেন,—যদি

narrow escape হয়ে যায়, (রগ ঘেসে যায়) অর্থাৎ ব্যর্থ হয়। তাই যত গুলি পিস্তলে ছিল, সব একে একে নরেনের শরীরে চালিয়েছি, কি জানি দুর্বিপাকে যদি বেঁচে উঠে।”

নরেনকে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। পাঁচ মিনিটের মধ্যে গোঁসাই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

জেলের মধ্যে হৈ-চৈ লাগিয়া গেল, কেহ বলিল বোমা নিক্ষেপ করিয়াছ, কেহ বলিল গুলি চালাইয়াছে। পাহারাদার বলিল, ‘বোমা হুয়া’। জেলের নিয়ম অনুযায়ী পাগলা-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, সমস্ত গেট বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল, সিপাহীরা বন্দুক হাতে পাহারায় দাঁড়াইয়া গেল। সমস্ত আসামীদের খানাতল্লাসী করা হইল। ইহার পূর্বে বিপ্লবীরা জানিত কি ব্যাপার। তাহারা সকলেই যার কাছে যাহা কিছু ছিল সব লুকাইয়া ফেলিল। খানাতল্লাসীর পর সকলকেই এক ডিগ্রিতে বন্ধ করা হইল। ভিন্ন ভিন্ন কুঠরীর ৪৪ ডিগ্রিতে ৪৪টি কুঠরী আছে, খুব সুরক্ষিত। ১নং ও ২নং জেলে ফাঁসীর আসামী রাখা হইত, অন্যগুলিতে দুর্দমনীয় কয়েদীদের রাখার ব্যবস্থা হইল। সত্যেন ও কানাইকে ১নং ও ২নং কুঠরীতে রাখা হইল। মিলিটারী ও গোরা পাহারায় বসিয়া গেল। প্রতিদিন আসামীদের ঘর বদল করা হয়—দুই বেলা খানাতল্লাসী হয়। কর্তাদের ভয় হইল আসামীরা জেল ভাঙ্গিয়া পলাইয়া যাইবে। খানাতল্লাসীতে কোন পিস্তল পাওয়া গেল না। তখন কেহ বলিল, পিস্তল সব জেলের পুকুরে ফেলা হইয়াছে। হুকুম হইল—পুকুরের জল সেঁচিয়া

ফেল, অবশ্য শেষ পর্যন্ত তাহা করা হয় নাই। কেহ বলিল, কাঁঠালের মধ্যে করিয়া পিস্তল পাঠান হইয়াছে, কেহ বলিল মিষ্টান্নের ঝুড়িতে। শিবাজী যদি মিষ্টান্নের ঝুড়ির মধ্যে লুকাইয়া কারাগারের বাইরে যাইতে পারে তবে পিস্তল লুকাইয়া কারাগারে আসিবে না কেন? অবশ্য সত্যি কথা এই যে পুরাতন পিস্তলটি মিষ্টান্নের ঝুড়িতে আসিয়াছিল, কিন্তু শেষের পিস্তলটি বর্ধমানের শ্রীশচন্দ্র ঘোষ জেলের মধ্যে সাক্ষাতের সময় কাপড়ে বাঁধিয়া উপেনবাবুর হাতে দেন। কি ভীষণ দুঃসাহসের কাজ—যেমন শ্রীশবাবুর পক্ষে তার চেয়েও বেশী উপেনবাবুর পক্ষে।

জেলকর্তৃপক্ষ প্রথম জিজ্ঞাসা করিল কানাইকে—"পিস্তল কোথায় পেলে?" কানাই উত্তর দেন, "তার প্রয়োজন কি? নরেন দেশের শত্রু তাই তাকে খুন করেছি।"

ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রশ্নের উত্তরে কানাই বলিয়াছিলেন "গোঁসায়ের জীবননাশের জন্য কেবল আমি ও সত্যেন দায়ী।"

ম্যাজিষ্ট্রেট আবার জিজ্ঞাসা করেন, "তাহলে তুমি স্বীকার কর যে তোমরা গোঁসাইকে খুন করেছ; যদি ইচ্ছা না কর তাহলে উত্তর দেওয়ার দরকার নাই।"

কানাই উত্তর দিয়াছিলেন—"আমি বলতে চাই যে আমি তা'কে খুন করেছি, কেন খুন করলাম তার কোন কারণ বলতে চাই না—না, কারণটা বলা দরকার—নরেন গোঁসাইকে দেশদ্রোহিতার সমুচিত শাস্তি দিয়েছি।"

মোকর্দমার শেষে ব্যারিষ্টার মিঃ এস, সি, ব্যানার্জীর

বক্তৃতার পরে জজ কানাইকে জিজ্ঞাসা করেন—তুমি পূর্বের কোন কথা প্রত্যাহার করিতে চাও কি ?"

কানাই বলিলেন—"আমি সেদিন বলেছিলাম, 'আমি ও সত্যেন খুনের জন্য দায়ী'—কেবল এই কথাটি প্রত্যাহার করতে চাই—আজ বলতে চাই—আমি একাই খুন করেছি, আর কেউ আমাকে সাহায্য করেনি।"

উপস্থিত সকলে কানাইএর অপূর্ব সাহস ও বন্ধু সত্যেনের প্রাণরক্ষার চেষ্টায় আপন স্কন্ধে সমস্ত দোষ তুলিয়া লওয়ার জন্য স্তম্ভিত হইয়া গেল। জজসাহেব হাতের কলম রাখিয়া দিলেন, তার পর কানাইয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন।

জজ ও জুরীরা কানাইকে হত্যাপরাধী বলিয়া ঘোষণা করেন। তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়।

সত্যেনের ব্যাপারে ৫ জন জুরী নির্দোষ বলেন। জজ জুরীদের সঙ্গে একমত না হইয়া মতের জন্য হাইকোর্টে মোকর্দমা প্রেরণ করেন ; হাইকোর্ট সত্যেনের ফাঁসির আদেশ দেয়। অনেকেই বলিলেন—বিনা প্রমাণে ফাঁসির হুকুম। কানাইলালের বিচার সত্যেনের পূর্বেই শেষ হইয়া গিয়াছিল এবং কানাইলাল কোন আপীল করিতে স্বীকৃত হন নাই। ১০ই নভেম্বর কানাইলালের ফাঁসির দিন ধার্য হইল। তাহার পূর্বদিন হঠাৎ দেখা গেল কানাইয়ের কুঠরীর দরজা খোলা, অন্যান্য আসামীরা ইহাতে একটু আশ্চর্য হইল। তাহারা কানাইলালের কুঠরীর দিকে অগ্রসর হইল।

প্রহরীরা কোন বাধা দিল না। আগামীকাল ফাঁসী হইবে; সুতরাং প্রহরীরা একটু দয়াপরবশ হইয়া বন্ধুদের সঙ্গে শেষ দেখা করিবার চেষ্টায় বাধা দিল না। তাঁহার সেল দূরে ছিল। তাহারা কেহ অবশ্য কানাইলালের সঙ্গে কথা বলিতে পারে নাই, শুধু দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়া মনে মনে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিল; কেহ বা দুই এক বিন্দু অশ্রুমোচন করিল। কানাই হাত তুলিয়া সকলকে প্রণাম করিলেন—কি আনন্দ তাঁর মুখে! উপেনবাবু তাঁহার "নির্ব্বাসিতের আত্মকথায়" লিখিয়াছেন, "যাহা দেখিলাম তাহা দেখিবার মত জিনিষই বটে! আজও সেই ছবি মনের মধ্যে স্পষ্ট জাগিয়া রহিয়াছে। জীবনের বাকি কয়টা দিনও থাকিবে। জীবনে অনেক সাধু-সন্ন্যাসী দেখিয়াছি, কিন্তু কানাইর মত এমন প্রশান্ত মূর্তি আর একটিও দেখি নাই। সে মুখে চিন্তার রেখা নাই, বিষাদের ছায়া নাই, চাঞ্চল্যের লেশমাত্র নাই। প্রফুল্ল কমলের মত তাহা যেন আপনার আনন্দে আপনি ফুটিয়া রহিয়াছে।"

দণ্ডাদেশের পর হইতে কানাইলালের দেহের ওজন ১৬ পাউণ্ড অর্থাৎ ৮ সের বাড়িয়া যায়। যেন মনের আনন্দে, চিত্তের প্রফুল্লতায় তিনি শিশুর মত প্রতি অঙ্গে নবজীবনের স্পন্দন অনুভব করিতেছিলেন। মৃত্যু অতি সন্নিকট জানিয়াও তাঁহার অতি শান্ত, নিবিড় নির্বিকার ভাব একটুও বিকৃত হয় নাই। জীবন-মৃত্যু তাঁহার কাছে তুল্যমূল্য হইয়া গিয়াছে, কানাইলাল তখন পরমহংস।

কানাইলালের মা ও তাঁহার বড় ভাই মৃত্যুর পূর্বে

কয়েকবার তাঁহার সহিত দেখা করিয়াছেন। কানাইলাল মাকে সান্ত্বনা দিয়াছেন, "মা আমার জন্য তোমরা কিছু ভেবো না, আমি ভাল জায়গায় যাচ্ছি।" মা জিজ্ঞাসা করিলেন—"কানাই তোর কিছু খেতে ইচ্ছা ক'রছে?" কানাইলাল উত্তর দিলেন, "যা দরকার তা' তো পাচ্ছি মা, এর উপর আর কিছু চাই না।"

১০ই নভেম্বর, মঙ্গলবার কলিকাতায় তখন শীতের কুয়াশা আকাশ জুড়িয়া আছে, ঊষার অরুণরাগ তখনও পূর্বাকাশকে রঞ্জিত করে নাই। প্রায় তিনশত সশস্ত্র শাস্ত্রী আলিপুর জেলকে ঘেরিয়া ফেলিল। সাড়ে পাঁচটার সময় পুলিশ কমিশনার হেলিডে, ডেপুটি কমিশনার এবং আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বোমপাস্ জেলখানায় প্রবেশ করেন। পশ্চাতে অনুগৃহীত সাংবাদিকগণ এবং কয়েকজন দর্শক বধ্যভূমিতে প্রবেশ করিলেন। ঘড়িতে ছয়টা বাজিয়া গেল। ভগবানের নাম করিয়া কানাইলাল অঘোরে ঘুমাইতেছিলেন, ওয়ার্ডার আসিয়া নিদ্রাভঙ্গ করিল। কানাই-লালের কক্ষের দ্বারও মুক্ত হইল। কানাইলাল পুরাণের একটা প্রিয় অংশ পাঠ করিলেন। তারপর বলিলেন "আমি প্রস্তুত, আমাকে নিয়ে চল।" মিঃ বোমপাস্, হেলিডে, জেলার এবং ডাক্তার শ্রেণীবদ্ধ হইয়া কানাইলালকে বধ্যভূমির নিকট লইয়া চলিল। কানাইলালের দুই হস্ত পৃষ্ঠদেশে আবদ্ধ। নির্ভীক প্রশান্ত পদসঞ্চারে কানাইলাল ফাঁসীর মঞ্চের দিকে অগ্রসর হইয়া গেলেন। জল্লাদ তাঁহার

মাথায় টুপী ও চোখে মুখে আবরণ পরাইয়া দিতে আসিল। কানাইলাল তাঁহার চশমা ও পুরাণখানি জেল সুপারিণ্টেডেণ্টের হাতে দিয়া বলিলেন, "মৃত্যুর পরে আমার দাদাকে দিয়ে দেবেন।" তারপর ফাঁসীর মঞ্চে উঠিয়া নিজের হাতে ফাঁসীর টুপী ও চোখমুখের আবরণ উন্মোচন করিয়া ফাঁসীমঞ্চে দাড়াইলেন। জল্লাদ ফাঁসির দড়ি গলায় পরাইয়া দিল, তৎক্ষণাৎ ম্যাজিষ্ট্রেটের ইঙ্গিতে ফাঁসীমঞ্চের পদনিম্ন কাষ্ঠ সরিয়া গেল। কানাইলালের নশ্বর দেহ বিলম্বিত হইয়া পড়িল। মুহূর্ত মধ্যে একটি অবিনশ্বর আত্মা নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া পুণ্যধামে চলিয়া গেল।

বেলা নয়টার সময় কানাইলালের ভ্রাতা আশুতোষ দত্ত, মতিলাল রায় এবং আরও তিনজন বন্ধু জেলের বাহিরে তাঁহার দেহ বহন করিয়া আনিলেন। জেলের বাহিরে অসংখ্য বন্ধুবান্ধব, পরিচিত-অপরিচিত দেশবাসী শবযাত্রায় যোগ দিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। কানাইলালের পুণ্যললাট রক্তচন্দনে অবলিপ্ত করিয়া দেওয়া হইল। খাটিয়ার উপর সুগন্ধি পুষ্পস্তবক দ্বারা শয্যা রচনা করা হইল। শবদেহকে নূতন বস্ত্র পরিহিত করা হইল—গলদেশে একখণ্ড চাদর পরাইয়া দেওয়া হইল—যেন বরবেশে নবীন যুবক চলিয়াছে বিবাহ-বাসরে। শবদেহ বহন করিয়া প্রহরী-নির্দেশিত পথে কালীঘাটের দিকে শ্মশানবন্ধুগণ যাত্রা করিল। দুই পার্শ্বের অলিন্দ হইতে, ছাদ হইতে অসংখ্য শঙ্খধ্বনি করিয়া শবযাত্রাকে অভিনন্দিত করা হইল। বৃক্ষের চূড়ায়, গৃহের ছাদে,পথের পার্শ্বে ক্রমশঃই লোকসংখ্যা বর্ধিত হইতে লাগিল। 'বন্দেমাতরম্'

ধ্বনিতে সমস্ত পথ মুখরিত হইয়া উঠিল ; একটিবার কানাই-লালের দেহ স্পর্শ করিবার জন্য জনতা অধীর হইয়া উঠিল। শোভাযাত্রা শ্মশানে উপস্থিত হইল। চন্দননগরের মতিলাল রায় শ্মশানে কানাইলালের সংক্ষিপ্ত জীবনী বলিতে আরম্ভ করিলেন। তৎক্ষণাৎ জনসমুদ্র 'মন্থিত সাগরের' মত নীরব হইয়া রহিল ; শব্দহীন মহাম্বুধি ! তারপর তাঁহার আত্মার কল্যাণে প্রার্থনা করা হইল।

ইতিমধ্যে চন্দনকাষ্ঠের চিতা সুসজ্জিত হইয়াছে, ঘৃত, চন্দন কাষ্ঠ, পুষ্পরাশি কোথা হইতে যে আসিল কেহ জানে না—কানাইলালের ভ্রাতা শবদেহে অগ্নি সংযোগ করিলেন। চক্ষের পলকে চিতানল জ্বলিয়া উঠিল, সন্ধ্যার পূর্বে সমস্ত দাহকার্য শেষ হইয়া গেল। তারপর আরম্ভ হইল চিতাভস্ম সংগ্রহের জন্য জনতার চেষ্টা, সারারাত্রি ব্যাপিয়া দেশবাসী সকলে চিতাভস্ম সংগ্রহ করিতে লাগিল। কালীঘাটের সমস্ত দোকানের সিন্দুর কৌটা ফুরাইয়া গেল। মতিলাল রায়, চারুচন্দ্র দত্ত ও আশুতোষ কানাইলালের চিতাভস্ম ও অস্থি লইয়া চন্দননগরে কানাইএর মাতৃদেবীর নিকট উপস্থিত হইলেন। ততক্ষণে সমস্ত চন্দননগর কানাইলালের গৃহে আসিয়া কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। অযুত কণ্ঠে আকাশ নিনাদিত করিয়া কানাই-জননীকে দেশমাতৃকার আসনে বসাইয়া দেশবাসী নত হইয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করিল—**বন্দে মাতরম্।**

"I have great admiration for him (Jatin). He was the only Bengali who died fighting from a trench."

—Sir Charles Teggart

Commissioner of Police, Calcutta.

কানাইলালের ফাঁসী হইয়া গেল; তাহার এগার দিন পরে ২১শে নভেম্বর ১৯০৮ সালে সত্যেন্দ্র বসুরও ফাঁসী হইল : আলীপুরে বোমার মামলা যথারীতি চলিতে লাগিল, মরণ-পাগল বিপ্লবী দল অধীর হইয়া উঠিল। সমস্ত দিনরাত্রি তাহারা নির্জন কারাকক্ষে অতিবাহিত করিত, প্রাতে 'লপ্‌চী' অর্থাৎ ফেনমিশান ভাত; দ্বিপ্রহরে রেঙ্গুনী চালের অন্ন, অড়হর ডাল, ডাঁটা ও পাতা সিদ্ধ এবং তেঁতুল গোলা জল, রাত্রিতে দ্বিপ্রহরের পুনরাবৃত্তি—তেঁতুল-জল বিহীন।

বাসনের মধ্যে লোহার থালা ও বাটি ; থালাটা এত হাল্কা যে ভাত খাইবার সময় উহা নৃত্য করিতে থাকে, একহাতে চাপিয়া না রাখিলে জেলের অমৃত ব্যঞ্জন পলায়ন করিতে চেষ্টা করিত। বাটিটি অপূর্ব জিনিষ, শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় 'বিলাতী সিভিলিয়ান' অর্থাৎ সর্বকার্যে বিশারদ। তিনি বলেন "বাটির জাত নাই, বিচার নাই, কারাগৃহে যাইয়া যেই বাটিতে শৌচক্রিয়া করিলাম, সেই বাটিতেই মুখ ধুইলাম, স্নান করিলাম ; অল্পক্ষণ পরে আহার করিতে হইল, সেই বাটিতেই ডাল বা তরকারী দেওয়া হইল, সেই বাটিতেই জল পান করিলাম এবং আচমন করিলাম, এমন সর্বকার্যক্ষম মূল্যবান বস্তু ইংরাজের জেলে পাওয়াই সম্ভব। তৈজসপত্রের মধ্যে ছিল দুইখানি আলকাতরা মাখান চুবড়ী, প্রস্রাবের জন্য একটি গামলা। প্রাতে ও সন্ধ্যায় মেথর পরিষ্কার করিত, কিন্তু অসময়ে ব্যবহার করিলে পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত দুর্গন্ধ ভোগ করিতে হইত। টিনের বালতিতে খানিকটা জল রাখা হইত। তাহাতে স্নান, শৌচ, মুখ ধোওয়া সব কাজ করা হইত। দারুণ গ্রীষ্মে ক্ষুদ্র কুঠরীতে অসম্ভব জল পিপাসা। অদম্য তৃষ্ণা লাঘবের জন্য ঐ গরম বালতির অর্ধ-উষ্ণ জলপান করা হইত। শয্যা ছিল বিলাসের বস্তু—দুইখানি কম্বল, একখানি পাতিবার, আর একখানি গায়ে দিবার ; বালিসের ত' কয়েদীর জন্য ব্যবস্থাই নাই, কাজেই একখানি কম্বলকে ভাঁজ করিয়া বালিস তৈয়ারী করা হইত।"

এই সমস্ত দুঃখকে বিপ্লবীরা দুঃখ বলিয়াই মনে করিত না। তাহাদের সর্বাপেক্ষা আঘাতের বস্তু ছিল নিঃসঙ্গতা। ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ—তিনদিকে প্রাচীর, সম্মুখে একটুখানি শূন্য স্থান, তারপর আবার অভ্রভেদী প্রাচীর; সেই প্রচীর তাহাদিগকে সর্বক্ষণ নীরব ভাষায় সদম্ভে তর্জনী সঞ্চালন করিয়া বলিয়া দিত—"তোমরা বন্দী, তোমরা বন্দী, তোমাদের স্বাধীনতা নাই, তোমাদের মুক্তি নাই।" এই পরিবেশের মধ্যে বিপ্লবীগণ অস্থির হইয়া উঠিল। তাহার উপর কানাই ও সত্যেনের ফাঁসীর পর তাহারা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া মরণকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করিত। উল্লাসকর, হেমচন্দ্র প্রায়ই ব্যারিষ্টার নর্টন ও সি, আই, ডি আলমকে তর্জনী চালনা করিয়া ভয় দেখাইতেন, তাহারা অন্তরে ভীত হইলেও বাইরে অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া নিরুত্তরে চলিয়া যাইত। এমন সময় ১০ই জানুয়ারী কানাই-এর প্রেতাত্মার ত্রৈমাসিক তর্পণ করিল আদালত প্রাঙ্গণে তরুণ যুবক চারুচন্দ্র বসু—উকিল আশু বিশ্বাসকে হত্যা করিয়া। চারুচন্দ্রের একটি হস্ত পক্ষাঘাতগ্রস্ত, সেই হাতটির সঙ্গে পিস্তল বাঁধা ছিল যেন লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়, আর অন্য হাতে পিস্তলের ট্রিগার টানিয়াছিলেন। চারুচন্দ্র বিচারের সময় বলিয়াছিলেন—"এই অবশ হাতে অন্য কাজ সম্ভব হয় নাই, যতটুকু পারি কাজ করিয়া গেলাম।" তারপরেই আলীপুরের মোকর্দমার গুপ্তচর রজনী পালের ব্যবস্থা; সে ছদ্মবেশে পুলিশের চর হইয়া যুগান্তরের অফিসে কাজ করিত, তাহার গোপন সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া

অনেকগুলি লোক ধরা পড়ে। জ্যোতিষ ঘোষ রজনীকে একদা রজনীতে তার স্বগ্রামে বাঁকুড়াতেই গুপ্ত-সংবাদ সংগ্রহের পুরস্কার স্বরূপ পরলোকে প্রেরণ করিলেন। পুলিশের কোন চেষ্টাই রজনীর প্রাণরক্ষা করিতে পারে নাই।

আলীপুরে মোকর্দমা চলিতেছে, দেশের লোক পুলিশের অত্যাচারে বিব্রত হইয়া উঠিয়াছে, যুবকদল পুলিন দাসের নেতৃত্বে পূর্ববঙ্গে বিপ্লবলীলা আরম্ভ করিল। পুলিন দাস অনুশীলন সমিতির মধ্য দিয়া যুবকদের মধ্যে সন্ত্রাসবাদ প্রচার করিতে লাগিলেন; অনুশীলন সমিতির পাঁচশত শাখা স্থাপন করা হইল। ছাত্রবৃন্দ আবার ঢাকায় নূতন করিয়া দেশমাতৃকা-পূজার "দীক্ষা" গ্রহণ করিতে লাগিল। "আনন্দমঠের" সন্তানদের দীক্ষার অনুকরণে পূর্বদিন সংযম করিয়া তারপর উপবাস করিয়া, রক্তচন্দন ভূষিত হইয়া গভীর নিশীথে "রমনা সিদ্ধেশ্বরী কালী বাড়ী"তে দেশের কাজে প্রাণ উৎসর্গীকৃত করিবার দীক্ষা গ্রহণ করিত, কি অপূর্ব উন্মাদনা!

পুলিশের বড় সাহেব লোমান হত্যার চেষ্টা করিয়া বিনয় বসু দ্বীপান্তরের যাত্রী হইলেন। এই মোকর্দমা শেষ হওয়ার পূর্বেই স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্র জিতেন্দ্রনাথ ওভারটাউন হলের মধ্যেই এণ্ডু ফেজারের বুকের উপর পিস্তল রাখিয়া তিনবার গুলি করিলেন। গুলি বাহির হইল না, পিস্তল খারাপ ছিল, জিতেন্দ্রের দশ বৎসর জেল হইল। তারপরই প্রফুল্ল চাকীর গ্রেপ্তার ব্যাপারে

জড়িত নন্দলাল দারোগাকে হত্যা করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে ঢাকায় সুকুমার গোয়েন্দাকে হত্যা করা হয়। বিপ্লবীদল তখন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে।

৬ই মে আলীপুরের জজ, তাঁহার বিচারের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আদালত গৃহ জনাকীর্ণ, সকলের মুখেই আশঙ্কা—কাহার ভাগ্যে কি হয় কে জানে? প্রায় পৌনে দশটার সময় আসামীদের গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল, বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে আকাশ মুখরিত করিয়া বন্দীগণ গাড়ী হইতে অবতরণ করিল। এমন সময় সি, আই, ডি সামসুল আলমকে আদালতে প্রবেশ করিতে দেখিয়া উল্লাস-কর বলিয়া উঠিলেন—"সামসুল ভাই, এইবার ফাঁসীর হুকুম হবে, শীঘ্র পান সিগারেট খাওয়াও নতুবা তোমাকে শেষ ক'রব।" অদ্ভুত এই উল্লাসকর, উল্লাস যেন তার সর্ব ব্যাপারে সর্বক্ষণ সহযাত্রী। সামসুলও ব্যঙ্গ করিয়া উত্তর দিল—"দাঁড়াও দাদা, রায় বে'র হ'লে পান সিগারেট খাওয়াব।" এত করুণ ও শঙ্কিত আবেষ্টনীর ভিতরও মুহূর্তের জন্য আদালত গৃহ হাস্যমুখরিত হইল। জজ তাঁহার সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে বলিতে আরম্ভ করিলেন—"বারীন ও উল্লাস-করের মৃত্যুদণ্ড......." কথা শেষ না হইতেই উল্লাস উল্লসিত-কণ্ঠে চীৎকার করিয়া বারীন্দ্রকে বলিলেন—"বারীনদা, শালাদের মেরে দিয়েছি"—অর্থাৎ পূর্বে উল্লাসকরের যে সাত বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছিল তাহা আর তাহাকে দিয়া ভোগ করাইতে পারিবে না, সুতরাং ফাঁসি কাষ্ঠে চড়িয়া সে ব্রিটিশের

দণ্ডকে ফাঁকি দিবে, এই বলিয়া উল্লাসকর প্রায় নৃত্য করিতে লাগিলেন। সামসুল আলম ও অন্যান্য কর্মচারীরা তাঁহাকে বহু কষ্টে শান্ত করিল। তারপর আবার জজ সাহেব বলিতে আরম্ভ করিলেন—হেমচন্দ্র, উপেন, হৃষীকেশ, ইন্দু রায়, সুধীর সরকার, শৈলেন বসু, বিভূতি সরকারের দ্বীপান্তর। সাত জনের দশ বৎসর কারাবাস ; অরবিন্দ,দেবব্রত প্রভৃতি আট জন নির্দোষ বলিয়া ঘোষিত হইলেন।

আদালত গৃহে ভীষণ চাঞ্চল্য দেখা দিল। শাস্তি বা মুক্তির কোন পার্থক্য রহিল না। মুক্ত আসামীরা গৃহযাত্রা করিলেন, দণ্ডিত আসামীরা আবার জেলে যাত্রা করিলেন। আদালত প্রাঙ্গণেই সকলে "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি করিয়া তাঁহাদিগকে অভিনন্দন জানাইল, সঙ্গে সঙ্গে সহস্র কণ্ঠে গীত হইল—

"তোরা দেখে যা' বাঙ্গালীর আত্মবলিদান।"

হাইকোর্টে আপীল করা হইল। চিত্তরঞ্জন দাশ অদ্ভুত পরিশ্রম করিয়া তিন মাস মোকদ্দমা করিতেছেন। হঠাৎ ২০শে জানুয়ারী (১৯০৮) অপরাহ্নে কোর্টের কার্যান্তে যখন সামসুল সিঁড়ি অবতরণ করিয়া নীচে নামিতেছিল, একটি যুবক তাহার পথরোধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—Are you Shamsul Alam" (আপনি কি সামসুল আলম)? উত্তর শুনিল—"Yes" (হাঁ)। যুবক ক্ষিপ্র হস্তে পিস্তল বাহির করিল, সামসুল ব্যাপার গুরুতর বুঝিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল —"পাক্‌ড়াও, পাক্‌ড়াও"। কে কাহাকে পাকড়াইবে? গুড়ুম গুড়ুম শব্দে সামসুল আলমের কথার

প্রতিধ্বনি হইল। সামস্থল আলম যে আদালতের কাজকে এত ভালবাসিত সেই আদালতেই সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। যুবকটি বন্দী হইল, তাহার নাম বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত।

বোমার মামলার আপীলের রায় বাহির হইল। বারীন্দ্র এবং উল্লাসকরের ফাঁসীর পরিবর্তে দ্বীপান্তরের আদেশ হইল, অন্যান্য শাস্তির সামান্য পরিবর্তন হইল।

বীরেন্দ্র পুলিশের অত্যাচারে স্বীকার করিতে বাধ্য হইল যতীন মুখার্জী হইলেন সামস্থল আলমের হত্যাকাণ্ডের মূল-কেন্দ্র। বীরেন্দ্র ক্ষুদিরাম, কানাই, সত্যেনের মত ফাঁসীকাষ্ঠে প্রাণ বিসর্জন করিলেন।

এবার যতীন মুখার্জী পর্ব আরম্ভ—

যতীন্দ্রনাথ প্রতাপাদিত্যের দেশ—যশোহর জেলার লোক, তাঁহার জন্ম কুষ্টিয়ার অন্তর্গত কয়াগ্রামে মাতুলালয়ে, ১৮৮০ খৃঃ অব্দে। পিতার নাম উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। পাঁচ বৎসর বয়সে যতীন্দ্রনাথ পিতৃহীন হন। তাঁহার মাতুলালয় স্বদেশী আন্দোলনের তরঙ্গ হইতে রক্ষা পায় নাই। রাখীবন্ধন উৎসব, ও মহিলা সভার অধিবেশন অনেকবার এই কয়াগ্রামকে আনন্দমুখর করিয়াছিল। যতীন্দ্রনাথ জ্যৈষ্ঠ মাতুল বসন্ত চট্টোপাধ্যায়ের কৃষ্ণনগরের গৃহ বাস করিয়া ১৮৯৮ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। লেখাপড়া অপেক্ষা যতীন্দ্র-নাথের উৎসাহ ছিল অশ্বারোহণ, সন্তরণ, ব্যায়াম, বন্দুক চালনা ও খেলাধূলায়। বসন্তবাবু এই সকল বিষয়ে তাঁহাকে উৎসাহ দিতেন। বহুবার তিনি খেলাধূলার জন্য মেডেল, কাপ

পুরস্কার পাইয়াছেন। কৃষ্ণনগরে যতীন্দ্রনাথ খুব সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন—স্কুলে পড়ার সময় বারাণসী রায় উকিলের ঘোড়া ছুটিয়া গিয়া বহু পথচারীকে আহত করিতেছিল, কেহই ঘোড়াকে ধরিতে সাহস করিল না। যতীন্দ্রনাথ তখন নদীয়া ট্রেডিং কোম্পানীতে কি জিনিষ কিনিতেছিলেন। মানুষের চীৎকারে বাহিরে আসিয়া এক নিমেষে তিনি ঘোড়ার সম্মুখে দাঁড়াইলেন ; ঘোড়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল, যতীন্দ্রনাথ ক্ষিপ্রতার সহিত ঘোড়ার কেশাকর্ষণ করিলেন, ঘোড়া শান্ত হইয়া গেল। সেই সময় হইতেই সকলে যতীন্দ্রনাথের সাহসের প্রশংসা করিত। যতীন্দ্রনাথের গৌরকান্তি, নাতিদীর্ঘ দেহ, সুবিশাল বক্ষ, উন্নত ললাট, বীরত্বব্যঞ্জক মুখমণ্ডল দেখিয়া অনেকেই মুগ্ধ হইত, তাঁহার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরে অপরূপ মোহিনী শক্তি ছিল, সে স্বরে অনেকেই মুগ্ধ হইত।

কলিকাতায় যতীন্দ্রনাথ তাঁহার মধ্যম মাতুল ডাঃ হেমন্ত বাবুর গৃহে বাস করিয়া সেণ্ট্রাল কলেজে এফ্, এ, পড়িতে লাগিলেন। তখন ক্ষেত্র গুহের আখড়ায় তিনি কুস্তী শিখিতেন। এই সময় তিনি শর্টহ্যাণ্ড শিখিয়া ফেলেন। এফ্, এ, পরীক্ষার আগেই এক ইংরেজ সওদাগরের অফিসে যোগ দিলেন ; সেখান হইতে কেনেডী সাহেবের ষ্টেনোগ্রাফার নিযুক্ত হইয়া মজঃফরপুরে যান। প্রথমে সাহেবের দোকানে কাজ করিয়া, পরে কেনেডী সাহেবের ব্যক্তিগত দপ্তরে ষ্টেনো-গ্রাফারের কাজ করিয়া। যতীন্দ্রনাথ সাহেবদের সহিত ব্যবহার বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ হইয়া উঠিলেন। ভবিষ্যৎ জীবনে

খেলাধুলা ও ইউরোপীয় আচার ব্যবহারের সংগে পরিচয় তাঁহাকে খুব সাহায্য করিয়াছিল।

মজঃফরপুর হইতে যতীন্দ্রনাথ কলিকাতায় বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটে যোগ দেন। তখন বাংলার রাজনৈতিক জীবনে স্পন্দন মাত্র আরম্ভ হইয়াছে। যতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মিষ্টার পি, মিত্র, শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি নেতাগণ দেশকে ঊষার প্রথম আলোকের সন্ধান দিতেছিলেন। যতীন্দ্রনাথ ছিলেন তদানীন্তন সচ্চরিত্র বাঙ্গালী যুবকদের মত তাঁহাদের আদর্শ ও কর্মধারার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন অথচ পরিবারে তিনি প্রেমময় স্বামী, স্নেহময় পিতা ও আদর্শ গৃহস্থ। বাংলা সেক্রেটারিয়েটে কাজের সময় তিনি কলিকাতায় ও দার্জিলিং-এ যাতায়াত করিতেন। দার্জিলিং-এ অবসর সময়ে তাস না খেলিয়া যতীন্দ্রনাথ গীতা পাঠ করিতেন এবং গীতার অধ্যাপনা করিতেন। তাঁহার বাড়ীতে ক্ষুদ্র পুস্তক-সংগ্রহ ছিল। সেখানে থাকিত মাট্‌সিনি, গারিবল্‌ডীর জীবনী, বিবেকানন্দ গ্রন্থাবলী, বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ ও দেবীচৌধুরাণী, রমেশচন্দ্রের গ্রন্থাবলী।

১৯০৫ সালে বঙ্গবিভাগের পর বাংলার আন্দোলন খুব তীব্র হইয়া উঠিল। ১৯০৬ সালে বাল গঙ্গাধর তিলক বাংলায় আসিয়া শিবাজী উৎসবের আয়োজন করেন। যতীন্দ্রনাথ সরকারী কর্মচারী হইলেও আলফ্রেড থিয়েটার হলে শিবাজী উৎসবে পৌরহিত্য করিলেন এবং "অসি" দেবতাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিলেন, ইহাই তাঁহার প্রথম প্রকাশ্য রাজনৈতিক ব্যাপারে যোগদান।

কয়েকদিন পরে দার্জ্জিলিং যাওয়ার পথে যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে চারজন গোরা সৈন্যের সংঘর্ব উপস্থিত হয়। যতীন্দ্রনাথের কুস্তি ও বক্‌সিং শিক্ষার সদ্ব্যবহার হইল। চার জন গোরাকে একজন কালা আদমী ভূপাতিত করিল। বাঙ্গালীর তখন মনের বল বৃদ্ধি পাইয়াছে—মনের বলের সঙ্গে দেহের বল বৃদ্ধি পাইল। গোরা-সৈন্য যতীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ করিল। শেষ পর্যন্ত মিঃ হুইলারের চেষ্টায় মোকর্দমা উঠাইয়া লওয়া হইল।

এই সময় মাতুলালয়ে গিয়া শুনিলেন যতীন্দ্রনাথের মামাত ভাই ফণিভূষণ বন্দুক লইয়া বাঘ মারিতে যাইবে। যতীন্দ্রনাথ বাঘ শিকারে যাইবেন স্থির করিলেন, অথচ বেশী বন্দুক নাই, সঙ্গে একখানি ভোজালী। হঠাৎ বাঘ বাহির হইয়া আসিল। ফণিভূষণ গুলি করিল, বাঘ আহত হইল বটে কিন্তু মরিল না, তৎক্ষণাৎ আহত ব্যাঘ্র সম্মুখে যতীন্দ্রনাথকে পাইয়া আক্রমণ করিল, যতীন্দ্রনাথ অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সহিত বাঘের গলা বগলে চাপিয়া ধরিলেন। বাঘ তাঁহার দেহ ক্ষত-বিক্ষত করিল; যতীন্দ্রনাথ ভোজালীর আঘাতে ব্যাঘ্র হত্যা করিলেন। যতীন্দ্রনাথকে চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আননয় করা হইল। ডাঃ সুরেশ সর্বাধিকারী বাঙ্গালীর ছেলে বাঘ মারিয়াছে শুনিয়া অপূর্ব নিপুণতার সহিত তাঁহার চিকিৎসা করিলেন। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী হুইলার সাহেব যতীন্দ্রনাথের উপর এত সন্তুষ্ট ছিলেন যে সুদীর্ঘ অসুস্থতার জন্য তিনি যতীন্দ্রনাথকে স-বেতন ছুটী দিয়াছিলেন। ইহার পর হইতে যতীন্দ্রনাথের নাম হইল "বাঘা যতীন।"

একবার তিনি কার্যোপলক্ষে ঝিনাইদহ হইতে অশ্বারোহণে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন। পথ নিরাপদ নয়, হাতে বন্দুক ছিল; হঠাৎ অশ্ব পথে দাঁড়াইয়া গেল, তিনি বুঝিতে পারিলেন ঘোড়া কোন বিপদ-সঙ্কেত পাইয়াছে। একটু অপেক্ষা করিয়া দেখিলেন, পথের ধারে একটি বাঘিনী তিনটী শাবক লইয়া খেলা করিতেছে। তিনি গায়ের কোট দিয়া ঘোড়ার চক্ষু আবৃত করিয়া দিলেন, কারণ খোলা চোখে ঘোড়া বাঘের দিকে অগ্রসর হইবে না; তারপর ঘোড়া লইয়া অগ্রসর হইলেন এবং অনুকূল স্থান হইতে বাঘিনীকে এক গুলিতে মারিয়া ফেলিলেন। তারপর বাঘিনীর তিনটি শাবককে ঝিনাইদহের বাড়ীতে লইয়া আসেন। তাহার পর হইতে তাঁহার "বাঘা যতীন" নাম লোকসমাজে প্রচারিত হইল। জীবনের শেষ দিনও তিনি "বাঘা যতীন" নামের মর্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন।

উহার কয়েকদিন পরে একটি বিশেষ ঘটনায় যতীন্দ্র-নাথের ইংরেজ বিদ্বেষ মূর্ত হইয়া উঠিল। ফোর্ট উইলিয়মের পাশে একটি ছোট বাজার ছিল, গোরা সৈন্যরা মাঝে মাঝে সেই বাজারে জিনিষপত্র কিনিত। একটু মতান্তর হইলেই গোরা সৈন্যরা হাতের ছড়ি গিয়া গরীব দোকানদারদের মারধোর করিত। একদিন যতীন্দ্রনাথ বাজারের পথ অতিক্রম করিতেছিলেন, এমন সময় শুনিলেন একজন দোকানদারের চীৎকার—তাহার মাথায় গোরা সৈন্যরা বেতের ছড়ি দিয়া মারিতেছে, আর গণিতেছে—ওয়ান, টু, থ্রী, ফোর, ফাইভ্...

আরও অনেকে দাঁড়াইয়া ব্যাপরটা দেখিতেছিল। রাগ বোধ হয় অনেকেরই হইয়াছিল ; কিন্তু একে সাহেব, তাহার উপর সৈন্য, সুতরাং সকলেই নীরব। যতীন্দ্রনাথ একটু দাঁড়াইলেন। গণনা যখন "ফরটি এইট" (৪৮) হইয়াছে, যতীন্দ্রনাথ বাঘের মতন লাফ দিয়া গোরার ছড়িটী কাড়িয়া লইলেন, এবং বলিলেন—"ফরটী নাইন্" ; এবার তোমার পালা —বলিয়াই এমন জোরে নাকের উপর ঘুসি মারিলেন যে গোরার "উনপঞ্চাশ বায়ু" স্থির হইয়া গেল। যতীন্দ্রনাথ গম্ভীরভাবে চলিয়া গেলেন। এই ব্যাপারে যতীন্দ্রনাথ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি বুঝিলেন যে, একটা ইংরাজকে মারিয়া বা তাড়াইয়া দিলে চলিবে না, সমস্ত ইংরেজকে তাড়াইতে হইবে।

আলীপুরের বোমার মামলায় শাস্তি হওয়ার পরে বিপ্লবীদল অনেকটা যূথভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। বিপ্লবের কর্মকেন্দ্রগুলি সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িল, অনেকে ভারতের বাহিরে বিপ্লবের কর্মক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। বিখ্যাত প্রচারক বিপিন পাল বিলাতে "স্বরাজ" নাম দিয়া ইংরাজী পত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন, বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ ইংলণ্ডের সর্বত্র ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতার অনুকূলে জনমত গঠনের জন্য প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার ওজস্বিনী বক্তৃতা শুনিয়া সকলে তাঁহাকে "ভারতের ডিমোস্থিনিস" আখ্যা দিলেন। বিরুদ্ধদলও তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্যই সভাতে উপস্থিত থাকিত। মহারাষ্ট্র নায়ক

তিলক তখনও কারাগারে ; পাঞ্জাব কেশরী লালা লাজপৎ রায় এবং শিখ সর্দার অজিত সিংহ নির্বাসিত। কাথিয়াওয়াড়ী শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা "ইণ্ডিয়া হাউস" প্রতিষ্ঠা করিয়া মহারাষ্ট্র যুবকগণকে আকৃষ্ট করেন। ইণ্ডিয়া হাউসের সভ্য মদন-মোহন ধিংঢ়া ও বিনায়ক দামোদর সাভারকর তখন বিলাতে ব্যারিষ্টারী পড়িতেছিলেন। বিনায়ক দামোদর সাভার-করের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গণেশ দামোদর সাভারকর পুণাতে বিপ্লববাদ প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার প্রকাশিত "লঘু অভিনব ভারত মেলা"র মধ্যে বহু বিপ্লবাত্মক কথা প্রচারিত হয়। ইহাতে গণেশ সাভারকরের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। বিলাতে কৃষ্ণবর্মার ইণ্ডিয়া হাউসে সাভার-কারের এই লঘুপাপে গুরুদণ্ডের প্রতিবাদ করা হয়। মদনমোহন ধিংঢ়া লণ্ডন সহরে গণেশ সাভারকরের কারাদণ্ডের প্রতিবাদ স্বরূপ স্যর কার্জেন ওয়ালীকে হত্যা করেন। মদনমোহন ধিংঢ়া বিলাতেই ফাঁসীকাষ্ঠে প্রাণত্যাগ করেন। ইহার পরেই নাসিক সহরে ম্যাজিষ্ট্রেট জ্যাক্সন সাহেবকে হত্যা করা হয়। ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড মিণ্টোকে আমেদাবাদে আক্রমণ করা হয়। অল্পের জন্য তিনি রক্ষা পাইলেন। পুলিশ দুইজন বিপ্লবী তরুণ যুবককে সন্দেহ বশতঃ গ্রেপ্তার করে। বিচারে তাঁহাদের ফাঁসী হয়।

বিনায়ক দামোদর সাভারকরকে এই সব হত্যাকাণ্ডের মূল মনে করিয়া লণ্ডন পুলিশ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করে

এবং ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দেয়। জাহাজ ফরাসী উপকূলে আসিবামাত্র সাভারকর সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া পড়েন এবং সাঁতার দিয়া মার্শাই বন্দরে উঠেন। ফ্রান্সের পুলিশ তাঁহাকে বন্দী করিয়া ইংরেজের হস্তে সমর্পণ করেন। এই কার্য আন্তর্জাতিক রীতি ও নীতিবিরুদ্ধ। রাজনৈতিক শত্রু আশ্রয়প্রার্থী হইয়া স্বাধীন দেশে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে আশ্রয় দেওয়া পৃথিবীর প্রাচীন রাজনীতি। ইংরেজের কুচক্রে ফরাসী জাতি সেই নীতি রক্ষা করিল না। ভারতবর্ষে আনিয়া বিনায়ক দামোদরকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এইবারও তিনি আন্দামানের পথে সমুদ্রে লাফাইয়া পলায়নের চেষ্টা করেন; কিন্তু অকৃতকার্য হন। আন্দামানে আসিলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত ভ্রাতা গণেশ দামোদরের সঙ্গে তাঁহার মিলন হইল। উহার কিছুদিন পরেই গোয়ালিয়র ও সাতারার ষড়যন্ত্রে দণ্ডিত বহু বিপ্লবী আন্দামানে উপস্থিত হইলেন।

এই সময়ে পাঞ্জাবী বিপ্লবী নেতা লালা হরদয়াল আমেরিকায় ভারতীয় বিপ্লববাদ প্রচার করিতে থাকেন এবং "গদর" অর্থাৎ বিদ্রোহী দল গঠন করিয়া ভারত ও ভারতের বাহিরে বিপ্লবীদলেব সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেন। পুরাতন "যুগান্তরের" কর্মী ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত আমেরিকায় উপস্থিত হইয়া "যুগান্তর আশ্রম" প্রতিষ্ঠা করেন।

বাংলার বিপ্লবীগণের উত্তেজনা তখন অনেকটা শান্ত হইয়া আসিয়াছিল। পুলিশের অত্যাচারে বিপ্লব তখন অন্তর্মুখী হইতে বাধ্য হইল। শ্রীঅরবিন্দ বলিলেন—তাঁহাদের

কর্মপন্থা পরিবর্তন আবশ্যক ; উত্তেজনার সময় অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। বিপ্লবীদের মৃত্যু ও কারাবরণে সমস্ত দেশে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে, দেশবাসীর মন প্রস্তুত হইয়াছে, এখন উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষা করিতে হইবে। সুতরাং দেশকে সুসংবদ্ধ করিতে হইবে, যেন প্রয়োজনের দিনে, বিপ্লবের দিনে দেশ বিভ্রান্ত না হইয়া যায়। সেইজন্য ১৯০৯ সনের জুন মাসে শ্রীঅরবিন্দ "কর্মযোগিন্" নামক একটি ইংরেজী পত্রিকা প্রকাশ করিলেন। ইহার পূর্বে "যুগান্তর", "সন্ধ্যা" ইত্যাদি বিপ্লববাদী পত্রিকা প্রচার বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। "কর্মযোগিন" প্রকাশিত হইবামাত্রই সমস্ত ভারতবর্ষে বিপ্লবের নূতন অধ্যায় রচিত হইতে লাগিল। কয়েকদিন পর হাওড়া হইতে "কর্মযোগিনের" বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হইতে লাগিল। তারপর শ্রীঅরবিন্দ "ধর্ম" নামক আর একখানা বাংলা পত্রিকা নিজেই প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে চন্দননগরের মতিলাল রায়ও "প্রবর্তক" পত্রিকা প্রকাশ আরম্ভ করেন। এই সমস্ত পত্রিকার মধ্য দিয়া শ্রীঅরবিন্দ রাজনৈতিক বিপ্লবকে ধর্মের অঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠা করিলেন। গীতার নিষ্কাম কর্ম হইল বাঙ্গালী বিপ্লবীর প্রেরণা, সেইজন্য বিপ্লবীকে সংযম অভ্যাস করিতে হইবে ; সাধনায় তৎপর হইতে হইবে, বাঙ্গালীকে শক্তির সাধনা করিতে হইবে, এবং দেশের জন্য বাঙ্গালীকে তিলে তিলে মরিবার শক্তি অর্জন করিতে হইবে।

ভারতীয় বিপ্লব তখন তিনটি বিশেষ স্তরে কাজ

করিতেছিল—একটি ভারতের বাহিরে, একটি বাংলায়, আর একটি বাংলার বাহিরে ভারতবর্ষে। বাংলার বিপ্লবীগণ তখন তিনভাগে কাজ করিতেছিলেন। প্রথম দল পূর্ব বঙ্গে পুলিন দাসের তত্ত্বাবধানে (তাঁহার অধীনে প্রায় ৫০০ শাখা-উপশাখা ছিল); দ্বিতীয় দল বাংলার বাহিরে রাসবিহারী বসুর অধীনে, তৃতীয় দল কলিকাতায় যতীন মুখার্জীর অধীনে। রাসবিহারী বসু ও যতীন্দ্রনাথ পরস্পর একযোগে কাজ করিতেছিলেন।

যতীন্দ্রনাথ বিপ্লব সম্বন্ধে নূতন পন্থা চিন্তা করিলেন। ইংরেজের শত্রু দ্বারা ইংরেজকে পরাভূত করিতে হইবে। প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই শত্রু আছে। প্রতীচ্যে ইংরেজের সাম্রাজ্য-বাদের শত্রু জার্মাণী এবং প্রাচ্যে ইংরেজ বাণিজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী জাপান। যতীন্দ্রনাথ ১৯১০ সালে বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল্‌সের কর্মচারী অবনী মুখার্জীকে জাপানে তাঁত-শিল্প শিক্ষার জন্য প্রেরণ করিলেন; ভিতরের উদ্দেশ্য হইল জাপানে ইংরেজ-বিরোধী একটি দল সৃষ্টি করা এবং জাপানে গুপ্ত সমিতির একটি কেন্দ্র স্থাপন করা, কিন্তু জাপানে অবনী মুখার্জী কোন সুবিধা করিতে পারিলেন না।

১৯১০ সালে ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা আরম্ভ হয়, পুলিন দাস অল্প কয়েক দিন পূর্বেই নির্বাসন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় ১৪ জনের দ্বীপান্তর ও বিভিন্ন বৎসরের কারাদণ্ড হয়, পুলিন দাসের ৭ বৎসর কারাদণ্ড হইল।

১৯১০ সালের জানুয়ারী মাসে শামসুল আলমকে হত্যা করা হয়। হত্যাকারী বীরেন্দ্রনাথ যতীন্দ্র মুখার্জীর নাম উল্লেখ করাতে যতীন্দ্রনাথ গ্রেপ্তার হন। সেই সময়ে যতীন্দ্রনাথ কলিকাতায় তাঁহার মাতুলালয়ে অসুস্থ মাতুলের শুশ্রূষা করিতে-ছিলেন ; যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহার নিরপরাধ মাতুল ললিত বাবুও কারারুদ্ধ হন। তখন গভর্ণমেণ্ট "হাওড়া ষড়যন্ত্র" নাম দিয়া বিরাট ষড়যন্ত্রের মামলা আরম্ভ করেন ও যতীন্দ্রনাথকে এই মোকর্দমায় সংযুক্ত করেন। পুলিশ যতীন্দ্রনাথের উপর অকথ্য অত্যাচার করিয়াও স্বীকারোক্তি আদায় করিতে পারে নাই। প্রথমতঃ চারদিন তাঁহাকে লালবাজারে পুলিশ হাজতে অনাহারে রাখা হইল। সেই সময় পুলিশ একটি অভিনয় করিয়া-ছিল। হাজতের পাশের ঘরটিতে চারজন দারোগা বসিয়া গল্প করিতেছে, প্রথম জন বলিল—"সাংঘাতিক অপরাধীর স্বীকা-রোক্তির জন্য জাপানী প্রথাই ভাল, শরীরে কোন দাগ থাকে না।"

দ্বিতীয় জন—"সে আবার কি রকম ভাই" ?

তৃতীয় জন—"কেন স্পেনও সে বিদ্যায় কম নয়।"

প্রথম জন—"এর নাম জলসেবা। জাপানের অপরাধীকে বরফ ভরা টবের মধ্যে জলের কলের নীচে বসিয়ে রাখা হয়। উপর থেকে অপরাধীর মাথায় ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ে, জাপানে কি শীত ত' জানই, মাথায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা জল পড়ে ক্ষত হয়ে যায়, তবু জলের ফোঁটা পড়তে থাকে, যতক্ষণ অপরাধী অপরাধ স্বীকার না করে, ততক্ষণ তাকে এই 'জলসেবা' করে আনন্দ দেওয়া হয়।"

চতুর্থ জন—"সে ঔষধ ভারতবর্ষে কাজ করে না। বাঙ্গালী স্বদেশী ছেলেদের উপর জাপানী ঔষধে কাজ করে না, এই দেশী ঔষধ ভাল হবে। বিচারের মধ্য দিয়ে কিছু হয় না। তার চেয়ে সেই অন্ধকার ঘরে তালা বন্ধ ক'রে রেখে দাও, মাঝে মাঝে আফিংএর জল খেতে দিও, মোঘল রাজপুত্রদের মত পাগল হয়ে যাবে। আফিংএর জল খেতেও ভাল, কোন হাঙ্গামা নাই।

এই প্রহসনের অভিনেতা ছিল দারোগা কুমুদ সেন ; কিন্তু যতীন্দ্রনাথের উপর এই অভিনয় কার্যকরী হইল না। যতীন্দ্র-নাথ কোন প্রতিবাদ না করিয়া খুব কৌতুক উপভোগ করিতেন, আর ভাবিতেন—এরাই না আমাদের দেশের লোক ; এদের জন্যই স্বাধীনতার প্রয়োজন বেশী।

বিখ্যাত টেগার্ট সাহেব বলিয়াছেন যে আলিপুরের বোমার মামলার বিচারের পরে বিপ্লবীদের নেতৃত্ব অলক্ষ্যে যতীন্দ্রনাথের হস্তে অসিয়া পড়িয়াছিল ; তাঁহার বুদ্ধি ও পরামর্শই বিপ্লবীদের পরিচালিত করিত। একদিন টেগার্ট সাহেব স্বয়ং আসিয়া যতীন্দ্রনাথকে বলিলেন—"Jatin Babu, can't you help the Govt. and can't you help yourself ?" অর্থাৎ আপনি গভর্ণমেণ্টকে একটু সাহায্য করুন তাতে নিজেরও উপকার হবে।—এই প্রলোভনের ইঙ্গিত খুবই স্পষ্ট। যতীন্দ্রনাথ জানিতেন যে এ মোকর্দমায় মুক্তি লাভ করা অসম্ভব, মুক্তিলাভ করিলেও তাঁহার দারুণ আর্থিক অভাব উপস্থিত হইবে—স্ত্রী, কন্যা, পুত্র, বিধবা ভগ্নীর অনশন, ভবিষ্যতে অর্থাভাব, পুলিশের

অত্যাচার অনিবার্য। সবই তিনি জানিতেন—কিন্তু যতীন্দ্রনাথ এতটুকু বিচলিত হইলেন না।

চারিদিন পর যতীন্দ্রনাথকে তাঁহার মাতুল ললিত বাবু সহ হাওড়া জেলে প্রেরণ করা হইল। পুলিশের গাড়ী হাওড়া জেলে আসিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। জেলের গেটে সকলকে খানাতল্লাসী করিতে হইল। যতীন্দ্রনাথের গলদেশে তাঁহার গুরুদেব ভোলাগিরি মহারাজের আশীর্বাদী মন্ত্রঃপূত একমুখী রুদ্রাক্ষ ছিল। জেলারের আদেশ হইল আসামীরা কোন জিনিষ লইয়া জেলে প্রবেশ করিতে পারিবে না, এমন কি রুদ্রাক্ষও নয়। যতীন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন—''রুদ্রাক্ষের মধ্যে পিস্তল বা বোমা রাখা যায় না"; কিন্তু জেলারের ভয় ছিল, কি জানি যদি কোন মন্ত্র দ্বারা রুদ্রাক্ষই বোমাতে পরিণত হয়। জেলার সিপাহীকে আদেশ করিলেন, "রুদ্রাক্ষ খুলিয়া লও।" যতীন্দ্রনাথ খুব শান্তভাবে বলিলেন—"যদি ভাল চাও তবে আমার রুদ্রাক্ষ স্পর্শ করো না। গায়ের জোরে তোমরা আমার সঙ্গে পারবে না। আমার প্রাণ না নিয়ে রুদ্রাক্ষ নিতে পারবে না।" জেলার সাহেব তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া বেশীদূর অগ্রসর হইলেন না। যতীন্দ্রনাথ রুদ্রাক্ষ সহ জেলে প্রবেশ করিলেন।

এই মোকর্দমা এক বৎসর চলিয়াছিল; যতীন্দ্রনাথ সেই এক বৎসরই নির্জন কক্ষে দিন অতিবাহিত করেন। ব্যারিষ্টার জে, এন, রায়ের চেষ্টায় বিচারপতি জেংকিংসের বিচারে হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলার সকল আসামী মুক্তিলাভ করে—১৯১১ সালের এপ্রিল মাসে।

ব্রিটিশ তখন বুঝিয়াছিলেন অত্যাচার দ্বারা "বঙ্গভঙ্গ বিক্ষোভ" দমন করা যাইবে না, স্বাধীনতার আকাঙ্খাকে জেলে পুরিয়া রাখা যাইবে না, আন্দামানে নির্বাসিত করা যাইবে না, অথবা ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলান যাইবে না। লর্ড মিণ্টো ও মর্লে নূতন উপায়ের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্র সংস্কার করিয়া তাঁহারা ভারতবাসীর মন আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিলেন। তাঁহারা একটি শাসন সংস্কারের পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন করিয়া ভারতে প্রেরণ করিলেন। নরমপন্থীদল একটু পরিবর্তন ও সংশোধন করিয়া পাণ্ডুলিপি গ্রহণ করিলেন। শ্রীঅরবিন্দ এই নূতন শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া দেশবাসীর নিকট লিখিলেন—An open letter to my countrymen (দেশবাসীর নিকট খোলা চিঠি)। ইহার পরে ব্রিটিশ সরকার শ্রীঅরবিন্দকে সামস্থল আলমের হত্যাকাণ্ডে জড়িত করিয়া নির্বাসনের সিদ্ধান্ত করিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা নিবেদিতা এই সংবাদ শুনিয়া অরবিন্দের কাছে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন—"আপনার নির্বাসনের ব্যবস্থা হয়েছে—তাহাদের সন্দেহ আপনি শামস্থল আলমের হত্যার সঙ্গে জড়িত—চলুন, এখুনি আপনাকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাব।"

প্রতিবাদ করিবার অবসর না দিয়া ভগ্নী নিবেদিতা শ্রীঅরবিন্দকে, একরকম জোর করিয়া ফরাসী চন্দননগরে মতিলাল রায়ের গৃহে লইয়া গেলেন এবং সেখান হইতে পণ্ডিচেরীতে। ইহার চারদিন পরে শ্রীঅরবিন্দের নামে

গ্রেপ্তারের নির্দেশ বাহির হইল। শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী অন্তর্ধানের সংবাদ যতীন মুখার্জী, রাসবিহারী বসু, মতিলাল রায় ভিন্ন অন্য কেহ জানিতেন না। শিকার হস্তচ্যুত, গবর্ণমেণ্ট বিভ্রান্ত, পুলিশ ক্রুদ্ধ; সুতরাং অরবিন্দের অভাবে সরকার অস্থির হইয়া তাঁহার "কর্মযোগিন" ও "ধর্ম" পত্রিকা বন্ধ করিয়া দিল। ১৯১৪ সালের আগষ্ট মাসে যুদ্ধের প্রারম্ভে শ্রীঅরবিন্দের অন্তর্ধানের সংবাদ জনসাধারণের নিকট বিজ্ঞাপিত করা হইল।

বঙ্গভঙ্গে বিক্ষোভ যে এত বিরাট আকার ধারণ করিবে তাহা ব্রিটিশ ধুরন্ধরগণ বুঝিয়াও বুঝেন নাই। যে মনোবৃত্তি লইয়া একদিন তাঁহারা বলিয়াছিলেন—Bengal Partition is a settled fact তাহা unsettled হইয়া গেল। ধ্রুব সত্য বঙ্গ-বিভাগ মিথ্যা হইয়া গেল। সম্রাট পঞ্চম জর্জ কলিকাতা আসিলেন—সম্রাট বঙ্গভঙ্গ রদ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে বাংলা হইতে দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করিলেন। বিপ্লবের যে বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল তাহার শিকড় ভূমিনিম্নে বহুদূর চলিয়া গিয়াছে, উপর হইতে শাখা-প্রশাখা ছেদন করিলেও বৃক্ষ মরিল না। সম্রাটের বঙ্গভঙ্গ রদের দিন ইন্‌স্‌পেক্টর মনমোহন ঘোষকে বরিশালে হত্যা করা হইল। মৈমনসিংহের ইন্‌স্‌পেক্টরকেও গুলি করা হইল, কারণ পুলিশ তখন বরিশাল ষড়যন্ত্রের মামলা, খুলনা ষড়যন্ত্রের মামলা চালাইতেছিল।

দিল্লীতে ভারতের রাজধানী স্থানান্তরিত হইল। রাসবিহারী

বসু, নগেন ভট্টাচার্য এবং যতীন্দ্রনাথ পুরাতন বিপ্লবী দলগুলি সংহত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। রাসবিহারী বসু বেনারসে গিয়া শচীন সান্যালের সহায়তায় বোমার কারখানা স্থাপন করেন। রাসবিহারী বসু দিল্লীতে প্রবেশকালে লর্ড হার্ডিঞ্জের প্রতি বোমা নিক্ষেপ করেন। হাতীর হাওদা চূর্ণ হইয়া গেল, মাহুত মৃত্যুমুখে পতিত হইল, লর্ডপত্নী অচৈতন্য হইয়া ভূপাতিত হইলেন ; লর্ড হার্ডিঞ্জ আহত হইলেন। সমস্ত ভারতবর্ষ চকিত হইয়া গেল, বড়লাটের প্রতি বোমা ! দুইজন নির্দোষ ব্যক্তির ফাঁসী হইয়া গেল। প্রকৃত দোষী রাসবিহারী তখন পুলিশের দৃষ্টির বহুদূরে চলিয়া গিয়াছেন।

ইউরোপে বল্‌কান্ যুদ্ধ চলিতেছিল, রাজনৈতিক পরিস্থিতি খুবই চঞ্চল। শীঘ্রই একটা কিছু গোলযোগ হইবে বলিয়া অনেকে ধারণা করিয়াছিলেন। জার্মানীতে ভারতীয় বিপ্লবী প্রতিষ্ঠিত "বার্লিন কমিটীর"র সঙ্গে আমেরিকার "গদর দল" যোগসূত্র স্থাপন করিয়াছে ; লালা হরদয়াল জার্মাণ সম্রাটের নিকট হইতে অর্থ সাহায্য লইয়া ভারতীয় বিপ্লবীদের সাহায্য করিবেন স্থির করেন। এই সময় মালয়ে সর্দার গুরুদিৎ সিং একখানি জাপানী জাহাজ "কোমাগাটামারু" ভাড়া করিয়া শিখ ভাইদের লইয়া কানাডার দিকে অগ্রসর হইলেন ; কিন্তু কানাডার নিয়ম অনুসারে ২০০ ডলার সঙ্গে না থাকিলে কোন ভারতীয়কে কানাডায় অবতরণ করিতে দেওয়া হইত না, সুতরাং ভারতীয়দের কানাডায় অবতরণ করিতে দেওয়া হইল না, জাহাজ সিঙ্গাপুরে ফিরিয়া আসিল। সেখানেও

কাহাকে নামিতে দেওয়া হইল না, কারণ পুলিশ সন্দেহ করিয়াছিল যে জাহাজে বহু বিপ্লবী আছে। সিঙ্গাপুর হইতে তাহারা কলিকাতায় আসিলে সেখানেও তাহাদিগকে নামিতে দেওয়া হইল না। তাহাদিগকে পাঞ্জাবে পাঠাইবার ব্যবস্থা হইল, 'কোমাগাটামারু'র যাত্রীগণ ইহাতে খুব ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। মালয় হইতে কানাডা, কানাডা হইতে সিঙ্গাপুর, সিঙ্গাপুর হইতে কলিকাতা, তাহারা মাসের পর মাস জলে ভাসিতেছে, ভূমি স্পর্শ করিতে পায় নাই ; দেশে আসিয়াও শান্তি নাই। সুতরাং অধীর হইয়া শিখগণ বজবজে জোর করিয়া অবতরণ করিল। পুলিশ গুলি চালাইল, বহু শিখ হতাহত হইল, গুরুদিৎ সিং কয়েকজন বন্ধুসহ পাঞ্জাবে পলায়ন করিলেন। সন্দেহ বশে তিনশত শিখকে বন্দী করা হইল। ইহাতে পাঞ্জাবে সর্দার কর্তার সিংহের নেতৃত্বে বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন পাঞ্জাবের ভাই পরমানন্দ, মারাঠী পিংলে, বাঙ্গালী রাসবিহারী বসু।

যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে তখন ২৯ শে সেপ্টেম্বর ১৯১৩ সালে পুলিশের কর্মচারী হরিপদকে গোলদিঘীর মোড়ে গুলি করিয়া হত্যা করা হয়। তাঁহার নেতৃত্বে ২৯৬।১ আপার সারকুলার রোডের বোমার কারখানা হইতে খুব শক্তিশালী বোমা প্রস্তুত করিয়া সমস্ত বাংলাদেশে বিপ্লবীদের মধ্যে বিতরণ করা হইল, এই সব বোমা প্রস্তুত হইত সিগারেট টিনে। ভীষণ সাহস না থাকিলে এইরূপ সামান্য আবরণে অমন মারাত্মক বোমা নির্মাণ করা যায় না। অমৃতলাল হাজরার

এই বোমা তৈয়ারী ব্যাপারে ১৫ বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ড হয়।

১৯১৭ সালের ১৯শে জানুয়ারি দিনের বেলায় গ্রে-ষ্ট্রীটের মোড়ে ইন্‌স্‌পেক্টর নৃপেন ঘোষকে গুলি করিয়া হত্যা করা হয়। আসামী নির্ম্মলকান্ত রায় বিচারে মুক্তি পান। তারপর বসন্ত চাটার্জীকে বোমা মারিয়া হত্যা করা হয়, সঙ্গে একজন হেড কনেষ্টবল নিহত হয়। ২৮শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবের সময় ইন্‌স্পেক্টর সুরেশ মুখার্জীকে যতীন্দ্রনাথের ব্যবস্থাক্রমে চিত্তপ্রিয় রায় প্রকাশ্য দিবালোকে গুলি করিয়া হত্যা করেন অথচ কোন লোক তাঁহাকে ধরিতে চেষ্টা করে নাই। জনসাধারণের সহানুভূতি বিপ্লবীদের সমর্থন করিত।

১৯১৪ সালের ৪ঠা আগষ্ট প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল। যতীন্দ্রনাথ যে সুযোগের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন তাহাই উপস্থিত হইল। এদিকে বাংলার বিভিন্ন বিপ্লবীদল বর্দ্ধমান বন্যার সেবাকার্য উপলক্ষে মিলিত হইয়া মাখন সেনের নেতৃত্বে সম্মিলিত দল সৃষ্টি করিলেন। অক্টোবর মাসে নরেন ব্যানার্জী ও শ্রীশ মিত্রের চেষ্টায় রডা কোম্পানির ১০ বাক্স অস্ত্রশস্ত্র চুরি হইয়া গেল, তাহাতে ৫০টী মশার পিস্তল এবং প্রায় ৪৬০০০ উপর গুলি ছিল। সেই পিস্তলগুলি বন্দুকের ন্যায় ব্যবহার করা যায় এবং দরকার হইলে ছোট করিয়া পিস্তলের ন্যায়ও ব্যবহার করা যায়। এই পিস্তলগুলি দেখিতে খুব সুন্দর এবং খুব দূর পাল্লার কাজ করিত।

বিপ্লবীদল নিজেদের মধ্যে পিস্তলগুলি বণ্টন করিয়া লইলেন এবং পশ্চিম বঙ্গে যতীন্দ্রনাথের নিকট ১০টী, সতীশ চক্রবর্তীর নিকট চন্দননগরে ৫টী, বিপিন গাঙ্গুলীর নিকট উত্তরবঙ্গে,—মৈমনসিংহ, ঢাকা, বরিশালে ৫টী করিয়া বিতরিত হইল। ১০টী রহিল বিশেষ কার্যের জন্য সংরক্ষিত। সঙ্গে সঙ্গে তিন প্রকার বোমাও প্রস্তুত করা হইল—ধাতুর পাত্রে, নারিকেলের খোলে, টিনের নলের মধ্যে। ৫০টী মশার পিস্তল দিয়া বাংলার গবর্ণমেণ্টকে বিপ্লবীদল অস্থির করিয়া তুলিল।

মহাযুদ্ধ আরম্ভের পরেই যতীন্দ্রনাথ অবনী মুখার্জীকে দ্বিতীয়বার জাপানে প্রেরণ করেন—উদ্দেশ্য ছিল রাস-বিহারীর সঙ্গে আলাপ করিয়া তিনি আমেরিকায় যাইবেন, সেখান হইতে জার্ম্মাণী হইয়া "বার্লিন কমিটির" নিকট ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টার সমস্ত সংবাদ দিবেন। অবনী মুখার্জী "বিষ্ণু এণ্ড কোম্পানী" নামক একটী কাল্পনিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হইয়া জাপানে আসেন, সেখান হইতে অর্থকষ্টের জন্য তাঁহার আমেরিকায় যাওয়া হয় নাই। তবে চীনে ডাক্তার সান্ ইয়াৎ সেনের সঙ্গে তিনি দেখা করিলেন। তিনি ৫০টি পিস্তল এবং অনেকগুলি কার্ত্তুজ লইয়া ভারতে ফিরিবার বন্দোবস্ত করেন।

এই সময়ে বিপ্লবী মারাঠী যুবক পিংলে এবং বাঙ্গালী সত্যেন সেন ভারতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া যতীন্দ্রনাথ বাঙ্গালার বিপ্লবীদের একটী

সভা আহ্বান করেন কলিকাতায়। সভায় স্থির হইল—জার্ম্মাণীর সহযোগিতায় দেশব্যাপী সশস্ত্র বিদ্রোহ করিতে হইবে। যদি সম্ভব হয় তবে ১৯১৫ সালের মধ্যেই উহা করিতে হইবে। বেনারসের শচীন সান্যালের প্রস্তাব ক্রমে যতীন্দ্রনাথ বিদ্রোহের নেতা নির্বাচিত হইলেন; বিপ্লবীরা এশিয়ার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ঘাঁটী স্থাপন করিবে, শ্যামদেশে যোগসূত্র স্থাপন করিবে—'ঘাঁটী হইবে বাংকক, ব্যাটাভিয়া, পেনাং, সাংহাই ও জাভায়। তাঁহাদের মধ্যস্থতায় সানফ্রান্‌সিস্‌কো, কালিফোর্নিয়ায় এক অংশ কাজ করিবে, আর এক অংশ বার্লিন কমিটীর সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করিয়া চলিবে, ভারতে সৈন্যদের মধ্যে বিপ্লবের বীজ ছড়াইতে হইবে। যখন বাস্তবিক বিদ্রোহ আরম্ভ হইবে ভারতীয় সৈন্যগণ যোগ দিবে। সৈন্যদের রাজভক্তিকে দেশভক্তিকে পরিণত করার ভার নিলেন শচীন সান্ন্যাল।

১৯১৫ সালের মার্চ মাসে জিতেন লাহিড়ী ইউরোপ হইতে বোম্বে আসেন এবং বাংলায় বিপ্লবীদের জানাইয়া দেন যে জার্ম্মানী অর্থ ও অস্ত্র দ্বারা ভারতবর্ষকে সাহায্য করিবে, ব্যাটাভিয়াতে জার্ম্মানী বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করিবে। কিছুদিন পূর্বেই বিপ্লবী ভোলানাথ চাটার্জীকে ব্যাংককে পাঠান হইয়াছিল। জিতেন লাহিড়ীর সঙ্গে কথাবার্তা বলিয়া এখানকার কার্যক্রম স্থির করিয়া নরেন্দ্র ভট্টাচার্য মিঃ মার্টিনের ছদ্মবেশে এপ্রিল মাসে জার্মান প্রতিনিধি হেলফারিস্ (Heelfarich)-এর সঙ্গে শেষ

আলোচনা করিবার জন্য মিঃ মার্টিন কল্পিত Harry & Co এর প্রতিনিধিরূপে ব্যাটাভিয়ায় চলিয়া গেলেন। এই সময়ে অবনী মুখার্জী জাপানে উপস্থিত ছিলেন। হেলফারিস্ বলিলেন যে "মেভারিক" জাহাজে কালিফোর্নিয়া হইতে অস্ত্রশস্ত্র করাচীতে আসিতেছে। কিন্তু মিঃ মার্টিনের পরামর্শে "মেভারিক" জাহাজ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া সুন্দরবনে রায়-মঙ্গল নামক স্থানে নঙ্গর করিতে স্বীকার করিল। মিঃ মার্টিন আবার নরেন্দ্র ভট্টাচার্য হইয়া জুন মাসে কলি-কাতায় উপস্থিত হইলেন। ইহার পূর্বেই M/s. Harry & Co এর নামে ৪৩০০০৲ হাজার টাকা পাঠান হয়। সেই জাহাজে ছিল ৩০০০০ হাজার রাইফেল, ১২০০০০০০ (১ কোটী বিশ লক্ষ) গোলাগুলি এবং দুই লক্ষ নগদ টাকা। যতীন্দ্রনাথ, যাদুগোপাল মুখার্জী, অতুল ঘোষ প্রভৃতি মাল খালাসের জন্য তিনটি স্থান নির্দেশ করেন। জাহাজে কয়েকজন জার্মান সামরিক কর্মচারীও ছিলেন; তাঁহাদের শিক্ষায় সুনিপুণ সেনাবাহিনী গড়িবার উদ্দেশ্য যতীন্দ্রনাথের ছিল। জাহাজ খালাসের তিনটি নির্দিষ্ট স্থান ছিল—

১। নোয়াখালি জেলায়—হাতিয়া—নায়ক নরেন ঘোষ চৌধুরী ও ফণী চক্রবর্তী প্রভৃতি।

২। কলিকাতা—নায়ক নরেন ভট্টাচার্য ও বিপিন

৩। বালেশ্বর—নায়ক যতীন্দ্রনাথ, চিত্তপ্রিয় প্রভৃতি

তখন বাংলাদেশে ইংরেজের বেশী সৈন্য ছিল না। পুলিশও কয়েক জায়গায় মাত্র ছিল। স্থির হইল প্রধান সেতুগুলি উড়াইয়া দিলেই দেশের রেলপথগুলি অচল হইয়া যাহিবে ; বাইরের সৈন্য বাংলা দেশে আসিতে পারিবে না। সেই অনুসারে বি, এন, রেলের সেতু উড়াইবার জন্য ভোলানাথকে চক্রধরপুরে পাঠান হইল। সতীশ চক্রবর্তী অজয় নদের সেতু উড়াইতে গেলেন, যতীন্দ্রনাথ বালেশ্বরে গেলেন—মাদ্রাজ রেলের সেতু উড়াইয়া দিবেন। আরও স্থির হইল নরেন ভট্টাচার্য ও বিপিন গাঙ্গুলী কলিকাতার সমস্ত বন্দুক হস্তগত করিয়া ফোর্ট-উইলিয়াম দুর্গ অধিকার করিবেন।

পুলিশ অনেক সংবাদ জানিতে পারিয়াছিল, এবং তাহারা খুব সতর্ক হইল। "মেডারিক" জাহাজও জানিল যে পুলিশ সংবাদ পাইয়াছে, কারণ ডাচ গবর্ণমেণ্ট মেডারিকে খানাতল্লাস করার উদ্যোগ করাতে সে ফিরিয়া গেল, সুতরাং "মেডারিক" জাহাজ সুন্দরবনে আসিল না। জার্ম্মান কন্সাল অন্য একখানি জাহাজে মাল পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। একজন চীনাম্যানের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়া ১২৮টী অটোমেটিক পিস্তল এবং ২০৮৩০ রাউণ্ড গোলা বারুদ অমরেন্দ্র চাটুয্যের ঠিকানায় কলিকাতা পাঠাইলেন : সেগুলি কাঠের বাক্সে লুক্কায়িত ছিল। সাংহাইয়ে অস্ত্রগুলি ধরা পড়ে, এই সময়ে অবনী মুখার্জী জাপান হইতে ফিরিতেছিলেন, তিনি সিঙ্গাপুরে ধরা পড়েন এবং সেখানে তাঁহার ফাঁসী

হয়। ভোলানাথ গোয়ায় ধরা পড়েন এবং জেলে আত্মহত্যা করেন। নরেন ভট্টাচার্য আমেরিকায় পলায়ন করেন। সেখানে আমেরিকান গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বন্দী করে।

এদিকে যতীন্দ্রনাথ এবং তাঁহার ৪ জন সহকর্মী—ফরিদপুরের চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, নীরেন দাশগুপ্ত এবং নদীয়ার জ্যোতিষ পাল মহানদী ও বঙ্গোপসাগরের সঙ্গমস্থলে অপেক্ষা করিতেছেন—কবে জাহাজ আসিবে। তাঁহারা বঙ্গোপসাগরের পার্শ্বে প্রতিদিন দূরবীন যন্ত্রের সাহায্যে সমস্ত পর্যবেক্ষণ করেন। অনাহার, অনিদ্রা, অবিশ্রাম—গাছের ফলপাতাই একমাত্র সম্বল। এই সময় জ্যোতিষচন্দ্র পাল অসুস্থ হইয়া পড়েন। তাঁহারা জানিতেন যে, পুলিশ তাঁহাদের সন্ধানে যে কোন দিন আসিয়া পড়িতে পারে। প্রত্যেকটি মুহূর্ত তাঁহাদের নিকট মূল্যবান। তাঁহারা ক্ষুধার জ্বালায় এক দোকানে গিয়া কিছু খাদ্য সংগ্রহ করেন। পথে পুলিশ দেখিতে পাইয়া দোকানী অপরিচিত ক্রেতাদের কথা পুলিশকে বলিয়া দেয়। টেগার্ট সাহেব তখন বালেশ্বরে যতীন মুখার্জীর সন্ধানে সদলবলে অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি বুঝিলেন এই ক্রেতা যতীন মুখার্জী ভিন্ন আর কেহ নয়। পুলিশ সমস্ত দিক অবরোধ করিয়া ফেলিল, সঙ্গে বালেশ্বরের ম্যাজিষ্ট্রেট এবং তাহার বহুসংখ্যক পুলিশ অনুচর। যতীন্দ্রনাথ একটু পরেই সব বুঝিতে পারিলেন। "বুড়িবালামের" নিকট একটি অপেক্ষাকৃত উচ্চস্থানে একটি কাটা খাদের পার্শ্বে তিনি অপেক্ষা করিতে

লাগিলেন। বন্ধুরা যতীন্দ্রনাথকে পলায়ন করিতে বলিলেন, কারণ যতীন্দ্রনাথ রক্ষা পাইলে আবার বিপ্লবদল পুনর্গঠন সম্ভব হইবে। যতীন্দ্রনাথ বলিলেন—অসম্ভব। জ্যোতিষ অসুস্থ, অসুস্থ বন্ধুকে বিপদের মুখে ফেলিয়া যাওয়া অসম্ভব। তাঁহারা প্রস্তুত হইলেন, যথাসম্ভব গাছপালা ও পাতা দিয়া খাদকে সুরক্ষিত করা হইল। তিনদিকে তিনটী সুড়ঙ্গ খনন করা হইল। সেই অবস্থায় যাহা সম্ভব, তাহাই করা হইল, যতীন্দ্রনাথ ও তাঁহার সহকর্মীগণ শত্রুর গুলির জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

১৯১৫ সাল, ৯ই সেপ্টেম্বর। টেগার্ট সাহেবের ইচ্ছা ছিল যে বিপ্লবী যুবকদের তিনি জীবন্ত বন্দী করিবেন। সুতরাং প্রথমে টেগার্টের আদেশে শূন্যে গুলি করা হইল। যতীন্দ্রনাথ গুলির উত্তর দিলেন—গুলি। একটি গুলি টেগার্ট সাহেবের মাথার পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল। তখন উভয় পক্ষে গুলি চলিতে লাগিল। এক এক বার দশ মিনিট করিয়া গুলি চলিল—তারপর বিরাম। টেগার্ট ভাবিলেন বোধ হয় বিপ্লবীরা মরিয়াছে। গাছপাতার দুর্গের অন্তরালে এমন ভাবে বিপ্লবীগণ আত্মগোপন করিয়াছেন যে তাঁহাদের দেখা যায় না। হঠাৎ একসঙ্গে পরিখা হইতে গুলি আসিয়া সৈন্যদের বিভ্রান্ত করিয়া দিল। বিপ্লবীগণ জানিতেন যে গুলি বারুদ নিঃশেষ হইয়া গেলে আর নূতন গুলির সরবরাহ হইবে না, আহত হইলে চিকিৎসার জন্য ব্যবস্থা হইবে না। সুতরাং

যুদ্ধ বিরামের মাঝখানে শত্রুর সঙ্গে যতক্ষণ সম্ভব যুদ্ধ চালনা করিতে হইবে, তাই খুব সতর্কতার সঙ্গে তাঁহার যুদ্ধ পরিচালনা করিতে লাগিলেন। টেগার্টের সৈন্যগণ ভাবিলেন—পরিখার মধ্যে অনেক বিপ্লবী আছে, অনেক গোলা বারুদ আছে। তাহারা পশ্চাৎ অপসরণ করিতে লাগিল—আরও সৈন্য চাই। হঠাৎ পশ্চাৎ অপসরণকারী সৈন্যদলের একটি গুলি আসিয়া যতীন্দ্রনাথের উরুতে লাগিল। জলের প্রয়োজন—অবিশ্রান্ত রক্ত ক্ষরণ হইতেছিল। চিত্তপ্রিয় জলের জন্য পরিখার বাহিরে উঠিয়া আসিলেন। চিত্তপ্রিয়ের পার্শ্বদেশ গুলিবিদ্ধ হইল। যতীন্দ্রনাথ তাঁহাকে কোলে তুলিয়া আবার পরিখার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। একটী গুলি আসিয়া তাঁহার তলপেটে বিদ্ধ হইল। তিনি গুরুতর আহত হইলেন। সেই অবস্থায়ও যতীন্দ্রনাথ গুলি চালাইতে-ছিলেন। শেষে গুলি ফুরাইয়া গেল, চিত্তপ্রিয় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে বলিয়া উঠিলেন—যতীন্দ্রকে বাঁচাও। জ্যোতিষ, মনোরঞ্জন, নীরেন উত্তরীয় উড়াইয়া সন্ধির ঘোষণা করিলেন। বিপ্লবীরা বন্দী হইলেন।

যতীন্দ্রনাথকে বালেশ্বরের হাসপাতালে লইয়া আসা হইল। তৃষ্ণার্ত হইয়া জল চাহিলে টেগার্ট সাহেব জল দিতে গেলেন। যতীন্দ্রনাথ মৃত্যুশয্যায়ও শত্রু ইংরেজের হাতের জল স্পর্শ করিলেন না। যতীন্দ্রনাথ পরদিন দেহত্যাগ করিলেন।

নীরেন, মনোরঞ্জন ও জ্যোতিষের বিরুদ্ধে মোকর্দমা হইল। নীরেন ও মনোরঞ্জনের ফাঁসী হইল, জ্যোতিষের

দ্বীপান্তর হইল। আন্দামানে অত্যাচারে জর্জরিত হইয়া অন্তিম অবস্থায় তাঁহাকে রংপুরে পাঠান হয়। তখন জ্যোতিষ বিকৃতমস্তিষ্ক, রংপুর জেলেই জ্যোতিষ মৃত্যু বরণ করেন।

যতীন্দ্রনাথ মাত্র ৩৬ বৎসর জীবিত ছিলেন। ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি পরবর্তী পুরুষের জন্য গভীর পদচিহ্ন অঙ্কিত রাখিয়া গিয়াছেন। তিনিই প্রথম স্থির করিলেন যে, বিদেশী সাহায্য ব্যতিরেকে ইংরেজের মত দুর্ধর্ষ শত্রুকে বিতাড়িত করিতে পারা যাইবে না। তিনিই বর্তমান দুর্বার রণনীতির অনুকরণ করিয়া সশস্ত্র বিদ্রোহের পরিকল্পনা করেন। তাঁহার পূর্ববর্তী বিপ্লবীগণ ষড়যন্ত্র, হত্যা দ্বারা রাজপুরুষদের মনে সন্ত্রাস সৃষ্টি করিতে প্রয়াস পান; কিন্তু যতীন্দ্রনাথ সশস্ত্র বিদ্রোহের স্বপ্ন দেখেন। তিনি পশ্চিমে জার্মানী, পূর্বে জাপান এবং নূতন মহাদেশ আমেরিকায় বিদ্রোহীদের কার্যাবলী প্রসারিত করেন। যুদ্ধের কোন অভিজ্ঞতা নাই; কিন্তু প্রয়োজনের দিনে তিনি বুদ্ধি দ্বারা, শক্তি দ্বারা, সন্ধান দ্বারা অভিজ্ঞতার অভাব পূর্ণ করিয়াছিলেন। সম্মুখ সমরে তিনিই প্রথম ইংরেজকে বাংলা দেশ হইতে বিতাড়নের চেষ্টা করেন। সেই জন্য টেগার্ট সাহেব বলিয়াছেন—I have great admiration for him. He is the only Bengali who died fighting from a trench.

যতীন্দ্রনাথের বিপ্লব পরিচালনার যুগে আর একজন ক্লান্তিহীন বিপ্লবী পুরুষের সন্ধান পাই—রাসবিহারী বসু। তাঁহারই চেষ্টায় পশ্চিম ভারত ও পূর্ব ভারতের সঙ্গে বিপ্লবের যোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছিল। রাসবিহারী বসুই দিল্লীতে লর্ড হার্ডিঞ্জকে লক্ষ্য করিয়া বোমা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তিনিই যতীন্দ্রনাথের সশস্ত্র বিদ্রোহের পরিকল্পনায় সৈন্যবিদ্রোহের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরিশেষে জাপানে গিয়া বিদেশে ভারতের বিপ্লব-প্রচেষ্টা সফল করিতে চেষ্টা করিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় সুভাষ বসু তাঁহারই আজাদ্ হিন্দ বাহিনীর নায়কত্ব গ্রহণ করিয়া ভারতে ইংরেজের বিরুদ্ধে অভিযান করিতে সমর্থ হইলেন।

সত্যই রাসবিহারীর জীবন একখানি অপূর্ব নাটক। বাংলার এক নিভৃত পল্লীতে জন্ম; কেরাণীর সন্তান, কর্মজীবনও কেরাণীর কলম লইয়াই দেরাদুনের জঙ্গলে আরম্ভ করেন—

তারপর সেই “ভেতো” ও “ভীত” বাঙ্গালী দিল্লীর রাজপথে ব্রিটিশ সিংহের প্রতিনিধি বড়লাটকে লক্ষ্য করিয়া অসংখ্য জনতার মধ্যে বোমা নিক্ষেপ করিলেন। যতীন্দ্রনাথের সহযোগে তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রথম ভাগে জার্মানীর সাহায্যে সশস্ত্র বিদ্রোহের পরিকল্পনায় সর্বাপেক্ষা বিপদসঙ্কুল অংশ গ্রহণ করেন—সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহ প্রচার। ভারতে যখন বিপ্লব কার্যের পরিসর ক্ষুদ্র হইয়া আসিতে লাগিল, তখন তিনি সুদূর জাপানে গিয়া তাঁহার বিদ্রোহ-বহ্নির অনির্বাণ শিখা প্রজ্বলিত রাখিলেন। সমগ্র জীবনব্যাপী তাঁহার একমাত্র সাধনা ছিল ব্রিটিশ বিতাড়ন; জীবনের শেষ অধ্যায়ে তিনি সুভাষচন্দ্রের মন্ত্রণাদাতারূপে ব্রিটিশ বিতাড়ন-যজ্ঞের শেষ আহুতি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। অপূর্ব এই বিপ্লবী পুরুষ, দেশত্যাগী দেশ-সেবক—দেশত্যাগ করিয়া দেশবাসীকে জানাইলেন, তিনি দেশকে ভোলেন নাই।

চন্দননগরই রাসবিহারী বসুর বাল্যনিকেতন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে বর্ধমান জেলার সুবলদহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করিলেও চন্দননগরেই তাঁহার শৈশব জীবন অতিবাহিত হয়। প্রথম পাঠশালায়, পরে ডুপ্লে কলেজিয়েট স্কুলে পাঠ করিয়া তিনি এণ্ট্রান্স পাশ করেন, কিন্তু আর অগ্রসর হন নাই। পড়ার বই ছাড়া অন্য বইএর প্রতি তাঁহার ভীষণ লোভ ছিল। শরীরচর্চায় এবং সহপাঠীদের উপর নেতৃত্ব করার জন্য তাঁহার একটা অসাধারণ মোহ ছিল। তাঁহার বুদ্ধি ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, বন্ধুবান্ধবগণ কোন অসুবিধায় পড়িলে রাসবিহারীর

নিকট উপদেশের জন্য আসিতেন। অতিশয় স্থৈর্য ও ধৈর্যের সহিত তিনি তাঁহাদের সকল কথা শুনিতেন এবং অনেকক্ষণ পরামর্শ-প্রার্থীর বিরুদ্ধ মত গ্রহণ করিয়া তাঁহার সহিত তর্ক করিতেন, তারপর উভয়দিক বিবেচনা করিয়া পরামর্শ দিতেন। ক্রমশঃ যুক্তিতর্কে, পরামর্শদানে রাসবিহারী খুব নিপুণ হইয়া উঠেন। পরবর্তীকালে এই অভিজ্ঞতা তাঁহাকে বহু প্রতিষ্ঠান ও বহু আন্দোলনের পরামর্শদাতারূপে বরণ করিয়া কৃতার্থ হয়।

এণ্ট্রান্স পাশ করিবার পরে তাঁহার পিতা দেরাদুন বনবিভাগে কেরাণীপদে তাঁহাকে চাকুরী করিয়া দেন। দেরাদুনে কাজ করিবার সময় রাসবিহারী মাঝে মাঝে চন্দননগরে আসিতেন। চন্দননগর তখন বাঙ্গালী বিপ্লবীদের একটী গুরুত্বপূর্ণ কর্মকেন্দ্র হইয়া পড়িয়াছিল। ডুপ্লে-কলেজের অধ্যাপক চারুচন্দ্র রায়, প্রবর্তক প্রতিষ্ঠাতা মতিলাল রায়, মাষ্টার উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিক হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল, কর্মী কানাইলাল দত্ত চন্দননগরে লাঠি খেলা, ছোরা খেলা, বন্দুক ছোড়া, তীর ছোড়া শিক্ষা দিতেন। বন্দেমাতরম্, সন্ধ্যা, নবশক্তি প্রভৃতি সংবাদপত্র এই সময় চন্দননগরে বিপ্লবের খুব প্রেরণা দিয়াছিল। গোঁসাই ঘাটে মতিলাল একটা কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন—সেখানে রাসবিহারী প্রথমতঃ বন্ধুদর্শনে মিলিত হইতেন, তারপর তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিতেন, কখনো বা পরামর্শ দিতেন। ক্রমশঃ তিনি তাঁহাদের সহিত বিপ্লবপন্থী

হইয়া উঠিলেন। এই গোঁসাই ঘাটের কেন্দ্রে পুলিশের অত্যাচার কিভাবে বন্ধ করা যায় তাহারই পরামর্শ করা হইত। তখনও বিপ্লবীগণ ইংরেজদের বিরুদ্ধে একটা সুনিয়ন্ত্রিত বিদ্রোহের পরিকল্পনা করিয়া উঠিতে পারে নাই। সুতরাং অত্যাচারী ইংরেজ কিংবা ভারতীয় কর্মচারীকে গুপ্তহত্যা করিয়া পথ পরিষ্কার করিতে হইবে—এই সিদ্ধান্ত অনুসারেই তখন কাজ হইত।

মাণিকতলা বোমার মামলা তখন সমস্ত দেশকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। মামলার ফলাফল সমস্ত দেশ ঔৎসুক্যের সহিত লক্ষ্য করিতেছিল। জেলের ভিতরে নরেন গোঁসাইয়ের হত্যাকাণ্ড সমস্ত দেশকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। রাসবিহারী ব্যক্তিগত পরিচয়ের জন্য কানাইলালের ফাঁসিতে আরও বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন। তিনি যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাবে বিপ্লবের বাণী প্রচার করিতে লাগিলেন। এবার তাঁহার চন্দননগরে যাতায়াত ক্রমশঃ বর্ধিত হইতে লাগিল।

১৯১২ সাল, ডিসেম্বর মাস। দিল্লীতে নূতন রাজধানী প্রবেশের সময় বহু সমারোহে ও ভারতীয় অর্থব্যয়ে ভারতের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ শোভাযাত্রার ব্যবস্থা করেন। লাটসাহেব বিগত শতাব্দীর (১৮৭৭ খৃঃ অঃ) সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার জুবিলী উৎসব এবং প্রাচীন যুগের রাজসূয় উৎসবের অনুকরণে ভারতীয় জনসাধারণের মনে ব্রিটিশ শক্তি ও শৌর্যের প্রতি শ্রদ্ধা সঞ্চার করিতে প্রয়াস পাইলেন। সেই উৎসবের সমস্ত মহিমাকে নষ্ট করিয়া দিতে হইবে, বিপ্লবীগণের এই সিদ্ধান্ত স্থির হইল।

দিল্লী নগরীর রাজপথে বহু তোরণ নির্মিত হইয়াছে ; সুসজ্জিত হস্তী, অশ্ব ব্রিটিশ পতাকা-শোভিত রাজপথ দিয়া চলিয়াছে—অগ্রে পশ্চাতে অশ্ববাহিনী, পদাতিক, উষ্ট্রবাহিনী ; মণিরত্ন শোভিত ভারতীয় রাজন্যবর্গ ; লর্ড হার্ডিঞ্জ সপত্নীক সুসজ্জিত হস্তীপৃষ্ঠে ; চারিদিকে উৎসবের কলরোল ! অকস্মাৎ একটি বোমা আসিয়া লর্ড হার্ডিঞ্জের হস্তী চালককে আহত করিল। হস্তী চালকের মৃত্যু হইল, হস্তীপৃষ্ঠোপরি সিংহাসন দিল্লীর পথের ধূলায় লুণ্ঠিত হইল, লাটপত্নী বোমার শব্দে হতচৈতন্য হইয়া পড়িলেন—স্বয়ং লাটসাহেব আহত হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত উৎসবের উৎসাহ বিলীন হইয়া গেল। ব্রিটিশের শাসন-সংস্কার, বঙ্গভঙ্গ রদ এবং নূতন রাজধানী স্থাপনের মহিমা কিছুই বিপ্লবীদের বিপ্লব-প্রচেষ্টাকে রুদ্ধ করিতে পারিল না।

এই বোমাটি রাসবিহারী নারী দর্শক পরিবৃত ত্রিতল গৃহের ছাদ হইতে একখণ্ড শক্ত সূত্র দ্বারা নিক্ষেপের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই সমস্ত ব্যাপারের পরিকল্পনা করিয়াছেন রাসবিহারী, বোমা সংগ্রহ করিয়াছেন যতীন্দ্রনাথ, যোগসূত্র রক্ষা করিয়াছেন লীলাবতী নামধারী ছদ্মবেশী কিশোর বসন্ত বিশ্বাস। কি ভীষণ পরিকল্পনা, কি সাংঘাতিক আয়োজন, কি নিপুণ ছদ্মবেশ, কি অপরিমিত সাহস !

যদিও লাট সাহেবের আদেশে তৎক্ষণাৎ কোন অত্যাচার হইল না—তবু পুলিশ ও গুপ্তচর বিভাগ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু রাসবিহারী কিছুকাল নিশ্চিন্তমনে দিল্লীতে অবস্থান

করিতে লাগিলেন। কত নিরীহ দর্শক পথিক যে পুলিশের অত্যাচারে নিপীড়িত হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। রাসবিহারী বসন্ত বিশ্বাসকে সঙ্গে লইয়া দেরাদুনে চলিয়া গেলেন। সেখানে বড়লাটের বিপদে দুঃখপ্রকাশ করিবার জন্য সভা আহ্বান করিলেন। সেই সভায় বড়লাটের আরোগ্য কামনা করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করা হইল, এবং সেই প্রস্তাবের প্রতিলিপি বড়লাটের নিকট প্রেরণ করা হইল। ইউরোপীয় সমাজ রাসবিহারীর রাজভক্তির ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। তাঁহাদের মতে Mr. Bose is an angel. অন্যদিকে তিনি তিন বৎসর অবসর মত ছদ্মবেশে পাঞ্জাবের সমস্ত স্থানে ঘুরিয়া ফিরিয়া বিপ্লব প্রচার করিতে লাগিলেন এবং সন্ত্রাসবাদীদের সংগঠন করিতে লাগিলেন।

সেই সময় একবার রাসবিহারী এক বন্ধুর বাড়ীতে ছদ্মবেশে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন হঠাৎ পুলিশ সেই বাড়ী অবরোধ করে। মুহূর্তমধ্যে রাসবিহারী স্ত্রীলোকের ন্যায় কেশ বিন্যাস আরম্ভ করেন। পুলিশের আগমনে অন্তঃপুরে অর্ধসমাপ্ত কেশপাশের উপর তিনি অবগুণ্ঠন টানিয়া দিলেন এবং বাড়ীর অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে এক ঘর হইতে অন্যঘরে চলিয়া গেলেন। পুলিশ ঘর তল্লাস করিতে লাগিল। রাসবিহারী নারীর বেশে গৃহেই রহিয়া গেলেন।

কখনও তিনি ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ ধারণ করিতেন। তিনি খুব চমৎকার সংস্কৃত উচ্চারণ করিতে পারিতেন, স্তব পাঠ করিতেন, মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন। তিনি কিঞ্চিৎ জ্যোতিষ-

শাস্ত্র এবং হস্তরেখা পাঠ করিতে পারিতেন। পুলিশের লোক সাধারণতঃ দুর্বলচিত্ত, তাহারা অদৃষ্টকে বিশ্বাস করে; রাসবিহারী তাহাদের মনের দুর্বলতার সন্ধান জানিতেন এবং সেই দুর্বলতার সুযোগ লইতেন। পুলিশ অনেক সময় তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়া জ্যোতিষ ব্রাহ্মণ রাসবিহারীর সঙ্গে কথা বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আশীর্বাদ লইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। বিপ্লব প্রচারের সময় রাসবিহারী দেরাদুনে অফিসে কাজ করিতেন এবং নিজস্ব কর্তব্য সম্পাদন করিতেন। অফিসের প্রধান প্রধান সাহেব কর্মচারী তাঁহার সঙ্গে টেনিস খেলিতেন, ক্রিকেট খেলিতেন; তাঁহার ক্রীড়ানৈপুণ্যের জন্য তাঁহাকে ভালবাসিতেন। রাসবিহারীর মত কর্মক্ষম ভদ্র ব্যক্তি যে এই প্রকার সাংঘাতিক কাজ করিতে পারে তাঁহারা কখনো তাহা ধারণা করিতে পারিতেন না। রাসবিহারীর মনের ও দেহের ছদ্মবেশ ধারণ অতিশয় নিপুণ ছিল।

দিল্লীর বোমার ব্যাপারের নায়ক যে রাসবিহারী এই তথ্য শেষ পর্যন্ত পুলিশের অগোচর রহিল না। তাঁহাকে ধরাইয়া দিবার জন্য বহু সহস্র টাকা পুরস্কার ঘোষিত হইল। সেই পলাতক অবস্থায় বসন্ত বিশ্বাসের মধ্যস্থতায় জার্মাণ ষড়যন্ত্রীদের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ স্থাপন করেন। তাঁহার পলাতক জীবনের কেন্দ্র ছিল বেনারসে শচীন সান্যালের গৃহ। গতির দূরত্ব পশ্চিমে লাহোর, পূর্বে চন্দননগরে মতিলাল রায়ের বাড়ী; কখনো কাশ্মীরী ফলের দোকানদারের বেশে,

কখনো কাশীর ব্রাহ্মণের বেশে, কখনো পাঞ্জাবী সৈন্যের বেশে তিনি যাতায়াত করিতেন।

কাশীতে অবস্থান কালে বিপ্লবী মারাঠী পিংলের সহিত তিনি পরিচিত হন। পিংলে "গদর" দলের কর্মী এবং তিনি সংবাদ দিলেন—গদর দলের ৪০০০ বিদ্রোহী ভারতে আসিতেছে; তাহারা সমগ্র ভারতে বিপ্লব আরম্ভ করিবে। বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে আরও ২০০০০ হাজার বিদ্রোহী ভারতে আসিবে।

১৯১৫ সালে জানুয়ারি মাসে সর্বদলীয় বিপ্লবী সম্মেলনের কলিকাতা অধিবেশনে স্থির হইল—১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী "স্বাধীন ভারত" ঘোষণা করা হইবে। রাসবিহারী পশ্চিম ভারতে বিপ্লব কার্যের সমস্ত ভার গ্রহণ করিলেন। শচীন সান্যাল এবং পিংলে লাহোরে কাজ করিবেন। বিভূতি ও প্রিয়নাথ কাশীর সৈন্যদলে কাজ করিবেন; বাংলার ভার পড়িল যতীন্দ্রনাথ এবং ডাঃ যাদুগোপালের উপর, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সংযোগ রক্ষা করিবেন। রাসবিহারী হইলেন পশ্চিম ভারতের নায়ক। একসঙ্গে কাজ আরম্ভ হইবে লাহোর, রাওলপিণ্ডী, জব্বলপুর, কাশী, ঢাকায়। একবার বিদ্রোহ আরম্ভ হইলে পাঞ্জাব হইতে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত সমস্ত সৈন্যই যোগ দিবে। গোলা-বারুদ, সৈন্য-কর্মী সবই প্রস্তুত। কিন্তু বিদ্রোহ আরম্ভ হইবার দুই দিন পূর্বে বেনারসে কৃপাল সিংহ ও জব্বলপুরে বিনায়ক বিশ্বাসঘাতকতা করিল। রাসবিহারী ছদ্মবেশে পুলিসের দৃষ্টি এড়াইয়া চন্দননগরে আসিলেন। তিনি

বিন্দুমাত্র নিরুৎসাহ বা হতাশ হন নাই। একটু চিন্তা করিয়া নূতন কর্মপন্থা স্থির করিলেন। দেশে থাকিয়া কাজ করিতে হইলে পুলিশের দৃষ্টি এড়াইতেই অনেক সময় এবং বহু অর্থ নষ্ট হয়; অথচ কোন ব্যাপক কাজ হয় না। সুতরাং তিনি জাপানে কর্মকেন্দ্র স্থির করিলেন। কারণ আমেরিকা বা চীনে যাইতে হইলে জাপানই প্রশস্ত স্থান। তাহার উপর আপাততঃ ইংরেজ ও জাপান উভয়েই সাম্রাজ্যবাদী হইলেও তাহাদের মধ্যে ভারতের ব্যবসা লইয়া স্বার্থ-সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। এই স্বার্থ-সংঘাতের সুযোগ লইতে রাসবিহারী মনস্থ করিলেন।

অবশেষে জাপানে যাওয়াই তিনি স্থির করিলেন। জাপান যাত্রা করাই প্রধান সমস্যা। রাসবিহারী বসুর নামে প্রকাশ্যে ছাড়পত্র পাওয়া অসম্ভব। অথচ ভারতবর্ষে আর একদিনও অবস্থান করা নিরাপদ নয়। এই সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে জাপানদেশে আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। রাসবিহারী এই আমন্ত্রণের সুযোগ গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিলেন। রবীন্দ্রনাথের সহযাত্রী-দের অন্যতম সভ্যরূপে মিঃ পি, এন টেগোর নাম দিয়া ছদ্মবেশে ফোটোগ্রাফ তুলিয়া পাসপোর্ট গ্রহণ করিলেন। জাপান যাত্রার কারণ বলিলেন যে পি, এন, টেগোর রবীন্দ্রনাথের আত্মীয় এবং পথে প্রবাসে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থার জন্যই তিনি অগ্রগামী দূতরূপে চলিয়াছেন।

মে মাস, ১৯১৫ সাল। তিনি তখন চন্দননগরে মতিলাল রায়ের গৃহে অতিথি। জাহাজে উঠিতে হইবে খিদিরপুরে; ট্রেনে আসিলে পি, এন, টেগোর ধরা পড়িবার ভয়ে

নৌকাযোগে গোঁসাইঘাট হইতে চন্দননগর ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে ছিলেন শচীন্দ্রনাথ সান্যাল। 'সান্‌কী-মারু' জাহাজে তাঁহার জিনিষ-পত্রাদি পূর্বেই পৌঁছিয়াছিল। তিনি জাহাজ ছাড়িবার কয়েক মিনিট পূর্বে অত্যন্ত ব্যস্তভাবে আসিয়া কেবিনে প্রবেশ না করিয়া ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা করিলেন। তাঁহার ছাপান কার্ডে পরিচয় ছিল পি, এন, টেগোর, সেক্রেটারী আর আর, এন, টেগোর, শান্তিনিকেতন। জাহাজের ক্যাপ্টেন রবীন্দ্রনাথের পার্শন্যাল সেক্রেটারী মিঃ পি, এন, ঠাকুরের যথেষ্ট যত্ন করিতে লাগিলেন।*

জাহাজ সাংহাই পৌঁছিলে স্থানীয় ভারতবাসীগণ রবীন্দ্রনাথের সম্বর্ধনা এবং আতিথ্যের ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া তাঁহার কাছে প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু সাধারণের সহজ দৃষ্টি এড়াইজন্য তিনি কোন সভা-সমিতিতে যোগদান করেন নাই, কিন্তু কয়েকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া ভারতে অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণের ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহার ছদ্মবেশ এত নিপুণ হইয়াছিল যে সাংহাইয়ের কর্তৃপক্ষ পি, এন, টেগোরকে অত্যন্ত বেশী শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া নিজেরা কৃতার্থ হইয়াছিল।

সাংহাই হইতে যথাসময়ে কোবে বন্দরে এবং পরে টোকিওতে তিনি উপস্থিত হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে জাপানের ব্ল্যাক ড্রাগন দলের নেতা প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত মিৎসু

---

* রাসবিহারীর এই জাপান যাত্রার বিষয়ে বিভিন্ন প্রকার কাহিনী প্রচলিত আছে।

তোয়ামার আতিথ্য গ্রহণ করিলেন; কারণ রাসবিহারী রবীন্দ্রনাথের সেক্রেটারী। কয়েকদিন পরে তিনি তোয়ামার নিকট আত্মপরিচয় প্রকাশ করিলেন। তোয়ামা তাঁহার সমস্ত ইতিহাস শুনিয়া বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহার ভগবৎ বিশ্বাস দেখিয়া তাঁহাকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। এই সময়ে তোয়ামার গৃহে রাজপরিবারের ব্যারণ জাপানের মন্ত্রী নাকামুরা পরিবারের সঙ্গে রাসবিহারীর পরিচয় হয়। নাকামুরার কন্যা রাসবিহারীর বিপ্লব-জীবনের কাহিনী শুনিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য নানা প্রকারে সাহায্য করেন। মন্ত্রীকন্যা নিজের একটি বেকারীতে রাস-বিহারীকে কাজ দিয়া তাঁহার আহার ও বাসস্থানের বন্দোবস্ত করিয়া দেন। অতিশয় ক্ষিপ্রতার সহিত রাসবিহারী তিন সপ্তাহের মধ্যে কথ্য জাপানী ভাষায় কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। প্রথম বেতন পাইয়াই তিনি মন্ত্রীকুমারীকে একটি মূল্যবান পোষাক উপহার দিলেন। মন্ত্রীকুমারীর আতিথ্য ভারতীয় অতিথিকে কেন্দ্র করিয়া নূতন কল্পলোক রচনা করিল। রাসবিহারী যাহাতে নাগরিক অধিকার লাভ করিতে পারেন, সেই জন্য মন্ত্রীকুমারী পিতাকে অনুরোধ করিলেন। পিতা ও কন্যা জানিতেন যে জাপানী নাগরিক অধিকার লাভ করিতে পারিলে রাসবিহারী বৃটিশ ক্ষমতার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইবেন।

মন্ত্রীকন্যার ব্যবস্থামত আরও কিছুকাল রাসবিহারীকে ছদ্মবেশে দিন যাপন করিতে হইল। কারণ বৃটিশ কর্তৃপক্ষের

শ্যেন দৃষ্টি এই নবাগত ভারতবাসীকে কেন্দ্র করিয়া মন্ত্রী মহাশয়ের গৃহের চতুর্দিকে সঞ্চরণ করিতেছিল। সুতরাং মন্ত্রী-কুমারীর ব্যবস্থামত রাসবিহারী ছদ্মবেশে মন্ত্রী মহাশয়ের পরিচিত একটি রেস্তোরাতে কাজ করেন। সেখানে একটি উদ্যান-বাটিকার রক্ষকের সহিত পরিচয় করাইয়া সেখানে তাঁহার বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিদিন সান্ধ্য ভ্রমণের পর প্রত্যাবর্তনের সময় মন্ত্রীকন্যা উদ্যান-বাটিকায় রাসবিহারীকে জাপানী ভাষা, জাপানী সমাজরীতি এবং জাপানী রাষ্ট্র-ব্যবস্থা বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। এই শিক্ষার অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। কারণ, জাপানে নাগরিক অধিকার লাভের পূর্বে তাঁহাকে রাষ্ট্রের গুপ্ত কর্মচারীর নিকট পরীক্ষা দিতে হয়। তাঁহাদের মতের উপর নির্ভর করিয়া সরকার রাষ্ট্রীয় অধিকার দান করে। বাস্তবিকপক্ষে ইহা অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষা; এবং এই পরীক্ষা করেন "ব্ল্যাক ড্রাগন" দল। এই দল একটি পরোক্ষ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। ইহার সভ্যরা রাষ্ট্রের সমালোচক; অথচ রাজাকে এবং রাজপরিবারের লোক-দিগকে দেবতা বলিয়া সম্মান করেন। ইঁহারা দেশের রাষ্ট্র-ব্যবস্থার একটা বিশিষ্ট অংশ। ইঁহারা দেশের রাজকর্মচারীদের উপদেশ দেন। তাঁহাদের উপদেশ অমান্য করিবার অধিকার এক সম্রাট ভিন্ন অন্য কাহারও নাই। কোন কর্ম-চারী যদি ইঁহাদের আদেশ অমান্য করে, তবে তাহাকে গোপনে লুকাইয়া ফেলা হয় বা হত্যা করা হয়—অথচ পুলিশ কোন উচ্চবাচ্য করিতে সাহস করে না। বিদেশীকে নাগরিক

অধিকার দেওয়ার পূর্বে ব্ল্যাক ড্রাগন দল তাঁহার নাগরিক অধিকারের যোগ্যতা সম্বন্ধে পরীক্ষা করেন।

মন্ত্রীকুমারী রাসবিহারীকে ব্ল্যাক ড্রাগন দল সম্বন্ধে সমস্ত কথা বলিয়া দিলেন এবং কি রকম প্রশ্নের কি রকম উত্তর হইবে তাহার আভাষও দিলেন। পরিশেষে বলিয়া দিলেন—যদি ব্ল্যাক ড্রাগন দল তাঁহার বিরুদ্ধে মত পোষণ করেন তবে কখনো জাপানে তাঁহার স্থান হইবে না এবং হয় তো মন্ত্রীকন্যা তাঁহাকেই গুলি করিয়া হত্যা করিতে বাধ্য হইবেন। মন্ত্রীকন্যা তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন—যদি সেই দুর্দিন উপস্থিত হয়, তবে তিনিই প্রথমে "হারিকিরি" ( পেট চিরিয়া ) করিয়া আত্মহত্যা করিবেন, তারপর যেন রাসবিহারী পিস্তল দিয়া আত্মহত্যা করেন।

আর মাত্র ৭ দিন সময় অবশিষ্ট আছে। চারিদিন চলিয়া গেল তবুও ব্ল্যাক ড্রাগন দল তাঁহাকে পরীক্ষা করিত আসিল না। অন্যদিকে আশ্রয়দাত্রী মন্ত্রীকুমারীও চারিদিন অনুপস্থিত। পঞ্চম দিনে মন্ত্রীকুমারী একটি পিস্তল রাসবিহারীর নিকট রাখিয়া গেলেন। ইঙ্গিত অত্যন্ত সুস্পষ্ট। সন্ধ্যার পূর্বে তিন জন ভদ্রবেশধারী জাপানী রাসবিহারীর সহিত দেখা করিতে আসিলেন। তাঁহাকে কয়েকটী সাধারণ প্রশ্ন ও কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন; তিনিও সাধারণভাবে উত্তর দিলেন। তাঁহার উত্তর শুনিয়া এই ভদ্রলোকগণ কোন মন্তব্য প্রকাশ করিলেন না। এমন কি রাসবিহারীর মত এত বুদ্ধিমান লোকও তাঁহাদের কথাবার্তা কিংবা আচরণের মধ্যে কোন

আভাষ খুঁজিয়া পাইলেন না, ইহারা যেন প্রস্তর মূর্তি! এই পরীক্ষার পর কয়েকদিন আর মন্ত্রীকুমারী দর্শন দেন নাই। ইহাতে রাসবিহারী আরও উদ্বিগ্ন হইলেন; ভাবিলেন, বোধ হয় নাগরিক অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবেন। অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে একদিন সন্ধ্যাবেলা তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিলেন মন্ত্রীকুমার ও নববধূবেশে সজ্জিতা মন্ত্রীকুমারী। রাসবিহারী ভাবিলেন, বোধ হয় মন্ত্রীকুমারীর 'হারিকিরি' করিবার পূর্বাভাষ। মন্ত্রীকুমার হস্ত প্রসারণ করিয়া বলিলেন "আপনি এই রেশমের "কিশমে"(জাপানী বিবাহের পোষাক) পরিধান করুন; মন্দিরে পুরোহিত অপেক্ষা করিতেছেন, আজ আপনার বিবাহ। আপনি জাপানী নাগরিক, আমাদের সম্ভাষণ গ্রহণ করুন।"

রাসবিহারীর ভাবিবার অবসর নাই, উত্তর দিবার সময় নাই; তিনি মন্দিরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। মন্ত্রীকুমারীর সহিত নিঃস্ব ভারতবাসীর শুভ-পরিণয় সমাপ্ত হইল। স্বপ্ন, না মায়া, না সত্য!

পরে রাসবিহারী জানিতে পারিয়াছিলেন যে বৃটিশ সরকারের অনুরোধ সত্বেও রাসবিহারীকে বৃটিশের হস্তে সমর্পণ করা হয় নাই। ইহার কারণ ব্ল্যাক ড্রাগনদলের প্রভাব। এই ব্ল্যাক ড্রাগনদলের অধিনায়ক ছিলেন মিৎসু তোয়ামা। তিনি জাপানের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত, গভীর দার্শনিক এবং বিচক্ষণ যোগীপুরুষ বলিয়া পরিচিত। বুদ্ধদেবের জন্মভূমি ভারতের যোগী সন্ন্যাসীদের প্রতি তোয়ামার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল।

রাসবিহারীর সঙ্গে আলাপ করিয়া তিনি তাঁহার ধর্মবিশ্বাস দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তোয়ামার সহিত প্রথমে সাক্ষাৎ না হইলে রাসবিহারী সাভারকারের মত ভারত সরকারের হস্তে সমর্পিত হইতেন।

বিবাহের কয়েকদিন পরেই তিনি নব-বধূকে লইয়া নূতন আবাস রচনা করিলেন। অর্থ উপার্জনের জন্য টোকিওর বিখ্যাত 'জিনজা' অঞ্চলে এক হোটেল আরম্ভ করেন। রাসবিহারীর সৌজন্যে, তাঁহার স্ত্রীর নিপুণতায় এবং সাদর অভ্যর্থনায় টোকিওর বহু গণ্যমান্য রাজকর্মচারী এই হোটেলে আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। ভারতীয় প্রবাসীগণ এই হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। ক্রমশঃ এই হোটেল বিশিষ্ট রাজকর্মচারীদের মিলন-স্থল হইয়াছিল।

রাসবিহারী বসুর একটি পুত্রসন্তান ও একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। পুত্রের নাম রঞ্জুকি বসু ও কন্যার নাম ভারতী বসু। পুত্রকে তিনি কিছু বাংলা শিক্ষা দিয়াছিলেন।

রাসবিহারী বসু জাপানে আর্থিক স্বচ্ছলতা, সামাজিক সম্মান এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভ করা সত্বেও ভারতবর্ষকে কোনদিন ভুলিয়া যান নাই। জাপানে ভারতীয় আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতি আকর্ষণের জন্য তিনি ভারতীয় ভাবধারা প্রচারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ১৯২১ সালে তিনি জাপানে ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ (Indian Independence League) স্থাপন করেন। তিনি অত্যন্ত দূরদর্শী ছিলেন। জাপানের জাতীয় দুর্বলতার বিষয় তিনি খুব সচেতন ছিলেন। জাপানীরা নিজ

দেশ ও জাতির লক্ষ্য সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। তাহাদের ধারণা ছিল, তাহারা এশিয়ার মধ্যে সর্বাপেক্ষা শৌর্যশালী এবং পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম শক্তিশালী জাতি। জাপানকে এশিয়ার মুখপাত্ররূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে জাপানের প্রয়োজন সমস্ত এশিয়াবাসীদের সহজ সহানুভূতি লাভ। ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর সহানুভূতি জাপানকে পৃথিবীর রাষ্ট্রসংঘে এ বিষয়ে প্রতিনিধিত্ব করিতে সমর্থ করিবে। ভারতবাসীর রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সাহায্য করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে ইংরাজ এবং জাপানের মধ্যে ঈর্ষা-বীজ বপন করিতে হইবে ; সুতরাং প্রচার কার্যের উদ্দেশ্যে রাসবিহারী একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। ইংরাজী ও জাপানী ভাষায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জাপানী সংবাদপত্রে তিনি সর্বদা প্রবন্ধ লিখিতেন। ভারতে ইংরাজের কার্যকলাপ বিষয়ে তিনি সান্ডারলাণ্ডের বিখ্যাত পুস্তক "India in Bondage" "পরাধীনতার পাশে ভারত" পুস্তকের অনুবাদ করেন। এই পুস্তকখানির প্রচার ভারতে বহুদিন নিষিদ্ধ ছিল।

তাঁহার হোটেলে তিনি বহু ভারতবাসীর সহিত পরিচিত হন এবং অনেকেই তাঁহার স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন। কেহ কেহ তাঁহাকে প্রত্যক্ষ সাহায্যও করেন। যুক্তপ্রদেশের বিপ্লবী রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জার্মাণীর সংগে রুশিয়ার সাহায্যে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। তিনি আফগানিস্থানে প্রথম স্বাধীন ভারত গবর্ণমেণ্ট স্থাপন করেন এবং স্বাধীন ভারতের

পতাকা উত্তোলন করেন। তারপর তিনি নির্বাসিত জীবন যাপন করেন। তুরস্ক রক্ষার প্রচেষ্টা বিফল হইলে তিনি চীনদেশ অতিক্রম করিয়া জাপানে উপস্থিত হন। এখানে রাসবিহারী বসুর সংগে তাঁহার বহু আলোচনা হয়। তাঁহারা স্বাধীন ভারতের পরিকল্পনা করেন।

১৯৩০ সালে মারাঠী যুবক কর্মী দেশপাণ্ডে জাপানে আসিয়া রাসবিহারীর সংস্পর্শে আসেন। রাসবিহারীর স্বাধীন ভারতের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯৩০ সালের ভূমিকম্পে রাসবিহারীর হোটেলটি নষ্ট হইয়া যায়। ১৯৩০ সালেই রাসবিহারীর স্ত্রী পরলোক গমন করেন। ইহাতে তাঁহার জীবনের আনন্দ ও উৎসাহ অনেকখানি ম্লান হইয়া যায়। কিন্তু দেশপাণ্ডের উৎসাহে ও সাহায্যে রাসবিহারী তাঁহার কর্মপথ হইতে বিচ্যুত হন নাই। দেশপাণ্ডে তাঁহার সহকারী রূপে কাজ আরম্ভ করেন।

রাসবিহারী মনে প্রাণে হিন্দু ছিলেন। তিনি জাপানে একটি হিন্দু মন্দির প্রতিষ্ঠার সংকল্প করেন। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্য উহা সম্ভব হয় নাই।

রাসবিহারী বসু গান্ধীজীর অসহযোগ নীতিকে খুব উৎসাহের সহিত লক্ষ্য করিতেন। তিনি অহিংসা নীতিকে অবিশ্বাস করিতেন কিনা সে প্রশ্ন আসে না; কারণ যে পথেই হউক ভারতের স্বাধীনতাই রাসবিহারীর কাম্য ছিল। তিনি বলিতেন, —পৃথিবীর মুক্তির জন্য ভারতের স্বাধীনতার প্রয়োজন।

১৯৪১ সালের নভেম্বর মাসে জাপান দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে

যোগদান করে। জাপান পার্লহারবার, সিঙ্গাপুর, সায়গণ, হংকং, রেঙ্গুন প্রভৃতি পূর্ব এশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি অধিকার করে। ইংলণ্ড হইতে ক্রীপস্ সাহেব আপোষ-মীমাংসার জন্য প্রস্তাব লইয়া ভারত আগমন করেন। রাসবিহারী বসু ১৩ই এপ্রিল, ১৯৪২ সালে বেতার বক্তৃতায় ক্রীপস্ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় ভারতবর্ষকে অভিনন্দিত করিলেন—বৃটেন ও তার দূত ক্রীপসের সংগে মীমাংসার সর্ত্ত গ্রহণ না করার জন্য আমি রাসবিহারী বসু, পূর্ব এশিয়াবাসী ভারতীয়দের পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে আপনাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

এইবার রাসবিহারী বসুর জীবনের শেষ অধ্যায় আরম্ভ হইল। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সংগে সংগেই রাসবিহারী ধারণা করিয়াছিলেন এই যুদ্ধই হইবে জীবনের সর্বশেষ সুযোগ। সুতরাং ১৯৪২ সালে ২৮শে মার্চ তিনি টোকিও সহরে পরামর্শের জন্য একটি শুভেচ্ছা সম্মেলন আহ্বান করেন—(Good Will Mission Conference)। এখানে রাসবিহারী ঘোষণা করেন যে এই যুদ্ধের সুযোগ ভারতবর্ষকে গ্রহণ করিতে হইবে; এইবারই ভারতবর্ষকে স্বাধীন হইতে হইবে এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একটি কর্মসূচী নির্ধারণ করিতে হইবে। স্থির হইল যে চারি মাস পরে থাইল্যাণ্ডের রাজধানী বেঙ্কক শহরে পূর্ব এশিয়াবাসী ভারতীয়দের একটি সম্মেলন আহ্বান করা হইবে।

জাপান মালয় ও ব্রহ্মদেশ আক্রমণ করিল। ব্রিটিশদের পূর্ব

এশিয়ার রাজ্য তাসের ঘরের মত হাওয়ায় উড়িয়া গেল। ব্রিটিশ রাজত্বের ভিত্তি ছিল ব্রিটিশ শক্তিতে প্রজাবর্গের বিশ্বাস ; সেই বিশ্বাস নষ্ট হইয়া গেল। ব্রিটিশগণ ভারতীয় সৈন্য ও প্রজাবর্গকে নিতান্ত অরক্ষিত ও অসহায় অবস্থার মধ্যে রাখিয়া পলায়ন করে। ভারতীয় সৈন্যদল জাপানরাজের বন্দী হইল। সুতরাং ভারতীয়গণ স্থির করিল তাহারা জাপানের সহিত যোগ দিয়া ইংরেজকে ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত করিবে। ইহাদের নেতা হইলেন ক্যাপ্টেন মোহন সিং। সহকারী প্রীতম্ সিংহ ছিলেন রাসবিহারীর ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেন্‌ডেন্স লীগের কর্মী ; তাঁহার মধ্যস্থতায় মোহন সিংহের সঙ্গে রাস-বিহারীর পরিচয় হয়। এই দুইজন কর্মীর চেষ্টায় জাপানীদের বন্দী ভারতীয় সৈন্যগণ রাসবিহারীর লীগে যোগ দিল।

বেঙ্কক অধিবেশনে ১২০ জন ভারতীয় প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। রাসবিহারী সেই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। সভায় স্থির হইল যে ভারতের মুক্তির জন্য একদল সৈন্য গঠিত হইবে। সেই সৈন্যের অধিনায়ক হইলেন ক্যাপ্টেন মোহন সিং। এই জন্য একটী কার্য নির্বাহক সমিতি গঠিত হইল।

সভাপতি—রাসবিহারী বসু, সভ্য—এন, রাঘবন,
কর্ণেল গিলানী,
কে, পি, কে মেনন,
ক্যাপ্টেন মোহন সিং,
নাম—আজাদ হিন্দ ফৌজ।

এই আজাদ হিন্দ ফৌজের মূল শিবির হইল সিঙ্গাপুর।

ক্যাপ্টেন মোহন সিং-এর অধীনে সৈন্যদলের একটি বিভাগ জাপানীদের সঙ্গে রেঙ্গুনে আসিয়া জাপানীদের আদেশ বহন করিয়া যুদ্ধে যোগ দেয়। রাসবিহারী বসু তাঁহার নির্দেশ না লইয়া ভারতীয় সৈন্যদের জাপানের আজ্ঞাবাহী রূপে কাজ করিবার অনুমতি দেওয়ার জন্য মোহন সিং-এর কৈফিয়ত দাবী করেন। ইহাতে মোহন সিং অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেন এবং আজাদ হিন্দ দল ভাঙ্গিয়া দিতে চেষ্টা করেন। রাসবিহারী দূরদর্শী ব্যক্তি, সুতরাং মোহন সিং বহুদূর অগ্রসর হইবার পূর্বে তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া বন্দী করেন। মোহন সিং রাসবিহারীকে অত্যাচারী এবং এক-নায়কত্ব লোভী বলিয়া ঐ সৈন্যমহলে অসন্তোষ সৃষ্টির চেষ্টা করিলেন। আজাদ হিন্দ দল তখন আত্মকলহে মুমূর্ষু। কিন্তু রাসবিহারীর ব্যবস্থায় জেনারেল ইয়াকুরো মোহন সিংকে বন্দী করিয়া সেণ্ট জন দ্বীপে প্রেরণ করেন।

১৯৪১ সালের জানুয়ারি মাসে সুভাষচন্দ্র বসু হঠাৎ ভারত হইতে নিরুদ্দেশ হন; এবং কাবুল ও রুশ হইয়া বার্লিনে আসিয়া উপস্থিত হন। এখানে তিনি হিটলারের পূর্ণ সহানুভূতি লাভ করিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে জার্মানীর পক্ষে ভারতবর্ষকে সাহায্য করা অসম্ভব, সুতরাং বার্লিন হইতে টোকিওতে রাসবিহারীরর সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ করিলেন এবং রাসবিহারীর পূর্ণ সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি পাইয়া টোকিওর পথে যাত্রা করিবেন স্থির করিলেন।

সুভাষচন্দ্র জাপানে উপস্থিত হন ১৩ই জুন, ১৯৪৩।

তাহার একুশ দিন পরে টোকিওর পথে কাথে নামক সুসজ্জিত উদ্যানে এক সভা আহুত হয়। সহস্র সহস্র ভারতবাসী সামরিক ও অসামরিক—বন্দেমাতরম্ মন্ত্রে সভা আরম্ভ করে। রাসবিহারী বসু সর্বজন সমক্ষে সুভাষচন্দ্রের হস্তে আজাদ হিন্দ দলের সর্বাধিকার ন্যস্ত করেন। উপস্থিত সকলেই সুভাষ-চন্দ্রেকে "নেতাজী" বলিয়া অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। সুভাষ-চন্দ্র রাসবিহারী প্রদত্ত সেই গুরুভার দেবতার আশীর্বাদের ন্যায় গ্রহণ করিলেন। এই সভায়ই একটি অস্থায়ী কার্য-নির্বাহক সমিতি গঠিত হয়। সেই সমিতির পক্ষে রাসবিহারী হইলেন—একমাত্র পরামর্শদাতা, সুভাষচন্দ্র হইলেন সর্বাধিনায়ক।

১৯৪৩ সালের ২১শে অক্টোবর অস্থায়ী জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হইল। ১৯১৫ সালে রাসবিহারী বসু ভারতে স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের জন্য বিদ্রোহ ঘোষণার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। রাসবিহারী বসুর বয়স তখন ৩৫ বৎসর; তাঁহার সেই স্বপ্ন নূতন রূপ নিল ৬৩ বৎসর বয়সে। সুভাষ বসুর রাজসরকারের কেন্দ্র ছিল সিঙ্গাপুরে, রাসবিহারী বাস করিতেন টোকিওতে। স্বাধীন ভারতের পক্ষে জাপ সরকারের সঙ্গে কূটনৈতিক আলাপ-আলোচনা করার ভার ছিল রাসবিহারীর উপর।

১৯৪৪ সালে জাপানের সামরিক পরিস্থিতি জটিল হইয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে আজাদ হিন্দ সৈন্যের অবস্থাও শোচনীয় হইয়া উঠিল। জাপান যুদ্ধের শেষ দিকে ভারতবর্ষকে

সমস্ত শক্তি দিয়া সাহায্য করিতে পারে নাই। হঠাৎ রাসবিহারীর শারীরিক অবস্থা খারাপ হইয়া আসিল। সুভাষচন্দ্র তাঁহার রোগশয্যায় যথাসাধ্য পরিচর্যার ব্যবস্থা করিলেন।

তাঁহার একমাত্র কন্যা বৃদ্ধ পিতার রুগ্ন শয্যাপার্শ্বে, একমাত্র পুত্র কাপ্টেন রঞ্জুকী বসু তখনো যুদ্ধক্ষেত্রে। তাঁহাকে সংবাদ দেওয়ার জন্য পরামর্শ হইল। রাসবিহারী একমাত্র পুত্রকে শেষ দেখার জন্য অত্যন্ত আকাঙ্খিত হইলেও বলিলেন—না, তাকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ডেকো না, সেখানে তাহার প্রয়োজন বেশী। কি অদ্ভুত কর্ত্তব্যনিষ্ঠা!

১৯৪৫ সালের ২১শে জানুয়ারী রাসবিহারী নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া গেলেন—বিদেশে। তাঁহার বড় ইচ্ছা ছিল তিনি স্বাধীন ভারতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিবেন—তাঁহার শেষ অস্থি প্রোথিত হইবে স্বাধীন ভারতে। কিন্তু সেই অন্তিম ইচ্ছা তাঁহার জীবদ্দশায় পূর্ণ হয় নাই। তবু তাঁহার অমর আত্মা আজ স্বাধীন ভারতে চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাঁহার অশরীরী আত্মার আশীর্বাদ ভারতের অমূল্য সম্পদ।

( ১৯০৪—১৯২৯ সাল )

১৯১৪-১৯১৮ সাল। প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধ তীব্রবেগে চলিতেছে। যুদ্ধপ্রচেষ্টার অঙ্গস্বরূপ বৃটিশরাজ ভারতে বিপ্লবীদের অঙ্কুর নির্মূল করিতে প্রয়াস পাইলেন। অত্যাচারে বিপ্লবী কর্মপ্রচেষ্টা অনেকটা সঙ্কীর্ণ হইয়া গেল। অনেক বিপ্লবীকে নির্বাসিত করা হইল। দিল্লী, মিরাট ও লাহোর ষড়যন্ত্রের মামলার বহু আসামী কারাগারে আবদ্ধ হইলেন। কাকোরী মামলার বহু বিপ্লবী ফাঁসীকাঠে প্রাণ দিলেন; কেহবা দ্বীপান্তরে আন্দামানে প্রেরিত হইলেন। রাসবিহারী বসু জাপানে চলিয়া গেলেন।

ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব প্রচেষ্টা দমন করিলেও বহির্ভারতে যুদ্ধের আকার জটিল অবস্থা ধারণ করিল। মুসলমানগণ তুরস্কের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়ায় বৃটিশ রাষ্ট্রধুরন্ধরগণ

শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন এবং খিলাফৎ ধ্বংস হইবে না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হইলেন। অন্যদিকে এনি বেশান্ত 'হোমরুল' আন্দোলন আরম্ভ করেন এবং ভারতের স্বায়ত্বশাসন দাবী করেন। বিপিন পাল প্রভৃতি নেতাগণ এনি বেশান্তের আন্দোলন সমর্থন করিয়া সমস্ত ভারতব্যাপী এক নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন সৃষ্টি করিলেন। ভারতীয় সৈন্যগণ যুদ্ধে অপূর্ব বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া বিশ্ববাসীর প্রশংসা লাভ করিল ; সুতরাং বৃটিশ শাসকগণ ভারতবর্ষকে তুষ্ট করিবার জন্য মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ড শাসনসংস্কার প্রবর্তনের পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন করিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষকে পূর্ণ বিশ্বাসের অযোগ্য মনে করিয়া এবং ভারতের ঐক্য বিনাশ করিবার জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করিলেন ; সেই সঙ্গে এনি বেশান্তকে আমেরিকায় নির্বাসিত করিলেন।

১৯১৭ সালে রাশিয়া রাজতন্ত্রের ধ্বংস করিয়া বলশেভিক শাসনতন্ত্র স্থাপিত করিল। বিপ্লবী নরেন ভট্টাচার্য রাশিয়াতে উপস্থিত হইয়া লেনিনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। তাঁহার নূতন নাম হইল মশিয়ে এম, এন, রে। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ভাবিল ভারতে বিপ্লববাদ প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। তাহারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। কিন্তু অকস্মাৎ একদিন কলিকাতায় শাঁখারীটোলার ডাকাতি ও দীনেশ গুপ্ত কর্তৃক লোম্যান সাহেবের হত্যাকাণ্ডে দেশবাসী বুঝিল বিপ্লবীরা মরিয়াও মরে নাই।

১৯১৮ সাল, নভেম্বর মাস। বৃটিশের যুদ্ধবিজয় ঘোষণা

করা হইল। ভারতে নূতন শাসনসংস্কার প্রতিষ্ঠা করা হইল। ভারতবাসী স্বায়ত্বশাসন অধিকারের উপযুক্ত স্বীকৃত হইল। সঙ্গে সঙ্গে রাওলাট আইনও প্রবর্তিত হইল। ভারতবাসী মর্মে মর্মে অনুভব করিল যে ইংরেজ ভারতবাসীকে বিশ্বাস করে না এবং ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলন ভবিষ্যতে যাহাতে ব্যাপক আকার ধারণ করিতে না পারে তাহারই জন্য অপচেষ্টা করা হইবে। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে আসিয়া ভারতবর্ষে রাজনীতিক্ষেত্রে যোগদান করিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকাতে ভারতবাসীদের রাজ-নৈতিক অধিকারের জন্য তিনি বিরাট গণ-আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং সেই অভিজ্ঞতার মূলধন লইয়া তিনি ভারতবাসীর পক্ষে রাওলাট আইনের প্রতিবাদ করিলেন। তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, "শাসনসংস্কার প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসীর রাজনৈতিক আন্দোলন বন্ধ করার ব্যবস্থা করায় ভারতীয় আশা-আকাঙ্খার প্রতি ইংরেজের শুভ ইচ্ছার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না।"

এই রাওলাট আইনের প্রতিবাদকল্পে ভারতের সর্বত্র বিক্ষোভ প্রকাশ করা স্থির হইল। ১৩ই এপ্রিল রামলীলা উৎসবের দিনে পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে রাওলাট বিলের বিরুদ্ধে এক বিরাট প্রতিবাদ সভা আহূত হয়। পাঞ্জাবের শাসনকর্তা স্যার মাইকেল ওডায়ার এই সভা বন্ধ করিবার জন্য আদেশ দিলেন। রামলীলা উৎসবে বহু সহস্র নরনারী ও শিশু জালিয়ানওয়ালাবাগের ধর্মক্ষেত্রে উপস্থিত ছিল। জেনারেল

ডায়ার সসৈন্যে সভাক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া নিরস্ত্র শিশু ও নরনারী হত্যা করিয়া নব কুরুক্ষেত্র রচনা করিলেন। প্রায় বিশ সহস্র ভারতবাসীর রক্তে পঞ্চনদীর তীর প্লাবিত হইয়া গেল। রবীন্দ্রনাথ এই হত্যার প্রতিবাদে 'স্যার' উপাধি ত্যাগ করিয়া মৃত দেশবাসীর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা তর্পণ করিলেন। মোহনদাস করম চাঁদ গান্ধী আরম্ভ করিলেন অসহযোগ। ভারতের বিপ্লবের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় সূচিত হইল।

এই অসহযোগ আন্দোলনে বাংলাদেশের ছাত্রসমাজ চঞ্চল হইয়া উঠিল। ছাত্র আন্দোলন ক্রমশঃ তীব্র হইতে তীব্রতর আকার ধারণ করিল। উহার পুরোভাগে দেখিতে পাই যতীন্দ্র দাস, সাউথ সুবারবান কলেজের একটি ছাত্র। ১৯২০ সাল—অসহযোগের পঞ্চ পন্থা গৃহীত হইল—ছাত্রদের বিদ্যালয় বর্জন, উকিলদের আদালত বর্জন, জনসাধারণের বিদেশী বর্জন, অভিজাতদের গভর্ণমেণ্ট উপাধি বর্জন, নাগরিকদের কাউন্সিল বর্জন। চিত্তরঞ্জন দাস বর্জন করিলেন বিরাট আইন ব্যবসায়, সুভাষচন্দ্র করিলেন আই. সি. এস পদত্যাগ, যতীন্দ্রনাথ করিলেন কলেজ বর্জন। পিতার কঠোর তিরস্কারে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া তিনি কংগ্রেস কার্যালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

যতীন্দ্রনাথ ১৯০৪ সালে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতামহ মহেন্দ্রনাথ দাস মুন্সেফ ছিলেন, পিতা বঙ্কিমবিহারী দাস সাধারণ গৃহস্থ। তাহার এক ভ্রাতা কিরণচন্দ্র দাস। শৈশবেই যতীন্দ্রনাথ কঠোর পরিশ্রম, অসাধারণ সহিষ্ণুতা ও অনমনীয় স্বাধীনচিত্ততার জন্য বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে সুপরিচিত

ছিলেন। চিত্তরঞ্জনের আহ্বানে যতীন্দ্রনাথ কলেজ বর্জন করিলেন ১৯২০ সালে। কিন্তু পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে ভীষণ অর্থকষ্টে পড়িতে হইল। অনেকদিন তাঁহাকে খাদ্যাভাব সহ্য করিতে হইয়াছে, সামান্য মুড়ির উপর নির্ভর করিয়া বহুদিন কাটিয়াছে। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ কখনো কাহারও নিকট নিজের দৈন্যের কথা জানাইতেন না। বাধ্য হইয়া তাঁহাকে ১০৲ টাকা বেতনে একটি গৃহশিক্ষকের কাজ গ্রহণ করিতে হয়। কংগ্রেস আফিসে বাসকালীন যতীন্দ্রনাথ কখনও কংগ্রেস হইতে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য কোন অর্থ গ্রহণ করেন নাই।

১৯২১ সালে পশ্চিমবঙ্গে জলপ্লাবনের সময় স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করিয়া তিনি অপূর্ব কর্মক্ষমতার পরিচয় দেন। যতীন্দ্রনাথের আর্তের দুঃখে সহানুভূতি এবং কর্তব্যনিষ্ঠা অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবকদের দৃষ্টান্ত হইয়া উঠিল। সেখানে কার্য সমাপ্ত হইলে তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। এই সময় একটি নিষিদ্ধ সভায় উপস্থিতির জন্য পুলিস কর্তৃক ধৃত হইয়া ৪ দিন কারাবাসের পরে তিনি মুক্তিলাভ করেন। অক্টোবর মাসে আইন অমান্য করার জন্য তাঁহার চারি মাস কারাদণ্ড হইল। ইহাই তাঁহার প্রথম কারাজীবনের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়।

কারাগার হইতে বাহির হইয়া যতীন্দ্রনাথ দেখিলেন যে বিগত চার মাসে দেশ এক নূতন পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে—সে পথ বিপ্লবী মনের প্রাচীন পথ নয়, সে মানুষকে আঘাত করিবার পথ নয়, আহত হইবার পথ;

অহিংসার পথ,—মার খাইবে, মারিবে না। পুলিশদের প্রাণের ভয় অনেকটা হ্রাস পাইল। কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলন অহিংস পথে চালিত হইল। সন্ত্রাসবাদের ধারা এই যে, ইহার গতি সমুদ্রের ঊর্মিমালার মত কখনও অবিশ্রান্ত উদ্দাম, কখনও বা মন্থর। গান্ধীজীর আগমনে সন্ত্রাসবাদের গতি অনেকটা শিথিল হইয়া পড়িলেও অন্তঃ-সলিলা ফল্গুর মত বিপ্লবের ক্ষীণধারা জাতির অন্তরের অন্তঃস্থলকে উদ্বেলিত করিতেছিল। যতীন্দ্রনাথের কর্মব্রত সেই যুগে বিপ্লবের সুদূরপ্রসারী গতিবেগ লাভ করে নাই। শান্ত-সমাহিতচিত্তে তিনি চিত্তরঞ্জনের পন্থানুবর্তনে পল্লীসংগঠনে মনোনিবেশ করিলেন।

১৯২২ সালে বিলাতী জিনিষ ব্যবহার বন্ধ করিবার জন্য স্বেচ্ছাসেবকগণ দোকানে হাটে, বাজারে ‘পিকেট’ করিতে লাগিল। যতীন্দ্রনাথ কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া বড়বাজারে বস্ত্রালয়ের সম্মুখে পিকেট করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই অপরাধে তাঁহার তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ড হয়। যতীন্দ্রনাথ কারাবাসে অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। কারাবাসান্তে অস্থিচর্মসার, অসুস্থ দেহ লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। পিতা তাঁহাকে গৃহে আশ্রয় দিলেন। যতীন্দ্রনাথ প্রায় দুই মাস চিকিৎসার পর সুস্থ হইলেন।

১৯২২ সালে অসহযোগ আন্দোলনের গতি মন্থর হইয়া গেল। চৌরিচৌরা হত্যার পর গান্ধীজী তাঁহার কর্মধারাকে হিমালয়ের মত বিরাট ভুল ( Himalayan

blunder) বলিয়া মন্তব্য করিলেন। বহু ছাত্র আবার লেখাপড়ার জন্য বিদ্যালয়ে প্রত্যাবর্তন করিল, যতীন্দ্রনাথও কলেজে যোগ দিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সৈন্যদলেও তিনি যোগদান করিয়াছিলেন।

১৯২৪ সালে যতীন্দ্রনাথ প্রথম বিভাগে আই, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বঙ্গবাসী কলেজে প্রবেশ করিলেন। সেই সময়ে তিনি দক্ষিণ কলিকাতা জেলা কংগ্রেস কমিটীর সহকারী সম্পাদক নির্বাচিত হইলেন। উত্তরবঙ্গ ভীষণ জলপ্লাবনে ভাসিয়া গেল। যতীন্দ্রনাথ সান্তাহারে বন্যাপীড়িতদের সেবার কার্যশেষে একটি স্থায়ী সেবাসমিতি প্রতিষ্ঠা করিলেন; উহার নামকরণ হইল তরুণ সমিতি,—সমিতির কার্য হইল দরিদ্র বিধবার সাহায্য, অসমর্থ ব্যক্তিদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা। এই সমিতি মুষ্টিভিক্ষা দ্বারা দুঃস্থের সাহায্যের ব্যবস্থা করিত। কি দুঃসাহস! একমাত্র সাহস ও সদিচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া তরুণ সমিতি এই বিরাট কার্যে অগ্রসর হইয়াছিল। এই সমিতির প্রাণ ছিলেন যতীন্দ্রনাথ। পুলিশ যতীন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তা এবং দেশসেবা সুদৃষ্টিতে দেখিতে পারে নাই।

এই সময় আবার বিপ্লবীদের কর্মধারা একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। সন্ত্রাসবাদের যে ক্ষীণধারা জাতির জীবনের অন্তঃস্থলে প্রবহমান ছিল, তাহা হঠাৎ একদিন স্রোতস্বতীর দুই কুল ভাসাইয়া আত্মপ্রকাশ করিল। ১৯২৩ সালে আবার সন্ত্রাসবাদ নূতন করিয়া দেখা দিল। ১৯২৭ সালে শাঁখারিটোলা ষড়-যন্ত্রের মামলা আরম্ভ হয়। বিপিন গাঙ্গুলী প্রভৃতি বহু কর্মী এই

মামলায় কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। ১৯২৪ সালে গোপীনাথ সাহা টেগার্ট সাহেবকে হত্যার চেষ্টা করিয়া ভুলক্রমে প্রকাশ্য দিবালোকে আর্নেষ্ট ডে-কে হত্যা করিলেন। গোপীনাথের ফাঁসীর আদেশ হইল। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত গোপীনাথ কানাই-লালের মত মৃত্যুকে জীবনের পরিপূর্ণতা মনে করিয়া সানন্দে মৃত্যুদণ্ড বরণ করিলেন। তাঁহার ওজন মৃত্যুর পূর্বে ৫ পাউণ্ড বৃদ্ধি পাইয়াছিল। অপূর্ব এই গোপীনাথের বিপ্লব প্রচেষ্টা। আবার গভর্ণমেণ্ট নূতন করিয়া বিপ্লব দমন আরম্ভ করিল।

১৯২৫ সালে বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স অনুসারে যতীন্দ্রনাথ বন্দী হইলেন ; তখন তিনি তরুণ সমিতির পরিচালক, দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস কমিটীর সহ-সম্পাদক এবং প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভ্য। যতীন্দ্রনাথকে প্রেসিডেন্সি জেল হইতে মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হইল। যতীন্দ্রনাথ হঠাৎ 'হিট্‌ষ্ট্রোক' অর্থাৎ সর্দিগর্মিতে আক্রান্ত হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে আনা হয়। সেখান হইতে তাঁহাকে ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলে লইয়া যাওয়া হয়।

১৯২৫ সালে দক্ষিণেশ্বর ষড়যন্ত্রের মামলা আরম্ভ হয়। এই মামলার ভারপ্রাপ্ত গোয়েন্দা পুলিসের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ভূপেন চাটার্জিকে হত্যা করা হইল। তখন যতীন্দ্রনাথ মৈমনসিংহ জেলে ; লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল ও'ব্রায়েন তাঁহাকে কথাবার্তার জন্য ডাকিয়া আনেন। যতীন্দ্রনাথ অপরাধী ছিলেন না, বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স অনুসারে তাঁহাকে সন্দেহ বশে

জেলে আবদ্ধ রাখা হইয়াছে। যতীন্দ্রনাথকে ও'ব্রায়েন সাহেব বসিতে না বলিয়া, আসন না দিয়া, সাধারণ শিষ্টতা প্রদর্শন না করিয়াই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। যতীন্দ্রনাথ সাহেবের কথাবার্তায় অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিলেন এবং সাহেবকে শিষ্টাচারের ক্রুটির জন্য ইঙ্গিত করিলেন। ও'ব্রায়েন সাহেব চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আমি তোমার বাবা, আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে থেকে কথা ব'লতে হবে—I am your father, you will stand before me and answer," বাপ তুলিয়া কথা বলায় যতীন্দ্রনাথ আহত সিংহের মত গর্জিয়া উঠিলেন,—"সাবধান ও'ব্রায়েন, ভদ্রলোকের মত কথা বল, নয়ত তোমার মস্তক চূর্ণ করে দেব—Take care, Mr. O'Brien, talk like a gentleman, or I shall break your head into pieces," তারপর বিতণ্ডা উচ্চস্তরে উঠিল; যতীন্দ্র ও'ব্রায়েন সাহেবকে জেলের মধ্যে আক্রমণ করিলেন।

ও'ব্রায়েন যতীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে এক মোকর্দমা আরম্ভ করিলেন। যতীন্দ্রনাথকে জেলের মধ্যে শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা হইল। যতীন্দ্রনাথ প্রতিবাদে অনশন আরম্ভ করিলেন। সমস্ত বাংলা দেশ তাঁহার অপমানে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। ২০ দিন অনশনের পর ও'ব্রায়েন যতীন্দ্রনাথের নিকট ক্রুটী স্বীকার করিয়া বলিলেন,—"আমি তোমার পিতার সমবয়সী, আমার সামনে দাঁড়াইতে বলিয়াছিলাম বটে, কিন্তু আমার সামনে দাঁড়াইতে তোমার কোন

আপত্তি হইবে না ভাবিয়াছিলাম। এই কথা বলাই আমার উদ্দেশ্য ছিল, তোমাকে অপমান করা উদ্দেশ্য ছিল না।" যতীন্দ্রনাথ ইহার পর পিতার ন্যায় বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিকে আক্রমণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। উভয় পক্ষের মনের গ্লানি দূর হইয়া গেল। ও'ব্রায়েন ছিলেন জাতিতে আইরিস।

অতঃপর যতীন্দ্রনাথকে বাংলার বাহিরে মিনওয়ালী জেলে পাঠান হয়। সেখানকার জলবায়ু তাঁহার সহ্য হইল না: তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। অসুস্থ অবস্থায় তিনি সংবাদ পাইলেন, তাঁহার ভগিনী গুরুতর পীড়িত। যতীন্দ্রনাথ ভগিনীকে দেখিবার প্রার্থনা করিলেন। এদিকে ভগিনীর সংবাদ পাইতেছেন না, কারণ জেলের চিঠিপত্র আসিতে অকারণ বিলম্ব হইত। তাঁহার অনুমতি প্রার্থনার কোন উত্তর আসিল না, যতীন্দ্রনাথ অস্থির হইয়া উঠিলেন। অনুরোধ-উপরোধে কোন ফল হইল না; শেষে যতীন্দ্রনাথ অনশন আরম্ভ করিলেন। ফলে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কলিকাতা যাইবার অনুমতি দিলেন। কিন্তু পুলিসের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া ভগিনীর শুশ্রূষা করিতে হইল। ভগিনী কিছু নীরোগ হইলে তাঁহাকে সুদূর চট্টগ্রামের এক নিভৃত পল্লীতে নির্বাসিত করা হইল। সেইখানে যাওয়ার কিছুদিন পরেই তাঁহার ভগিনীর মৃত্যু হয়। ভগিনীর মৃত্যুতে যতীন্দ্রনাথ অত্যন্ত শোকার্ত হইয়াছিলেন।

১৯২৮ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর যতীন্দ্রনাথ মুক্তিলাভ

করিলেন। তিন বৎসর আলিপুর, মেদিনীপুর, ঢাকা, মৈমনসিংহ, মিনওয়ালী, কলিকাতা, চট্টগ্রাম ঘুরিয়া তাঁহার স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু মনের বল অক্ষুণ্ণ ছিল; কর্মশক্তি কিছু মাত্র হ্রাস পায় নাই। তিন মাসের চেষ্টায় নষ্ট স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিয়া আবার তিনি কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। বিশ্রামের অবসর কোথায়? দুই মাসের মধ্যে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে। যতীন দাস, সুভাষ বসুর সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠনে মনোনিবেশ করিলেন। স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর জি, ও, সি সুভাষ বসুর অধীনে যতীন হইলেন মেজর যতীন দাস। আশ্চর্য এই যে, কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর মেজর হওয়া সত্ত্বেও একটি বারের জন্যও নিজের কর্তব্য ছাড়িয়া তিনি কংগ্রেসের সভামণ্ডপে প্রবেশ করেন নাই। একদিন কথাপ্রসঙ্গে যতীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন—"আমি কংগ্রেস দেখি নাই।" ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন,—"অনেক দরিদ্র ইচ্ছা থাকিলেও অর্থাভাবে কংগ্রেস দেখিতে পারিতেছে না; সুতরাং যাহারা কংগ্রেস কর্মী তাহাদের এই সুযোগ গ্রহণ করা উচিত নয়।"

যতীন্দ্রনাথ কংগ্রেসের কার্যের সঙ্গে সঙ্গে আবার বঙ্গবাসী কলেজে যোগ দিয়াছিলেন। সেই সময় দক্ষিণ কলিকাতার স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়করূপে কাজ করেন এবং কলিকাতা ন্যাশনাল স্কুলে বিনা বেতনে ব্যায়াম শিক্ষকের কাজ করেন। তাঁহার জীবন অতিবাহিত হইতেছিল

জেল ও কলেজের মধ্যে দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া। ১৯২০ হইতে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত তিনি চারিবার কারাবরণ করিয়াছেন—প্রথমবার ৪ দিন, শেষবার তিন বৎসর। দুইবার অনশন করিয়াছেন—প্রথমবার ২০ দিন, পরের বার ৪ দিন। ১৯২৮ সালে মুক্তিলাভ করিয়া তিনি নিরুপদ্রবে পড়াশুনা ও স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করিতে লাগিলেন।

১৯২৯ সালে সাইমন কমিশন লাহোরে উপস্থিত হইল। ৩০শে অক্টোবর লালা লাজপৎ রায় কমিশন বয়কটের নির্দেশ দিলেন ও হরতাল ঘোষণা করিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট হরতাল বন্ধ করিয়া দিল। মিষ্টার স্কট নামক জনৈক ইংরেজ পুলিশ কর্মচারীর অধীনে পুলিশ লাহোরে অবর্ণনীয় অত্যাচার করিল। লালা লাজপৎ রায় আহত হইলেন। তাঁহার বক্ষস্থলে গুরুতর আঘাত লাগে, এই আঘাতের ফলে ১৭ দিন পরে পাঞ্জাবকেশরী লালা লাজপৎ রায়ের মৃত্যু হয়। বিপ্লবীদল ক্রুদ্ধ হইয়া মিষ্টার স্কটকে হত্যা করিতে চেষ্টা করিল—কিন্তু ভুলক্রমে মিষ্টার সাণ্ডার্স নামক একজন পুলিশ কর্মচারীকে হত্যা করিল। এই হত্যা সম্বন্ধে পুলিশ বহু সন্ধান করিয়া হত্যাকারীকে ধরিতে পারিল না, কোন লোকই হত্যা ব্যাপারে কোন প্রকার সংবাদ দিল না। বিপ্লবীগণ "রক্ত পত্রিকা" প্রকাশ করিয়া অনুসন্ধানকারী পুলিশ ও জনসাধারণকে সাবধান করিয়া দিল। পাঞ্জাব পুলিশ বিভাগ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল।

সাণ্ডার্স হত্যার কয়েকদিন পরে ভারতীয় ব্যবস্থা

পরিষদে পাবলিক সেফ্‌টী বিল (জনসাধারণের নিরাপত্তা আইন) উপস্থিত করা হইল। উহার আলোচনার সময় বটুকেশ্বর দত্ত ও ভকৎ সিং সভাগৃহে বোমা নিক্ষেপ করেন। বিচারে তাঁহাদের যাবজ্জীন দ্বীপান্তর হয়। বিলের আর কোন আলোচনা হইল না। উহার পরিবর্তে বড়লাট অর্ডিন্যান্স প্রবর্তন করেন। এই অর্ডিন্যান্সের বলে নানাদিকে অনুসন্ধানের ফলে কয়েকজন যুবক পুলিসের হস্তে বন্দী হইল। ক্রমশঃ পুলিস একটি ব্যাপক ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করিল। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বটুকেশ্বর দত্ত, ভকৎ সিং প্রভৃতি তেইশ জন তরুণ ষড়যন্ত্রের মামলায় ধৃত হইলেন—সেই তেইশ জনের মধ্যে বাংলার যতীন্দ্রনাথ একজন।

১৯২৯ সাল, ১৪ই জুন—অভিযুক্ত তেইশ জনের মধ্যে সাত জন রাজসাক্ষীরূপে অনেকের নাম প্রকাশ করিতে বাধ্য হইল। যেদিন যতীন্দ্রনাথ বাংলায় গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন, সেই দিনই ভকৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্ত জেলে দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে অনশন আরম্ভ করিয়াছিলেন। ২৯ দিন পরে তাঁহাদের প্রতিবাদের সঙ্গে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া আরও ১১ জন অনশন আরম্ভ করিলেন—তাঁহাদের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ অন্যতম।

গ্রেপ্তারের পর যতীনকে লাহোর লইয়া আসা হয়। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কিরণ দাস তাঁহার জামিনের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু লাহোরের রাজকর্মচারীগণ জামিন দিল না। এই সময়ে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামীদের সঙ্গে জেল কর্তৃপক্ষ অতিশয় খারাপ ব্যবহার করিত। তাঁহাদিগকে অকথ্য

ভাষায় গালাগালি দিত। খাদ্য ছিল অত্যন্ত জঘন্য, নির্জন কক্ষে বাস, সব সময়ই প্রায় হাতকড়ির অলংকার। একদিন আদালতে যতীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রতি দুর্ব্যবহার সম্বন্ধে মৌখিক কয়েকটী অভিযোগ উপস্থিত করিলে, ম্যাজিষ্ট্রেট মৌখিক অভিযোগ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন এবং লিখিত অভিযোগ দাখিল করিতে বলেন। কিন্তু তখন তাঁহার হাতকড়ি লাগান ছিল। ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশে হাতকড়ি উন্মোচন করা হইল। যতীন্দ্রনাথ অভিযোগ লিখিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ পুনরায় তাঁহার হাতকড়ি লাগান হইল। অভিযোগান্তে যতীন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমি বিচারাধীন রাজনৈতিক আসামী, বাংলাদেশে রাজনৈতিক আসামীদের হাতকড়ি দেওয়ার নিয়ম নাই, এই বর্বরোচিত কার্য্য বিংশ শতাব্দীতে সম্ভব, ইহা আমার ধারণাতীত। আমি ভদ্রবংশের সন্তান, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র—আমি কোথাও পলাইব না।" তবু ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার হাতকড়ি খুলিবার অনুমতি দিলেন না।

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামীদের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ ছিল:—সাইমন কমিশনের ট্রেন ধ্বংসের চেষ্টা, কাকোরী মামলার আসামী শচীন সান্যাল ও জগদীশ চ্যাটার্জিকে কারাগার হইতে উদ্ধারের চেষ্টা, গোরক্ষপুর পোষ্টাফিসে ডাকাতি, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে ডাকাতি, সাহারণপুরে বোমার কারখানা স্থাপন; কাশীতে সি, আই, ডি ইন্‌স্পেক্টর মিঃ ব্যানার্জিকে হত্যার চেষ্টা, দিল্লীতে ব্যবস্থাপক সভায় বোমা নিক্ষেপ, সাণ্ডার্স হত্যা—অর্থাৎ ভারতীয় দণ্ডবিধির

প্রায় সমস্ত মারাত্মক ধারাগুলি অভিযোগের মধ্যে ছিল। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ দিল্লী, সাহারাণপুর, বেনারস, লাহোর প্রভৃতি কোন স্থানেই ঘটনার সময় উপস্থিত ছিলেন না ; এবং অনেকে ঘটনা ঘটিবার সময়ে ববং কারাপ্রাচীরের অভ্যন্তরে আবদ্ধ ছিলেন।

ভকৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত রাজনৈতিক আসামীর প্রতি সুব্যবহার দাবী করিয়া এবং ব্যক্তিগতভাবে কয়েকটি অভিযোগ করিয়া ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট এক আবেদন করেন। সেই দাবীগুলি ছিল :—রাজনৈতিক বন্দীদিগের জন্য ভাল খাদ্যের ব্যবস্থা, অপমানজনক কার্য ( যথা— মেথরের কাজ, বাসন মাজার কাজ ) করিতে বাধ্য না করা, চিঠিপত্র লিখিবার অধিকার, অন্ততঃ একখানি সংবাদপত্রের সরবরাহ, স্পেশাল ওয়ার্ডে অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে থাকিতে দেওয়া ইত্যাদি। এইসব দাবীর সঙ্গে সহানুভূতি জানাইয়া যতীন্দ্রনাথ ১৩ জুলাই অনশনব্রত আরম্ভ করেন। তিনি তখন নির্জন কারাবাসে দিন যাপন করিতেছিলেন। উপবাস করিয়াও বন্দীগণ যথারীতি আদালতে উপস্থিত হইতেছিলেন ; কিন্তু বার দিন পরে যতীন দাস আর আদালতে উপস্থিত হইতে পারিলেন না। এই ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী এলাহাবাদের যতীন সান্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানাইলেন, "যতীন্দ্রনাথকে বলপূর্বক খাওয়াইবার চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার অবস্থা অত্যন্ত শঙ্কাজনক হইয়া পড়িয়াছে। তিনি এখন মৃত্যুশয্যায়।

তাঁহার উপবাস ভঙ্গ করাইবার জন্য সাত আট জন লোক চেষ্টা করিয়াছিল। একজন লোক তাঁহার বুকের উপর চাপিয়া বসে, আর দুইজন লোক তাঁহার হাত পা চাপিয়া ধরে, দুইজন লোক দুইটি নল মুখে ও নাকে প্রবেশ করাইয়া দেয়। এইভাবে খাদ্য প্রবেশ করাইবার পর যতীন্দ্রনাথ সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন। ডাক্তার আসিয়া ইন্‌জেক্‌সন দেয় এবং ব্রাণ্ডি দেয়; ঔষধের জন্যই তিনি এখনও জীবিত।"

আসামী অজয় ঘোষ ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানাইলেন, "যদি যতীনের মৃত্যু হয় তবে আদালত এবং বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট দায়ী হবে। গত পরশু জোর করে যতীন্দ্রনাথকে আহার করাবার চেষ্টা করা হয়েছে। সে বাধা দিলে তাহারা বলে— সমুচিত শিক্ষা দেওয়া হবে। বোধ হয় সমুচিত শিক্ষা দেওয়াই হচ্ছে। আমি আদালতকে অনুরোধ করি যেন আসামীদের মরণাপন্ন বলে ঘোষণা করা হয়। যদি তাহা না করা হয় তবে কাল থেকে আমরাও আদালতে আসব না, আমাদের জোর করে আনতে হবে।"

ভারত গভর্ণমেণ্টের নির্দেশ অনুসারে তখন পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্ট একটী জেল তদন্ত কমিটী নিয়োগ করেন। জেল কমিটী ২রা সেপ্টেম্বর জেলের মধ্যে গিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, অনশনব্রতীদের দাবী পূর্ণ করা হইবে এবং অনশনব্রতীদের অনুরোধ করেন যেন তাঁহারা জেল কমিটীর সিদ্ধান্ত প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত অনশন স্থগিত রাখেন। তাঁহাদের

কথায় বিশ্বাস করিয়া অশনব্রতীগণ দুগ্ধ পান করিয়া উপবাস ভঙ্গ করেন। যতীন দাস তখন প্রায় অচেতন। ১৩ই জুলাই হইতে ২রা সেপ্টেম্বর ৫০ দিন উপবাস, তাঁহাকে সোডা মিশ্রিত দুধ পান করান হইল—তৎক্ষণাৎ উহা উদ্গারের সঙ্গে বাহির হইয়া গেল।

ভারত গভর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্রসচিব স্যার জেম্‌স ক্রেগ যতীন্দ্রনাথকে মুক্তি দেওয়ার সম্মতি দিলেন; কিন্তু পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্ট আত্মসম্মানে আঘাত লাগে ভাবিয়া আদেশ দিল যে, যদি কেহ যতীন্দ্রনাথের পক্ষে জামিনের দরখাস্ত করে তবে তাহাকে জামিন দেওয়া হইবে। যতীনের ভ্রাতা কিরণচন্দ্র জামিনের দরখাস্ত করিতে অস্বীকার করিলেন। কিরণ উত্তর দিলেন, "যদি মুক্তি দিতে হয় তবে বিনা সর্তে মুক্তি দিতে হইবে এবং সেই দিনই বেলা দুইটার পূর্বে—নচেৎ কিরণচন্দ্র ভ্রাতার জীবনের দায়িত্ব লইতে পারিবেন না।" পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্ট মহা সমস্যায় পড়িল। যতীন দাস জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে—যে কোন মুহূর্তে তাঁহার জীবনের অবসান হইতে পারে। যতীন্দ্রনাথ জেলের মধ্যে মারা যান, পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্ট তাহা চাহে না, অথচ বিনা জামিনে মুক্তি দিলে সম্মানে আঘাত লাগে; সুতরাং পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্ট এক কৌশল অবলম্বন করিল। কোন এক জগদীশচন্দ্রকে যতীন দাসের বন্ধু আখ্যা দিয়া তাহার দ্বারা যতীন্দ্রের জামীনের দরখাস্ত করান হইল।

বস্তুতঃ যতীনের জগদীশ বলিয়া কোন বন্ধু ছিল না।

ম্যাজিষ্ট্রেট ১০ হাজার টাকার জামিনে যতীন্দ্রের মুক্তির আদেশ দিলেন, কিন্তু কিরণ দাস জামিনের বিনিময়ে ভ্রাতার মুক্তি চাহিলেন না। অর্ধ-চেতন যতীন দাস জামিনের সর্তে মুক্তি প্রত্যাখ্যান করিলেন। ইহার পর সমস্ত আসামী আবার অনশন আরম্ভ করিলেন।

সারা দেশ আকুল আগ্রহে এই অনশন-যজ্ঞে জীবনাহুতির পরিণতি লক্ষ্য করিতে লাগিল। প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা, যে কখন জীবন-প্রদীপ নির্বাপিত হইয়া যাইবে। ইহার দুই দিন পরে নীরবে, যতীন্দ্রনাথের প্রাণ কারাগারের রুদ্ধ প্রাচীরের সীমা অতিক্রম করিয়া অসীমে মিলাইয়া গেল। ১৫ই সেপ্টেম্বর দাবাগ্নির মত যতীন্দ্রনাথের মৃত্যুর সংবাদ সমস্ত দেশে ছড়াইয়া পড়িল। অবশ্য যতীন্দ্রনাথের ভ্রাতা কিরণ দাসের হস্তে তাঁহার পুণ্য মৃতদেহ অর্পণ করিতে ব্রিটিশ আপত্তি করিতে সাহস করে নাই। পরের দিন কলিকাতায় শবদেহ বহন করিয়া একখানি ট্রেন আসিল। অগণিত জনসাধারণ হাওড়া ষ্টেশনে মৃতদেহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য উপস্থিত। এক অপূর্ব দৃশ্য! বাঙ্গালী, বিহারী, উড়িয়া, মাদ্রাজী, গুজরাটী, মাড়ওয়ারী সকলেই এই মৃত্যুঞ্জয়ী বীরের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইল।। সেই দিন পরাধীন জাতি অন্তরের শ্রদ্ধা ভিন্ন আর কি দিতে পারিত?

বিশেষ কোন ঘটনার প্রবাহে, সাময়িক উত্তেজনায় নিমজ্জমান ব্যক্তিকে উদ্ধারের জন্য প্রাণ দান করা খুব অসম্ভব নয়; অথবা প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড হইতে দগ্ধপ্রায়

শিশুকে রক্ষা করার জন্য আত্মদান করা অসম্ভব নয়। কিন্তু একটা আদর্শের জন্য প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর পথে অগ্রসর হওয়া অত্যন্ত দৃঢ়চিত্ততার দৃষ্টান্ত, বিশেষতঃ যেখানে মতের বা কার্যক্রমের একটু পরিবর্তন করিলেই প্রাণ রক্ষা করা যায়। এই শতাব্দীতে আইরিস বীর ম্যাক্সুইনী এই ভাবে জীবন দান করিয়া আয়রলণ্ডের স্বাধীনতা-যজ্ঞের শেষ আহুতি দান করিয়াছিলেন।

যতীন্দ্রনাথের আত্মদান দেখিয়া ইংরেজ রাজপুরুষগণ স্তম্ভিত হইলেন। যে জাতির মধ্যে বিপ্লববাদী এই প্রকার নিঃস্বার্থ, দৃঢ়চিত্ত, মৃত্যুভয়হীন ত্যাগী পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই জাতি অজেয়।

বিপ্লববাদ জাতির মর্মে, মর্মে অণু পরমাণুতে প্রবেশ করিয়াছে তাহা বুঝিতে ইংরেজের বিলম্ব হয় নাই। দেশের উত্তেজনাকে শান্ত করিবার জন্য ইংরেজ তখন রাজবন্দীদের অনেক সুবিধা দান করিল। ইংরেজ জাতি অনেক কাজই ভারতবাসীর মতানুসারে করিয়াছে, কিন্তু তাহা এত বিলম্বে করিয়াছে যে কার্যের মূল্য বহুভাবে হ্রাস হইয়া গিয়াছিল। ইংরেজ এই দেশে বিপ্লবকে নূতন পথে পরিচালিত করিতে পারিত যদি তাহাদের মনের ঔদার্য থাকিত, যদি তাহাদের দানের মধ্যেও একটা ব্যবসায়-বুদ্ধি না থাকিত। বাংলার গৌরব এই যে, যতীন্দ্রনাথ বাংলার বাহিরে সুদূর পাঞ্জাবের কারাগারে আত্মদান করিয়াছিলেন বলিয়া বাংলার বিপ্লবধারা সমস্ত ভারতবর্ষকে অনুপ্রাণিত করিল।

বাংলার সুদূর পূর্বপ্রান্তে নিভৃতে জন্ম। শৈশবে শিক্ষা-দীক্ষার মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্য ছিল না; যেমন দশজন বাঙ্গালীর ছেলের শিক্ষা হয়—"লেখাপড়া করে যেই, গাড়ীঘোড়া চড়ে সেই।" পারিপার্শ্বিক অবস্থাও ছিল অত্যন্ত সহজ। চট্টগ্রামে অনুশীলন সমিতির মত ব্যাপক কোন বিপ্লবী সমিতি গড়িয়া উঠে নাই, বঙ্গভঙ্গের আলোড়ন চট্টগ্রামকে খুব বেশী উদ্বেল করিয়া তুলে নাই; সুতরাং সূর্য সেন প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গেলেন বহরমপুর কলেজে পড়িতে। সেখানে তিনি দুই চারিজন বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন, কিন্তু তাঁহার কর্মধারা তখনও কোন সুনির্দিষ্ট ও সুচিন্তিত পথ গ্রহণ করে নাই। দেশে আসিয়া তিনি চট্টগ্রামে এক স্কুলে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। অত্যন্ত গতানুগতিক জীবন, যেমন সাধারণ স্কুল মাষ্টারদের হয়। চেহারার মধ্যে কোন

আকর্ষণের বস্তু নাই,—বিরল-কেশ মস্তিষ্ক, মঙ্গোলিয়ান নাসিকা, গোলাকার চক্ষু, রেখাঙ্কিত মুখমণ্ডল, খর্বকায়; কিন্তু অপূর্ব কণ্ঠস্বর! যে একবার সে কণ্ঠস্বরের আহ্বান শুনিয়াছে সেই গত্তময় জীবনের অন্তরালে যে অপরূপ প্রাণস্পর্শ রহিয়াছে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। তাঁহার সহজ সহানুভূতি, স্নেহপ্রবণ হৃদয়, আত্মসমাহিত ভাব, গভীর আত্মবিশ্বাস ছাত্রদের মুগ্ধ করিত, তাই ছাত্রদের নিকট তিনি ছিলেন 'মাষ্টারদা'। অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, অদ্ভুত প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং দেশের সেবাকার্যে সকল অন্তর দিয়া আত্মনিয়োগ জনসাধারণের নিকট সূর্য সেনকে করিয়া দিল দরদী বন্ধু।

১৯২৩ সালে চৌরিচৌরা হত্যাকাণ্ডের পর আবার সন্ত্রাসবাদ আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। গবর্ণমেণ্ট যেন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। দলে দলে লোক বিনা বিচারে বন্দী হইয়া কারাবাস করিতে লাগিল। যাঁহারা জনসাধারণের কাজে, সেবাব্রতে কিংবা স্বাস্থ্য চর্চায় একটু উৎসাহী তাঁহারাই গবর্ণমেণ্টের বিরাগভাজন—বিশেষতঃ স্কুল কলেজের ছাত্র এবং স্কুলের মাষ্টার। কিশোর দলের উপর স্কুল মাষ্টারদের প্রভাব স্বাভাবিকভাবে একটু বেশী; সুতরাং সরকার স্কুল মাষ্টারদের ব্যাপকভাবে কারারুদ্ধ করিতে লাগিল, সূর্য সেনও বন্দী হইলেন। তাঁহাকে প্রথমে মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলে, পরে সুদূর বোম্বাই প্রদেশের রত্নগিরি জেলে আবদ্ধ করা হয়। এই সময় তিনি বহু বিপ্লবীর সংস্পর্শে আসিলেন। কারাজীবনে অফুরন্ত অবসর, সেই সময়ে

তিনি নিজের কর্মধারা স্থির করিলেন। সকলেই জানিতেন কারাবাস হইতে মুক্তি একদিন আসিবেই; তখন কাজ আরম্ভ করা যাইবে।

১৯২৮ সালে মুক্তিলাভ করিয়া সূর্য সেন চট্টগ্রামে প্রত্যাবর্তন করিলেন। চট্টগ্রামই তাঁহার কর্মক্ষেত্র স্থির করিলেন। তিনি জানিতেন যে কংগ্রেসের প্রভাব দেশের লোকের উপর যথেষ্ট; কংগ্রেস ইংরাজ-বিরোধী প্রতিষ্ঠান। কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা অসম্ভব নয়; কিন্তু উহা করিতে হইলে যথেষ্ট সময় ও শক্তি নষ্ট হইবে। চট্টগ্রামের নেতা জে, এম, সেনের প্রভাবে চট্টগ্রামে কংগ্রেস জনপ্রিয় হইয়াছিল; সুতরাং কংগ্রেসের প্রতি জনসাধারণের সহজ মোহকে কাজে লাগাইতে হইবে। কংগ্রেস অহিংসাবাদী হইলেও বহুলোকে অহিংসাকে আদর্শরূপে গ্রহণ করে নাই; উহাকে প্রয়োজন বোধে একটা পথ বা উপায় বলিয়া গ্রহণ করিয়া লইয়াছিল;—উদ্দেশ্য ছিল ইংরাজ বিতাড়ন ও ভারতের স্বাধীনতা। সুতরাং সূর্য সেন স্থির করিলেন কংগ্রেসের মধ্য দিয়া ইংরাজ-বিদ্বেষ প্রচার করিবেন এবং কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে সন্ত্রাসবাদের ভিত্তিরূপে ব্যবহার করিবেন, কংগ্রেসের মধ্য দিয়া কর্মী সংগ্রহ করিবেন।

প্রথমেই তিনি স্বাস্থ্যচর্চার দিকে মনোনিবেশ করিলেন। স্বাস্থ্য চর্চার সুযোগ ছেলেদের আকর্ষণ করিতে লাগিল। কুস্তি, ডন, বৈঠক, সন্তরণ, প্যারালাল বার, রিং ইত্যাদি

খেলা সাধারণতঃ স্কুল কলেজের ছাত্রদের শরীরচর্চার অঙ্গ ছিল; সুতরাং এই শিক্ষার বিরুদ্ধে সরকারের কোন আপত্তি ছিল না। সূর্য সেন এই শরীর চর্চার অন্তরালে বিশিষ্ট ছাত্রদের জন্য পিস্তল, বন্দুক, তরবারী ছোড়া; বোমা তৈয়ারী শিক্ষার বন্দোবস্ত করিলেন। গোপন জিনিষের প্রতি সকল মানুষের একটা কৌতূহল ও আকর্ষণ আছে—তাহার উপর বন্দুক ও পিস্তল নিষিদ্ধ বস্তু; সুতরাং কিশোর ও যুবকদের বিশেষ করিয়া ঐ দুইটী জিনিষ খুব আকর্ষণ করিয়াছিল। ক্রমশঃ এই সমস্ত কিশোর ও যুবকদের মধ্য দিয়া সূর্য সেনের কর্মধারা বহু স্থানে ছড়াইয়া পড়িল। গ্রামে গ্রামে স্বাস্থ্যচর্চার আখড়া গড়িয়া উঠিল। সূর্য সেন তাঁহার বিশেষ বিশ্বস্ত শিষ্যদের সঙ্গে তাঁহার আদর্শ, উদ্দেশ্য এবং কর্মধারার আলোচনা করিতেন। সূর্য সেন তখন জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক।

১৯২৯ সালের মে মাসে সূর্য সেন জেলা কংগ্রেস কর্মীদের এক সম্মেলন আহ্বান করেন। সেই সম্মেলনে তাঁহার শিষ্যগণ এমন সুন্দর শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা প্রদর্শন করে যে ইউরোপীয়গণও বাঙ্গালী স্বেচ্ছাসেবকদের সামরিক বলিয়া ভুল করিয়াছিল। তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব গবর্ণমেন্টের নিকট এই সম্মেলনের সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ বিবরণ প্রেরণ করেন, তাহাতে সূর্য সেনের অনেক প্রশংসার কথা ছিল। সূর্য সেন অনুচরদের নিপুণতা দেখিয়া তাঁহার বিশিষ্ট শিষ্যদের সঙ্গে গুপ্তমন্ত্রণা করেন এবং কংগ্রেসের

অহিংস নীতির অন্তরালে দেশকে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন।

সূর্য সেন তারপর বাংলাদেশের বিভিন্ন গুপ্তসমিতির সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেন; কিন্তু গান্ধীজীর অহিংস নীতি তখনও দেশকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। তিনি সশস্ত্র বিপ্লবের বিশেষ উৎসাহ পাইলেন না; কিন্তু তিনি নিশ্চেষ্ট রহিলেন না। তাঁহার সহকর্মী তারকেশ্বর দস্তিদার, অনন্ত সিং, অম্বিকা চক্রবর্তী, লোকনাথ বল, গণেশ ঘোষ প্রভৃতির সঙ্গে আলোচনা করিয়া চট্টগ্রামকে কেন্দ্র করিয়া বিপ্লব আরম্ভের সিদ্ধান্ত করেন।

এই সময়ে ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতাই ভারতের কাম্য বলিয়া ঘোষণা করা হয়। কংগ্রেসের এই ঘোষণা চট্টগ্রামের বিপ্লবীদলকে খুব প্রেরণা দিয়াছিল। তাঁহারা ভাবিলেন যে কংগ্রেস যখন প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতার আদর্শ ঘোষণা করিয়াছে, ভারতের সকল প্রদেশেই এই আদর্শ অনুযায়ী কাজ আরম্ভ হইবে। অগ্নির উপকরণ প্রস্তুত; ইন্ধনের প্রয়োজন। চট্টগ্রামে বিপ্লবী-দল এই ইন্ধনের জন্য আহুতি প্রস্তুত করিতে লাগিলেন।

লাহোর কংগ্রেসের কয়েকদিন পরেই সূর্য সেন তাঁহার কর্মীদের সঙ্গে স্বাধীনতা-সংগ্রামের কর্মসূচী স্থির করিলেন। ইতিমধ্যে গান্ধীজী তাঁহার লবণ সত্যাগ্রহের সিদ্ধান্ত লর্ড আরউইনের নিকট বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন; দেশবাসী চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। সূর্য সেন এই আন্দোলন ও মানসিক

পরিস্থিতির সুযোগ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। গান্ধীজী ৬ই এপ্রিল ডাণ্ডি অভিযান আরম্ভ করিলেন। প্রতিদিন সংবাদপত্রে চাঞ্চল্যকর ঘটনা প্রকাশিত হইতে লাগিল।

ইহার ১২ দিন পরে ১৮ই এপ্রিল রাত্রি ১০টা ১৫ মিনিটের সময় সূর্য সেনের অধীনে বিপ্লবীদল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণ করিলেন। এই আক্রমণ অত্যন্ত সুচিন্তিত ও সুব্যবস্থিত ছিল। মাণিকতলা "বোমার কারখানা" আবিষ্কার করার পর বারীন্দ্র ঘোষ যেভাবে 'বাল্যশিক্ষার ভাল ছেলে রামের মত' "সুবোধ সুশীল বালক" হইয়া দাঁড়াইলেন; তাঁহার মধ্যে পাই ভাব-প্রবণ চিত্তের প্রমাণ; যতীন্দ্রনাথ বালেশ্বরে বাধা হইয়া আত্মরক্ষার জন্য যেভাবে শত্রুকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাঁহার মধ্যে পাই পৌরুষের প্রমাণ; সূর্য সেনের দল চট্টগ্রামে যে কাজ করিয়াছেন তাহা সত্যই বিস্ময়কর! ইহার মধ্যে ভীরুতা নাই, দুর্বলতা নাই—আছে প্রাণপণ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতবর্ষের কোন অসামরিক দল এইরূপ ভাবে ব্রিটিশ শক্তিকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে আহ্বান করে নাই—রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নিশান উড়াইয়া দেয় নাই; অথচ তিনি জানিতেন যে এই বিদ্রোহের পরিণাম অত্যাচার, অনাচার, কারাবাস—মৃত্যু। মানসিক বিচারে এই সশস্ত্র বিদ্রোহ নিষ্ক্রিয় আন্দোলনের সক্রিয় প্রতিবাদ, সে প্রতিবাদ জ্ঞানতঃই হউক অথবা অজ্ঞানতঃই হউক।

কিছুকাল ধরিয়া বিপ্লবীগণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন

যে এই বিপ্লব প্রচেষ্টার ফলে সরকার পক্ষে মৃতের সংখ্যা গণনায় ইংরেজ অপেক্ষা ভারতবাসীই বেশী এবং যে সমস্ত ভারতীয় পরিবারের একটি লোক বিপ্লবীর গুলিতে আহত বা মৃত হয় সেই পরিবার বিপ্লবীদের শত্রু হইয়া উঠে; অথচ তাহার স্থান অপূর্ণ থাকে না। রক্তবীজের মত নূতন নূতন ভারতবাসী আসিয়া ইংরাজের সাম্রাজ্যভার বহন করে। কিছুকাল হইতে তরুণদলের মনে একটা ব্যর্থতার ভাব আসিয়া পড়িয়াছিল। তারপর গান্ধীজী দশ বৎসর পর্যন্ত "স্বরাজকে তাঁহার চক্ষের উপর ভাসিতেছে" ( Swaraj is floating before my eyes ) দেখিতেছিলেন; কিন্তু সাধারণের চর্মচক্ষে এ স্বরাজ মরীচিকার মত প্রতিদিন দূরে সরিয়া যাইতেছিল। সুতরাং চট্টগ্রামের দল স্থির করিলেন যে তাঁহারা ব্রিটিশকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে আহ্বান করিবেন, ভারতবাসীর মনের জড়তা নষ্ট করিয়া দিবেন; দেশবাসীকে সচেতন করিয়া দিবেন—দেশের বিপ্লবী সন্তান মরিয়াও মরে নাই, স্বাধীনতার সংগ্রাম-শিখা নির্বাণহীন দীপের মত জ্বালাইয়া রাখিতে হইবে, অনাগত মুক্তিকামী সেনাবাহিনীর জন্য চট্টগ্রামে পদচিহ্ন রাখিয়া যাইতে হইবে। সে ভার গ্রহণ করিবে ভারতীয় রিপাব্লিকান আর্মি—চট্টগ্রাম শাখা।

১৯৩০ সাল ১৮ই এপ্রিল, গান্ধীজীর সত্যাগ্রহের পক্ষকাল অতিক্রম করে নাই। যুগপৎ আক্রমণ করা হইল—পুলিস-ব্যারাক, অস্ত্রাগার এবং টেলিগ্রাফ অফিস। পুলিস-ব্যারাক আক্রমণ দ্বারা রাজশক্তি বিহ্বল হইয়া যাইবে, অস্ত্রাগারে

বিপ্লবীরা অস্ত্র সাহায্য পাইবেন ; কারণ শহর আক্রমণ করিতে হইলে প্রচুর অস্ত্রের প্রয়োজন ; টেলিগ্রাফ অফিস হস্তগত করিয়া সংবাদ আদান-প্রদান বন্ধ করিয়া ধুম ষ্টেসনের নিকট রেল লাইন উঠাইয়া দিয়া বিপ্লবীগণ সৈন্য আমদানি বন্ধ করিয়া দিলেন। অস্ত্রাগারে বাধা দিতে চেষ্টা করিলে মেজর ফেরল সাহেবকে নিহত করা হইল, পুলিস ও প্রহরী দুইজনের মৃত্যু হইল। ১০ মিনিটের মধ্যে অস্ত্রাগার ও পুলিস-ব্যারাক বিদ্রোহীদের অধিকারে আসিল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ঘটনাস্থলে আসিয়া পড়িলেন, তাঁহাকেও গুলি করা হইল, তিনি পলাইয়া কর্ণফুলি নদীর তীরে জেঠীর দিকে আশ্রয় লইলেন। সেখান হইতে ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশে জেঠীর অস্ত্র দ্বারা পুলিস ও সৈন্যদল বিদ্রোহীদের আক্রমণ করিল। বিপ্লবীরা অস্ত্রাগারের সম্মুখের পাহাড়ের উপর হইতে আক্রমণ করিয়া পুলিশদের তাড়াইয়া দিলেন, অস্ত্রাগার ও ব্যারাকের বহু অস্ত্র লইয়া একদল বিপ্লবী চলিয়া গেলেন, আর একদল পেট্রোল ঢালিয়া অস্ত্রাগারে আগুন লাগাইয়া অবশিষ্ট অস্ত্রগুলি পুড়াইয়া দিলেন।

আগুন ধরাইবার সময় হিমাংশু সেনের গায়ে আগুন লাগে। মুমূর্ষু হিমাংশুকে লইয়া অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল শহরে চিকিৎসার জন্য আসিলেন। ৭২ ঘণ্টার মধ্যেই হিমাংশুর মৃত্যু হয়। অন্যান্য বিপ্লবীগণ পাহাড়ের দিকে চলিয়া গেলেন, কারণ অভীষ্ট কাজ অর্থাৎ সমগ্র চট্টগ্রাম শহর অধিকার তখনও বাকী—শহর আক্রমণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এদিকে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সংবাদে সমস্ত ভারতবর্ষ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে ; ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত সচেতন হইয়া উঠিল। চট্টগ্রামে বহু সৈন্য আমদানী করা হইল। সমস্ত পাহাড়ে বিপ্লবীদের অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। চারিদিন পরে ২২শে এপ্রিল বিকালবেলা জালালাবাদ পাহাড়ে বিপ্লবীদের সহিত সশস্ত্র ব্রিটিশবাহিনীর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাত্রির আগমন পর্যন্ত এই সংগ্রাম চলিয়াছিল। অন্ধকার একটু ঘনাইয়া আসিলে ব্রিটিশ সৈন্য পশ্চাৎ অপসারণ করিয়া পলায়ন করে।

এই যুদ্ধে বিপ্লবীদলের ১১ জনের মৃত্যু হয় এবং ৪ জন আহত হয়। আহত অবস্থায় অর্ধেন্দু দস্তিদার ধরা পড়েন এবং কয়েকদিন পরে তাঁহার মৃত্যু হয়। গবর্ণমেণ্ট পক্ষে মারা যায় ৬২ জন—চার্লস টেগার্ট এই কথা সমর্থন করিয়াছেন।

ইহার পর সূর্য সেন স্থির করিলেন এই বিরামহীন সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে হইবে গেরিলা রণনীতি অনুসরণে। সুতরাং সমস্ত বিপ্লবীদের নিরাপদ স্থানে পাহাড়ের ভিতর আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া তিনি শহরের বিপ্লবীদের সংগে যোগস্থাপনের জন্য চেষ্টা করেন। এদিকে ২৬শে এপ্রিল অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল, আনন্দ গুপ্ত পায়ে হাঁটিয়া ফেনী ষ্টেশনে উপস্থিত হন। পুলিশ তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে চেষ্টা করে ; তাঁহারা পুলিশকে গুলি করিয়া পলাইয়া যান।

২৪শে এপ্রিল সূর্য সেনের প্রেরিত স্কাউট অমরেন্দ্র নন্দীর সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়, তিনি দোতালা হইতে লাফাইয়া

পড়িয়া রাস্তায় কালভার্টের নীচে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখান হইতে প্রায় এক ঘণ্টাকাল একটী রিভলভারের সাহায্যে তিনি পুলিশদের বাধা দেন। তিনজন পুলিশ আহত ও একজন নিহত হয়। তারপর গুলি ফুরাইয়া গেলে পুলিশবীরগণ তাঁহাকে রাইফেলের গুলিতে হত্যা করে।

এই ঘটনার বার দিন পর ৬ই মে, বিদ্রোহীরা আবার ইউরোপীয়ান কোয়ার্টার্স আক্রমণ করিবার জন্য শহরে উপস্থিত হন। অথচ তখন চট্টগ্রাম শহরে সান্ধ্য আইন চলিতেছে, সহর মিলিটারীর অধীনে, শহরে অবাধ খানা-তল্লাসী, গ্রেপ্তার, অত্যাচার চলিতেছে। কি সাংঘাতিক সাহস এই বিপ্লবীদের! নিশ্চিত বিপদ জানিয়াও তাঁহারা ইউরোপীয়ান কোয়ার্টার্সের দিকে অগ্রসর হইলেন। পথে মুসলমান গুণ্ডারা তাঁহাদের আক্রমণ করিল, কারণ ইতিপূর্বে অনেক সময় বিপ্লবীদলের ছেলেরা গুণ্ডাদের শাস্তি দিয়াছে। পুলিশ গুণ্ডাদের সাহায্য চাহিল; ফলে গুণ্ডারা কালারপোল নামক স্থানে বিপ্লবীদলকে ঘিরিয়া ফেলিল; এই সময়ের মধ্যে পুলিশ আসিয়া পড়ে। রজত সেন প্রভৃতি চারিজন বিপ্লবী নিহত হইলেন—সুবোধ ও ফণী গুরুতর রূপে আহত হইয়া ধরা পড়েন। ২ জন পুলিশ ও ১ জন গুণ্ডা আহত হয়। ৪ জন গুণ্ডা নিহত হয়।

পুলিশ অনন্ত সিংকে না পাইয়া তাঁহার পিতা দেবীপ্রসাদ এবং রজত সেনের বাবাকে গ্রেপ্তার করে এবং সঙ্গে সঙ্গে চট্টগ্রামের বহু কিশোর ও যুবক ছাত্রদের গ্রেপ্তার করিল।

তাহাদের উপর অকথ্য অত্যাচার চলিল, ধৃত ছেলেদের মধ্যে কেহ অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া, কেহ বা প্রলোভনের জন্য রাজসাক্ষী হইতে স্বীকার করিল। প্রতিদিন নূতন নূতন বিপ্লবী ধরা পড়িতে লাগিল— বহু গুপ্ত সংবাদ পুলিসের হস্তগত হইতে লাগিল, ফলে বিপ্লবী প্রচেষ্টা পঙ্গু হইতে বসিল। অনন্ত সিং ভাবিলেন যে এই রাজ-সাক্ষীদের ও পুলিশদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিতে হইলে তাঁহার নিজের জেলখানায় উপস্থিত থাকা প্রয়োজন। সুতরাং আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া জেল-খানায় যাইতে হইবে। তিনি অকস্মাৎ পুলিশের কাছে আত্ম-সমর্পণ করিলেন। এই ব্যাপারের পর ফাঁসী পর্যন্ত হইতে পারে তিনি জানিতেন। তবু তাঁহাকে এই ভীষণ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইল। আপাততঃ অনন্ত সিংএর উপস্থিতিতে সমস্ত জেলখানার আবহাওয়া পরিবর্তিত হইয়া গেল, রাজসাক্ষীদের মতি পরিবর্তিত হইল। অনন্ত সিং ও অন্যান্য আসামীদের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামে স্পেশাল ট্রাইবুনালে বিচার আরম্ভ হইল।

১লা সেপ্টেম্বর চন্দননগরে পুলিস একটি বাড়ী অবরোধ করিল। আবার খণ্ডযুদ্ধ—জীবন ঘোষাল নিহত হইলেন। লোকনাথ, গণেশ, আনন্দ ধরা পড়িলেন; পুলিশের পক্ষে কতজন নিহত হইল জানা যায় নাই।

অম্বিকা চক্রবর্তী অসুস্থ অবস্থায় ধরা পড়িয়া সিউড়ী জেলে স্থানান্তরিত হইলেন, এদিকে সূর্য সেন অপূর্ব বুদ্ধি-মত্তার সঙ্গে জেলখানার আসামীদের সহিত যোগসূত্র স্থাপন করিলেন।

ডিসেম্বর মাসে ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল সাহেবকে চট্টগ্রামে আসিবার পথে চাঁদপুরে রেলগাড়ীতে হত্যা করার চেষ্টা হয়, কিন্তু তিনি সৌভাগ্যবশতঃ কামরায় ছিলেন না, তাঁহার স্থলে ইন্‌স্পেক্টর তারিণী মুখার্জী নিহত হন; আসামী রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসী হইল; কালীপদর দ্বীপান্তর হইল।

৪ মাসের মধ্যে সূর্য সেন এক ভীষণ ষড়যন্ত্র করিলেন— সমস্ত জেলখানা ডিনামাইট দিয়া উড়াইয়া দিতে হইবে—সেই উদ্দেশ্যে অস্ত্রশস্ত্র, বিজলী তার, বিস্ফোরক সামগ্রী আনা হইল, প্রাচীরের পার্শ্বে ডিনামাইট বসান হইল, বিদ্রোহীরা কাছারী-দালানের পার্শ্বে এবং শহরের বিভিন্ন স্থানে ডিনামাইট এবং বোমা স্থাপন করিলেন। জুন মাসেই শৈলেশ রায় প্রভৃতি কয়েকজন জেলখানার পার্শ্বে ধরা পড়িয়া গেলেন। জেলখানায় খানাতল্লাসী করিয়া বহু মারাত্মক অস্ত্র, বোমা, বিজলী তার আবিষ্কৃত হইল; শহরের মধ্যে স্থাপিত ডিনামাইট পাওয়া গেল। ইংরেজগণ এই ষড়যন্ত্র ও আয়োজনের ব্যাপকতা ও গভীরতায় এতদূর সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল যে তাহারা স্ত্রী-পুত্র কর্ণফুলিতে জাহাজে রাখিয়া আসিত এবং নিজেরা দেহরক্ষী বেষ্টিত হইয়া পথঘাটে চলাচল করিত। নদীতে ষ্টীমারের সঙ্গে অফিসের টেলিফোন যোগ করিয়া প্রতি আধ ঘণ্টা অন্তর পরস্পরের কুশলবার্তা আদান-প্রদান করিত।

এদিকে ডিনামাইট ষড়যন্ত্রের মামলা আরম্ভ হইল। অনন্ত সিংএর সঙ্গে জেলে সরকারের সহিত ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে একটা আপোষ মীমাংসার কথা হয়। ব্রিটীশ

জাতি সিংহ বটে, কিন্তু আর একটী সিংহ দেখিলে বিবাদ না করিয়া আপোষ করিতে চেষ্টা করে ; দুর্বল শত্রু হইলে টুঁটি টিপিয়া ধরে। চট্টগ্রামের বিদ্রোহীদলের কার্যকলাপের গভীরতা ও ব্যাপকতা দেখিয়া তাহারা আপোষ করিল। ব্রিটীশ রাজপুরুষদের দাবী হইল আসামীরা দোষ স্বীকার করিবে ; অনন্ত সিংয়েব সর্ত হইল আসামীদের লঘু শাস্তি হইবে। বিচাবের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইলে সকলে দেখিল তিনজনের তিন বৎসব কাবাদণ্ড, আব পাঁচজনেব তিন মাস হইতে ছয়মাস শাস্তি। সকলেই আশ্চর্য হইয়া গেল !

এই সময় চট্টগ্রামে আহ্‌সানউল্লা নামে একজন মুসলমান পুলিস ইনস্পেক্টর জনসাধারণের উপর ভীষণ অত্যাচার করিতেছিল। বিশেষতঃ হিন্দু মহিলাদেব উপবই তাহার খর দৃষ্টি ; সুতরাং ফুটবল খেলাব মাঠে তাহাকে হত্যা করা হয়। হবিপদ ভট্টাচার্য নামক ১৪ বৎসবেব বালককে মৃতদেহের পার্শ্বেই গ্রেপ্তাব করা হয়। কিন্তু জুরীব সিদ্ধান্ত হইল "হবিপদ নির্দোষ"। জজ জুরীদেব মত গ্রহণ না করিয়া হাইকোর্টে মতের জন্য পাঠাইয়া দেন। হবিপদব যাবজ্জীবন কাবাদণ্ড হয়।

১৯৩২ সালে ১লা মার্চ অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলাব বিচার শেষ হইল। ১৬ জন নির্দোষ। অনন্ত সিং, লোকনাথ বল, গণেশ ঘোষ প্রভৃতি ১২ জনের দ্বীপান্তব ও অন্যান্যদের ৩ হইতে ৫ বৎসব কারাদণ্ড।

সূর্য সেন তখনও পলাতক। চট্টগ্রামের সমস্ত গ্রামেই

পুলিস—সূর্য সেনকে ধরিতেই হইবে ; নচেৎ ব্রিটিশের মান-ইজ্জৎ যায়। সূর্য সেন অথবা সূর্য সেন নামের কোন লোকই পুলিসের শ্যেনদৃষ্টি হইতে নিষ্কৃতি পাইত না। পটীয়া গ্রামে সূর্য সেন নামে একজন মাষ্টার ছিলেন। রাত্রি শেষ হওযার পূর্বেই ২০০ পুলিশ সূর্য সেন মহাশয়ের বাড়ী ঘিরিয়া ফেলিল। প্রত্যুষে পুলিশ দেখিয়া ভদ্রলোক ঘর হইতে বাহির হইলেন। পুলিশ জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার নাম ?"

উত্তর—"সূর্য সেন।"

প্রশ্ন—"কি করেন ?"

উত্তর—"স্কুলের মাষ্টার।"

অমনি পলাসীর যুদ্ধ জয় করা হইযা গেল। মাষ্টার সূর্য সেন ধরা পড়িলেন। চট্টগ্রাম শহরে টেলিগ্রাম গেল—সূর্য সেন ধরা পড়িয়াছে। শহর হইতে ডিটেক্‌টিভ আসিল। সূর্য সেনের ফটো আসিল, সনাক্ত করার লোক গেল। আধ ঘণ্টার একটু পরেই পুলিশের মুখ শুকাইয়া গেল। এই সূর্য সেন পটীয়া স্কুলের শিক্ষক সূর্য সেন, পলাতক আসামী সূর্য সেন নয়।

১৯৩২ সালের জুন মাসে সূর্য সেন ধলঘাট গ্রামে ছিলেন। সেখানে সৈন্যদের সঙ্গে তাঁহার সংঘর্ষ হয়। বিদ্রোহী নির্মল সেন ও অপূর্ব সেন নিহত হন, ক্যাপ্‌টেন ক্যামারণও নিহত হন। সূর্য সেনের আশ্রয়দাত্রী ও তাঁহার ছেলের কারাদণ্ড হয়।

চট্টগ্রামের প্রত্যেকটি যুবক ও ছাত্র তখন পুলিশের সন্দেহভাজন, সুতরাং এবার মেয়েদের মধ্য দিয়া বিপ্লব ও বিদ্রোহের কাজ করার ব্যবস্থা হইল। সূর্য সেন মেয়েদের

রাজনৈতিক আবর্তের মধ্যে স্থান দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না ; কিন্তু কাজের সুবিধার জন্য অতি অল্পসংখ্যক মেয়েদের সাহায্য গ্রহণ করিতে তিনি বাধ্য হন। ইঁহাদের মধ্যে প্রীতি ওয়াদ্দেদাব এবং কল্পনা দত্তের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাহার পূর্বেও বাঙ্গালী মেয়ে সুনীতি চৌধুরী ও শান্তি ঘোষ প্রভৃতি বিপ্লবের কাজে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন।

নির্মল সেনেব মৃত্যুর পব কয়েকজন যুবক পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করিলেন। মিসেস সুলডিয়ান নিহত হন এবং আবও তের জন আহত হন। পুলিশ ঘটনাস্থলে আসিয়াই চতুর্দিক ঘিরিয়া ফেলিল। একজন বিদ্রোহীকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল ; বাত্রিশেষে তাঁহাব মৃতদেহ সনাক্ত করা হইল একটী পুরুষবেশী নারী—নাম প্রীতি ওয়াদ্দেদার ; মৃত্যুর কাবণ পটাসিয়াম সাইনাইড। তাঁহার জামাব পকেটে পাওয়া গেল—১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিলেব বিদ্রোহ ঘোষণার স্মারকলিপি, এবং ভবিষ্যতের কর্মসূচি। যতদিন ভারতবর্ষ পবাধীন থাকিবে ততদিন এই যুদ্ধ চলিবে।

পুলিশেব আবার বিশ্বাস হইল সূর্য সেন নিশ্চয় চট্টগ্রামে আছেন। তাঁহাকে ধবিবার জন্য ১০০০০৲ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছিল। ৮০ জনকে পাহাড়তলী আক্রমণের জন্য গ্রেপ্তাব কবা হইল। অম্বিকা চক্রবর্তী ও অন্য দুইজনের বিরুদ্ধে অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অপরাধের বিচার হইল, অম্বিকা চক্রবর্তীর ফাঁসী এবং একজনেব দ্বীপান্তর হয়।

সূর্য সেনকে ধরিবার জন্য পুলিশ বহুসংখ্যক গুপ্তচর নিযুক্ত করিল ; জলের মত অর্থব্যয় হইতে লাগিল। অন্যদিকে পুলিসের সম্মুখেই সূর্য সেন রহিয়াছেন। চট্টগ্রামের লোক সূর্য সেনকে রক্ষা করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছিল। হয়ত বাড়ীর এক ভাই গুপ্তচর—অন্য ভাই সূর্য সেনকে তাহার ঘরে

আশ্রয় দিয়াছে। ধনী, মধ্যবিত্ত, দবিদ্র সকলেই সূর্য সেনকে রক্ষা কবিতে পারিলে যেন সমস্ত বাংলা দেশকে বক্ষা করা হইবে মনে কবিত। কত বিপদেব মধ্যেও সামান্য গৃহস্থ সূর্য সেনকে বক্ষা কবিযাছে। এই পলাতক যুগের কাহিনী এক অপূর্ব বোমাঞ্চকব জীবন্ত উপন্যাস। এই সময়েও তিনি নূতন শিষ্য সংগ্রহ কবিয়াছেন, তাহাদেব শিক্ষা দিয়াছেন। Don Brean এর My Fight for Irish Freedom পড়াইযাছেন, গবিলা যুদ্ধেব বণনীতি আলোচনা করিয়াছেন। তিনি দেশেব স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিতে সব সময়েই প্রস্তুত ছিলেন, তবে বিনা প্রয়োজনে মাত্র একটা কাল্পনিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রাণ দিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। একটা প্রাণ বিসর্জন করাব পূর্বে তিনি বিশেষভাবে আলোচনা কবিতেন এই প্রাণেব মূল্যস্বরূপ সংগ্রাম কতদূব অগ্রসর হইবে, জনসাধাবণেব মনে এই আত্মদানের ফলে আত্মবিশ্বাস কতটুকু জন্মিবে এব. কর্মচেষ্টার গতি কতদূব অগ্রসব হইবে। পলাতক জীবনে সেই ভীষণ বাধা-বিঘ্ন এবং পুলিশেব শ্যেন দৃষ্টি অতিক্রম কবিয়া নূতন সংগঠন কবার মধ্যে যে আত্মবিশ্বাস ও সাহসের প্রয়োজন তাহা সূর্য সেনেব ছিল।

১৯৩৩ সালেব ফেব্রুয়ারী মাস। সূর্য সেন তাঁহার কয়েকজন পলাতক সহকর্মীব সঙ্গে গৈরালা গ্রামে অবস্থান করিতেছেন; সঙ্গে ব্রজেন সেন, শান্তি চক্রবর্তী, কল্পনা দত্ত ও আবও কয়েকজন। তাঁহাবা অন্য গ্রামে যাইতেছিলেন, এমন সময় দেখিলেন সমস্ত গ্রাম পুলিশ ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। নেত্র সেন নামক এক ভদ্রলোক পুলিশকে খবর দিয়াছে। তাঁহাদিগকে দেখিয়া পুলিস রাইফেল চালাইল। একটি সঙ্গী

গুলির আঘাতে মাটিতে পড়িয়া গেল। সূর্য সেন একটু অসুস্থ ছিলেন। তিনি একটী ঘন ঝোপের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কল্পনা দত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। এমন সময় এক গুর্খা পুলিশ আসিয়া তাঁহাকে পশ্চাৎ দিক হইতে জড়াইয়া ধরিল। অন্যান্য সঙ্গীগণ পুলিশের চোখে ধূলি দিয়া নিরুদ্দেশ হইলেন।

সূর্য সেন চলিয়াছেন চট্টগ্রামের দিকে; সঙ্গে আসামী ব্রজেন সেন। দুই পার্শ্বে বহু সশস্ত্র সৈন্য ও পুলিশ। প্রথমে ব্রিটীশ সৈন্য, তারপর হিন্দুস্থানী পুলিশ, সর্বশেষ পার্শ্বে গুর্খা। ইংরেজ সূর্য সেনের ছায়ার নিকট হইতে বহুদূরে—কে জানে হয়ত বা পথের ধুলা হইতে সূর্য সেন পিস্তল তৈয়ার করিয়া গুলি করিতে পারে। পথের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সেদিন চট্টগ্রামের নরনারী নীরবে অশ্রুপাত করিয়াছিল, আর ব্রিটিশকে অভিসম্পাত করিয়াছিল—অসহায়ের সহায় ভগবানকে ডাকিয়াছিল।

সূর্য সেন ধরা পড়িলেও অনেক বিদ্রোহী তখনও বিপ্লবের কাজ চালাইতেছিলেন। মে মাসের মাঝামাঝি এক গ্রামে পূর্ণ তালুকদারের বাড়ীতে তারকেশ্বর দস্তিদার এবং কল্পনা দত্তকে পুলিশদল ঘিরিয়া ফেলিল। দুই পক্ষেই গুলি চলিল—নিরস্ত্র তালুকদার ও তাঁহার ভাই নিরপরাধ শশী পুলিসের গুলিতে নিহত হইলেন। তাঁহাদের সঙ্গে ধরা পড়িল ১৬ বৎসরের বালক মনোরঞ্জন দাস। এক মাসের মধ্যে সূর্য সেন, কল্পনা দত্ত ও তারকেশ্বরের বিচার আরম্ভ হইল।

সেই সময় শান্তি চক্রবর্তী, মনি দত্ত, কালীকিঙ্কর দে প্রভৃতি কয়েকজন বিপ্লবের কাজ চালাইতেছিলেন ; তাঁহারা ধরা পড়িলেন। সূর্য সেনের মোকদ্দমার রায় বাহির হইল—সূর্য সেন ও তারকেশ্বরের ফাঁসীর আদেশ হইল—কল্পনার দ্বীপান্তর। আপীলে কোন ফল হইল না। সূর্য সেন ও তারকেশ্বরকে বহরমপুর জেলে পাঠান হইল—হয়ত বা বিদ্রোহীগণ চট্টগ্রাম জেল আক্রমণ করিতে পারে।

কিন্তু সূর্য সেনের শিষ্যগণ মরিয়া হইয়া উঠিল। ২রা জানুয়ারী গৈবলা গ্রামে গুপ্তচর নেত্র সেনকে হত্যা করা হইল ; কারণ তিনি সূর্য সেনকে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ধরাইয়া দিয়াছিলেন। ঐ দিন আর একদল শিষ্য হিমাংশু চক্রবর্তী, নিত্য সেন, কৃষ্ণ চৌধুরী, হরেন্দ্র চক্রবর্তী খেলার মাঠে পুলিশের উপর বোমা ছুড়িল। তাহাদের বয়স ১৪ হইতে ১৭ বৎসর। হিমাংশু ও নিত্য ঘটনাস্থলেই মারা যায়। হরেন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্রের ফাঁসী হইল। নেত্র সেনের হত্যাকারীকে পাওয়া গেল না।

ব্রিটিশ সরকার ভাবিলেন সূর্য সেনের ছায়া বোধ হয় চট্টগ্রামের উপর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—তাহারা সব সময় চকিত, ভীত ; সুতরাং ১০ দিন পরে ১২ই জানুয়ারী জেলখানার চারিদিকে সৈন্য স্থাপন করিয়া সূর্য সেন ও তারকেশ্বরের ফাঁসী দিল রাত্রি ১২টার সময়। রাত্রিতে ফাঁসী ব্রিটিশ ভারতে এই প্রথম।

চট্টগ্রামবাসী বলিয়াছিল—তারপর দিন চট্টগ্রামে আকাশে সূর্য উদিত হয় নাই।

"সাথে করে এনেছিলে মৃত্যুহীন প্রাণ।
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান॥"

১৮৯৭—?

"চলো দিল্লী

.........ঐ দূরে স্রোতস্বিনীর অপর তীরে, বনানীর অপর প্রান্তে, পর্ব্বতমালার সীমান্তে—ঐ দেখা যাচ্ছে ভগবানের আশীর্বাদপূত ভূমিখণ্ড—আমাদের জন্মভূমি। আমরা সেই মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তন করবো। ঐ শোন বাণী, জন্মভূমির আহ্বান; ঐ শোন জাতির রক্তধারার কলকল্লোল। আজ আমরা আমাদের রক্তের আহ্বান শুনছি। ওঠ, জাগো, অপচয় কোরবার মত সময় আমাদের নাই। অস্ত্র তুলে নাও, আমরা সৈন্যের ব্যূহ ভেদ ক'রে অগ্রসর হবো। হয়ত বিধাতার বিধানে আমাদের মৃত্যু বরণ করতে হবে। তখনও অনন্তশয়নে দিল্লী অভিযানের পথের ধূলিকণা চুম্বন কোরে আমরা কৃতার্থ হবো। দিল্লীর পথের ধূলায় রয়েছে আমাদের স্বাধীনতার পথ।

চলো দিল্লী! চলো দিল্লী........."

কি তীব্র ব্যাকুলতা সুভাষচন্দ্রের ঐ আহ্বানে, প্রতিটি শব্দ অন্তরের তীব্র আকাঙ্ক্ষায় মূর্ত! সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষের জীবন্ত সত্বা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেন। ভারতের প্রতিটি ধূলিকণার মধ্যে তিনি জীবনের স্পন্দন অনুভব করিয়াছিলেন। মাতৃভূমির কলস্বনা স্রোতস্বিনী, ঘন বন-বিটপীশ্রেণী,, চিরস্থির পর্বতমালা যেন রূপ পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার মানসপটে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিত। ভারতমাতার প্রতিটি সন্তানের সঙ্গে সুভাষচন্দ্র রক্তের নিবিড় অচ্ছেদ্য যোগসূত্র অনুভব করিতেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন ভারতের মুক্তিতে। তরুণ বয়সে তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন ভারতমাতার স্বাধীন রূপ। তাই তিনি লিখিয়াছিলেন 'তরুণের স্বপ্ন'। স্বপ্নের আবেশে আহ্বান করিয়াছিলেন ভারতের তরুণ সম্প্রদায়কে—"হে আমার তরুণ·········তোমরাই ত দেশে দেশে মুক্তির ইতিহাস রচনা কোরেছ। আজ এই বিশ্বব্যাপী জাগরণের দিনে স্বাধীনতার বাণী যখন চারিদিকে ধ্বনিত হচ্ছে, তখন তোমরাই কি ঘুমিয়ে থাকবে?·······তোমরা ওঠো, জাগো, আর বিলম্ব ক'রলে চলবে না।"

কি গভীর উন্মাদনাময়ী সে তরুণের আহ্বান! নিজের অন্তরের আহ্বান শুনিয়া সুভাষচন্দ্র নিজেই চঞ্চল হইয়া উঠিতেন। এই চঞ্চলতা সুভাষচন্দ্রের জীবন, চিন্তা ও কর্মধারার উৎস।

১৯৪১ সাল, ২৬শে জানুয়ারী—ভারতের স্বাধীনতা দিবস বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের আলোড়ন, ভারতব্যাপী আশঙ্কার অস্পষ্ট

ছায়া, অথচ বাহিরে স্বাধীনতার উদ্দীপনা। সুভাষচন্দ্র স্বগৃহে অন্তরীণ—আবদ্ধ। এই পরিস্থিতি সুভাষচন্দ্রের পক্ষে অসহনীয়। স্বাধীনতার স্বপ্ন বাস্তব করিতেই হইবে। পাষাণ প্রাচীরের আবেষ্টনে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকা সুভাষচন্দ্রের পক্ষে অসম্ভব। অকস্মাৎ দেশবাসী শুনিয়া স্তম্ভিত হইল—সুভাষচন্দ্র নিরুদ্দেশ। কেহ বলিল, সুভাষচন্দ্র সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া হিমালয়ে গমন করিয়াছেন; পূর্বেও তিনি একবার হিমালয়ে যাত্রা করিয়াছিলেন। জনরব তাঁহাকে কখন আসামের জঙ্গলে, কখন রেঙ্গুনে, কখনও বা উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে, কখন বার্লিনে বা রোমে; এমন কি মস্কোতে অবস্থান করিতেছেন বলিয়াও প্রচার করিল। সমস্ত জল্পনা নীরব হইয়া গেল যেদিন সুভাষচন্দ্র বার্লিন রেডিও হইতে প্রচার করিলেন,—"কোথাও বর্তমান যুগে বৈদেশিক সাহায্য ব্যতীত কোন দেশ স্বাধীনতা অর্জন করে নাই। আমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর বিরুদ্ধে বিদেশীর সর্বপ্রকার সাহায্য গ্রহণ করিব।"

সুভাষচন্দ্রের এই রেডিও-বার্তা আকাশবাণীর মত ভারতবাসী শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইল, আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিল। তাহা হইলে সুভাষচন্দ্র জীবিত! সুভাষচন্দ্র দেশের জন্যই দেশত্যাগ করিয়াছেন। ইহার পর প্রবাসী ভ্রাতার সহিত ভারতবাসীর সম্বন্ধ আরও নিকট হইয়া গেল। ভারতের বিপ্লববাণী নূতন ধারায় চলিয়াছে, ভারতের স্বাধীনতার চেষ্টা নূতন কর্মপথের সন্ধান লাভ করিয়াছে জানিয়া ভারতবাসী আশ্বস্ত

হইল। স্বাধীনতার নেশায় আত্মহারা সুভাষচন্দ্রের বিপদ-সঙ্কুল বিশ্ব-পরিস্থিতির মধ্যে দেশত্যাগের কাহিনী উপকথার রাজপুত্রের গল্পের মত ভারতবাসীকে আনন্দমুখরিত করিয়া তুলিল।

বিপ্লবী সুভাষ এইবার ভারতের স্বাধীনতার জন্য নূতন পথ আবিষ্কার করিলেন। বিপ্লবীরা পূর্বে মাণিকতলায় বোমা নির্মাণ করিয়াছে, মজঃফরপুরে বোমা নিক্ষেপ করিয়াছে, দিল্লীর রাজপথে ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধিকে আঘাত হানিয়াছে, বালেশ্বরে খণ্ডযুদ্ধ করিয়াছে, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করিয়াছে। কূটনীতিজ্ঞ ব্রিটিশজাতি পরপর ভারতের স্বাধীনতার চেষ্টা বিফল করিয়াছে। আজ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সুযোগ উপস্থিত। ইংরেজ পশ্চিম-রণাঙ্গণে জার্মাণ কর্তৃক বিভ্রান্ত, পূর্ব-রণাঙ্গণে জাপান কর্তৃক বিতাড়িত। এই সুযোগে জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে ইংরেজকে পর্যুদস্ত করিতে হইবে। ইংরেজের জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে আজ সুভাষচন্দ্র বার্লিন হইতে টোকিও নগরে পদার্পণ করিয়াছেন—২০শে জুন ১৯৪৩ সাল।

সুভাষচন্দ্রের আগমন-বার্তা শ্রবণে প্রবাসী ভারতবাসী এক নূতন উদ্দীপনা অনুভব করিল। সকলেই ভাবিল এবার একটা পথের সন্ধান পাওয়া যাইবে।

সুভাষচন্দ্র টোকিওতে পদার্পণ করিয়াই সংবাদপত্রে বিবৃতি দিলেন, "প্রথম মহাযুদ্ধে আমাদের নেতৃবর্গ ব্রিটিশের রাষ্ট্রধুরন্ধর দ্বারা প্রতারিত হয়েছিলেন। আমরা আমাদের

ভুল বুঝেছি, কুড়ি বৎসর পূর্বেই আমরা তখন প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আর ইংরেজের প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করবো না। কুড়ি বৎসর আমরা স্বাধীনতার জন্য কেবল পরিশ্রম করেছি। আজ সময় এসেছে, ইংরেজকে আঘাত করবার সুযোগ এসেছে। স্বাধীনতার অরুণ আলোর অস্পষ্ট আভা ভারত-বাসীর চক্ষে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে, ঐ দূরে দেখা যায় প্রভাতের আলো। এমন সুযোগ শতাব্দীতে হয়ত একবার আসে, আমরা এই সুযোগ নষ্ট করতে পারব না, নষ্ট হতে দেবো না.........আমরা স্বাধীনতার জন্য সর্বস্ব পণ করব, উন্মুক্ত তরবারী হস্তে শত্রু অগ্রসর হয়েছে, আমরা তরবারী দিয়ে তরবারীর প্রতিরোধ কোরব। নিষ্ক্রিয় আন্দোলনকে সক্রিয় ক'রে তুলতে হবে। স্বাধীনতার সংগ্রামের আহুতি রক্ত! রক্ত আমাদের উৎসর্গ করতে হবে।"

সুভাষচন্দ্র ব্রিটিশ জাতির স্বরূপ যেমন করিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তেমন আর কোন ভারতবাসী করিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। ভারতের অপমানে তিনি মর্মে মর্মে আহত হইতেন, পরাধীনতার অপমানের বেদনা তাঁহার দেহের প্রতি অণু পরমাণুকে কত বিষাক্ত করিয়া তুলিত। তাই তিনি যৌবনের প্রথম পাদে ভারতের প্রতি অপমানসূচক মন্তব্যের জন্য প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক ওটেন সাহেবকে আঘাত করিলেন। ফলে কলেজ হইতে বিতাড়িত হইয়া সুভাষচন্দ্র নিজেকে স্বাধীনতা সংগ্রামে পুরস্কৃত বলিয়া অভিনন্দিত করিলেন। আই, সি, এস

শিক্ষানবীশীর সময় ইংলণ্ডে তিনি "ভারতীয় সহিস চোর; তাহারা ঘোড়ার দানা চুরি করে"-প্রভৃতি অপমানসূচক বাক্যের প্রতিবাদ করেন এবং অনুবাদ করিতে অস্বীকার করেন। অবশেষে ব্রিটিশের শ্রেষ্ঠ পার্থিব দান আই, সি, এস পদত্যাগ করেন। তিনি বিবেচনা করিলেন, আই, সি, এস পদগৌরব ভারতবাসীর ললাটে অপমান-তিলক।

১৯২১ সালে ব্রিটিশ রাজপুত্র এড্ওয়ার্ড ভারতবর্ষকে যুদ্ধে সাহায্যের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অন্তরালে রাজৈশ্বর্য প্রদর্শনের মানসে ভারতে আগমন করেন। সুভাষচন্দ্র পরাধীন জাতির নিকট রাজার কৃতজ্ঞতা প্রকাশকে অপমানের রূপান্তর বলিয়া বিবেচনা করিলেন; সুতরাং রাজপুত্রকে অভ্যর্থনা না করিয়া তিনি ব্রিটিশ-প্রতিভূরূপে বর্জন করেন। সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার সুবর্ণ-জয়ন্তী, পঞ্চম জর্জের সিংহাসন আরোহণের মহিমার দীপ্তি সুভাষচন্দ্রের চেষ্টায় রাজপুত্রের "বয়কটে" ম্লান হইয়া গেল। সুভাষচন্দ্র এবার কর্মক্ষেত্রে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পতাকাতলে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করিলেন—যেখানে ইংরেজের পাপ-প্রচেষ্টা, সেখানেই তিনি পুরঃসর। কলিকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠান ছিল ইংরেজ বণিকদের স্বার্থ-সংরক্ষণের দ্বিতীয় সোপান। কোন ভারতবাসী কখনো এই প্রতিষ্ঠানে কর্তৃত্ব করেন নাই। সুভাষচন্দ্র ১৯২৪ সালে উহার প্রধান কর্মসচিব নিযুক্ত হইলেন। ইংরেজ পৌর-প্রতিনিধি পরাধীন ভারতবাসীর সম্মুখে শপথ গ্রহণ করাকে অপমান মনে করিলেন। সুভাষচন্দ্র

তখন সাতাশ বৎসরের যুবক। সুভাষচন্দ্র পৌরাধিনায়কের সম্মানের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিলেন। পৌর প্রতিষ্ঠানে ইংরেজের নতশির দেখিয়া তিনি উচ্ছ্বসিত হইলেন; এই অবনমিত ইংরেজ-শির ভবিষ্যতের আভাস বলিয়া অভিনন্দন করিলেন। ফলে তিনি বিনা বিচারে সুদূর বর্মাদেশে অন্তরীণ হইলেন। বিদেশে দুরন্ত যক্ষ্মারোগে তিনি আক্রান্ত হইলেন। ব্রিটিশরাজ বাধ্য হইয়া সুভাষচন্দ্রকে মুক্তি দিলেন। মুক্তির পরে মাতৃভূমিতে পদার্পণ করিলে সুভাষচন্দ্রের দেহের সমস্ত গ্লানি মাতৃহস্তের স্নেহস্পর্শে দূরীভূত হইয়া গেল।

কিছুকাল পরে সাইমন কমিশন ভারতে উপস্থিত হইলে সুভাষচন্দ্র উহার বিরোধিতা করেন। তাঁহার ধারণা ছিল সাইমন ডোমিনিয়ান স্বায়ত্ত শাসন প্রদানের আবরণে ভারতের পরাধীনতা-শৃঙ্খলকে সুবর্ণমণ্ডিত করারই অপচেষ্টা করিবেন। লৌহ পিঞ্জরকে স্বর্ণমণ্ডিত করিলে পিঞ্জরের বিহঙ্গম স্বাধীনতা লাভ করিবে না। নামের পরিবর্তনে অপমানের তীব্রতা লঘু হইবে না। সুতরাং সুভাষচন্দ্র মহারাষ্ট্র প্রাদেশিক অধিবেশনে গান্ধীজীর নিষ্ক্রিয়তার তীব্র সমালোচনা করিলেন। ১৯২৮ সালে কলিকাতা মহানগরীতে ভারতীয় জাতীয় মহাসভার অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করিয়া সর্বাধিনায়করূপে কাজ করেন। এইখানে সুভাষচন্দ্র তাঁহার সহকর্মীগণ সহযোগে যে শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা ও গঠনপটুতা প্রদর্শন করেন তাহা ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাসে অদ্বিতীয়। ভারতবাসী বুঝিল যে তাহারা ব্রিটিশের সাহায্য

ব্যতিরেকেও সামরিক সংগঠন ও শৃঙ্খলা পরিচালনা করিতে পারে। এই অভিজ্ঞতা সুভাষচন্দ্রের ভবিষ্যৎ জীবনের আভাস।

এই কলিকাতা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে গান্ধীজীর মত-ভেদ তীব্র হইয়া উঠিল। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসনকে তিনি গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। তিনি গভীর আবেগের সহিত সভামঞ্চে ঘোষণা করিলেন :—

"সুদূর অনিশ্চিত ভবিষ্যতে স্বাধীনতার প্রার্থী আমরা নই। স্বাধীনতা আমাদের অবিলম্বে প্রাপ্য বস্তু।" অবশ্য কলিকাতা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হইল না। জওহরলাল প্রভৃতি তরুণ নেতৃগণ সুভাষচন্দ্রের মত গ্রহণ করিয়া কংগ্রেসের সতর্ক চিন্তাধারাকে অতিক্রম করিয়া গেলেন। গান্ধীজী খুব উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। জওহরলালকে সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাব হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে হইবে। নচেৎ ক্ষমতা প্রাচীন মধ্যপন্থী মীমাংসাবাদী নেতৃবর্গের হস্তচ্যুত হইবে। সুতরাং জওহরলালকে এই নবীন উগ্রপন্থী দলের প্রভাব হইতে দূরে সরাইতে হইবে। বুদ্ধিমান গান্ধীজী জওহরলালকে পরবর্তী বৎসরে লাহোর অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত করিয়া লইলেন। জওহরলাল গান্ধীজীকে ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা বলিয়া স্বীকার করিলেন—গান্ধীজীর অভিমতকে নিজের মত বলিয়া প্রচার করিলেন। অথচ এই গান্ধীজী কলিকাতা অধিবেশনে সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাবিত পূর্ণ স্বাধীনতাকে লাহোর অধিবেশনে ভারতের লক্ষ্য বলিয়া প্রচার করিলেন।

সুভাষচন্দ্রের চিন্তার পরিসর তখন আরও অনেকদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। তিনি লাহোরে প্রস্তাব করিলেন, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে সম্পূর্ণ বয়কট করা হউক, এবং সঙ্গে সঙ্গে সমান্তরাল জাতীয় শাসন (Parallel Government) প্রতিষ্ঠা করা হউক। সুভাষচন্দ্রের বিপ্লবের মধ্যে কোন আপোষ ছিল না। সুভাষবাবু প্রয়োজন বোধে রক্তপাত করিতে দ্বিধাবোধ করিতেন না। গান্ধীজীর বিপ্লব ছিল মনে, সুভাষচন্দ্রের বিপ্লব ছিল কর্মে।

লর্ড আরউইন রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্স আহ্বান করিলেন একটা মীমাংসা করার জন্য। সেই আলোচনার স্থল হইবে লণ্ডন। বাংলাদেশ হইতে সুভাষচন্দ্র, পাঞ্জাব হইতে কিচ্‌লু প্রভৃতি নেতারা বলিলেন, ইংলণ্ডে গিয়া বিলাতের আবহাওয়ার মধ্যে পরাধীন ভারতের সমস্যার সম্বন্ধে আলোচনা সম্ভব নয়। কলিকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠানের এক সভায় সুভাষচন্দ্র গোলটেবিল সম্মেলনের তীব্র নিন্দা করেন।

১৩ই নবেম্বর, ১৯৩০; সে দিনই লণ্ডনে গোলটেবিল সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ। গান্ধীজী লর্ড আরউইনের কূটনীতির পাশ হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারেন নাই। তিনি "ভদ্রলোকের মতন" লর্ড আরউইনের প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করিলেন এবং মীমাংসায় উপনীত হইলেন। গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করিলেন; প্রতিদানে রাজবন্দীদের মুক্তি দিতে হইবে। সুভাষচন্দ্র তখন ইংরেজের সঙ্গে আপোষ মীমাংসার ভবিষ্যত

ফল শুভ হইবে না বলিয়া দেশবাসীকে সাবধান করিলেন। করাচী কংগ্রেসের অধিবেশনের সমকালে নওজোয়ান কংগ্রেস নামে একটি সম্মেলন তিনি করাচীতেই আহ্বান করেন। এই সভায় সুভাষচন্দ্র নির্ভীকভাবে ঘোষণা করিলেন "আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত করিবার আদেশ দিয়া মহাত্মাজী দেশের স্বাধীনতা লাভের পক্ষে গুরুতর ক্ষতি করিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে বড়লাটের চুক্তি দেশের কাছে বিশ্বাসঘাতকতা মাত্র।" সুভাষচন্দ্র দেশের পক্ষে যাহা মঙ্গলময় বলিয়া বিবেচনা করিতেন তাহা অকুণ্ঠভাবে প্রকাশ করিতেন, ব্যক্তির সম্মান অপেক্ষা দেশের স্বার্থকে সুভাষচন্দ্র অধিক ভালবাসিতেন।

১৯৩১ সালে নিরস্ত্র রাজবন্দীদিগকে মেদিনীপুরের হিজলী বন্দীশালায় গুলি করিয়া হত্যা করা হয়। কংগ্রেস এই সময় ব্রিটিশ অত্যাচারে মূহ্যমান, মহাত্মা গান্ধীর "নিরামিষ প্রভাবে" ক্লীব। কংগ্রেস হিজলী হত্যাকাণ্ডের কোন স্পষ্ট প্রতিবাদ করিল না, সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতিপদ ত্যাগ করিলেন।

১৯৩১ সালে ডিসেম্বর মাসে মহাত্মা গান্ধী লণ্ডন গোল-টেবিল সম্মেলন হইতে বিফলমনোরথ হইয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করিলেন। সুভাষচন্দ্র মহাত্মাজীর সঙ্গে পরামর্শ করিবার জন্য বোম্বাই গমন করেন। প্রত্যাবর্তনের পথে ২রা জানুয়ারী (১৯৩২) "কল্যাণ" ষ্টেশনে তাঁহাকে বন্দী করা হইল। কর্তৃপক্ষ বাংলার সন্তানকে বাংলাদেশে আনয়ন করিল না।

বাংলার বাহিরে বিভিন্ন জেলে তাঁহাকে রাখা হইল, ফলে তাঁহার স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া পড়িল। এক বৎসর পরে তাঁহাকে ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য মুক্তি প্রদান করা হয়। তিনি নষ্ট স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য ইউরোপ যাত্রা করিলেন।

ইউরোপের ভিয়েনা শহরে এক স্বাস্থ্যাবাসে সুভাষচন্দ্র ভারতীয় কেন্দ্রীয় পরিষদের সভাপতি ভিটলভাই প্যাটেলের সহিত মিলিত হন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের চিন্তাশীল সক্রিয় কর্মী মহাত্মা গান্ধীর শম্বুকগতির সমালোচনা করিয়া তাঁহারা উভয়েই এক যুক্ত বিবৃতি প্রদান করেন। প্যাটেল সাহেব সুভাষ বাবুর কর্মশক্তি, সংগঠন-প্রচেষ্টা এবং দেশপ্রীতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিলেন এবং মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার উইলে সুভাষ-চন্দ্রের হস্তে একলক্ষ টাকা দানের নির্দেশ দিয়া যান। এ কথা অবিসংবাদিত সত্য যে, চিরকাল একদল ঈর্ষাপরায়ণ কুচক্রী লোক সুভাষ বসুর বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ ষড়যন্ত্র করিয়াছেন এবং তাঁহদের চক্রান্তে আইনের কূটজালের অন্তরালে ভি, জে, প্যাটেলের সেই গচ্ছিত অর্থ সুভাষচন্দ্রের হাতে আসিল না। ভাবতের ভবিষ্যৎ ইতিহাস রচয়িতা এই সকল স্বার্থ-সর্বস্ব কুচক্রীদিগকে ক্ষমা করিবেন না।

এই লণ্ডনে ইণ্ডিয়ান রিপ্লাবিকান এসোসিয়েশন সুভাষ-চন্দ্রকে লণ্ডন পলিটিকাল কন্‌ফারেন্সের সভাপতি পদে বরণ করিয়া আমন্ত্রণ করিল। কিন্তু ব্রিটিশ রাষ্ট্রশক্তি সুভাষচন্দ্রকে লণ্ডনে আগমনের অনুমতি দান করে নাই, সুতরাং তাঁহার লিখিত অভিভাষণ পাঠ করা হইল। প্রবাসে অবস্থান কালে

সুভাষচন্দ্রের লিখিত "ভারতীয় সংগ্রাম" (Indian Struggle) ইউরোপে প্রকাশিত হইল। অপূর্ব সেই গ্রন্থ—যেমন লেখকের মনীষা, তেমন দূরদৃষ্টি, তেমন বিশ্লেষণ-ক্ষমতা, তদধিক প্রকাশ-ভঙ্গিমা ; কিন্তু ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সেই পুস্তক ভারতে প্রবেশ করিতে দেয় নাই।

১৯৩৪ সালে তাঁহার পিতা জানকীনাথ বসুর অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া তিনি বিনানুমতিতে ভারতে পদার্পণ করেন, কিন্তু করাচীতে সংবাদ পাইলেন যে পিতার মৃত্যু হইয়াছে। শোক-দগ্ধচিত্তে তিনি কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। তিনি পিতার শ্রাদ্ধের সাতদিন পরে ১৯৩৫ সালের ৮ই জানুয়ারী ক্ষুব্ধচিত্তে ভগ্নহৃদয়ে সদ্যবিধবা জননী এবং ক্ষুব্ধা জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া পুনরায় ইউরোপ যাত্রা করিলেন।

সেই বৎসর রোমে এসিয়াটিক ষ্টুডেণ্টস্ কনফারেন্সের অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র যোগদান করেন। স্বনামধন্য মুসোলিনী এই সভার উদ্বোধন করেন। সেখানে মুসোলিনীর সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিষয়ে তিনি আলোচনা করেন। ১৯৩৬ সালে তিনি আয়ার্ল্যাণ্ডে গিয়া ডি, ভেলেরার সঙ্গে ভারতীয় স্বাধীনতার বিষয় আলোচনা করেন। দুইটি ব্রিটিশ বিরোধী মনের মিলন হইল। আয়র্ল্যাণ্ড চিরকাল সুভাষচন্দ্রকে প্রেরণা দিয়াছে। এই সভাতে সুভাষবাবু একটি কর্মসূচী স্থির করেন। সেই বৎসর মার্চ মাসে ভারতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্য ব্রিটিশের নিষেধাজ্ঞাসত্বেও তিনি ভারতে আগমন করেন। বোম্বাই পদার্পণ

করিলে তাঁহাকে বন্দী করিয়া যারবেদা জেলে আবদ্ধ করা হয় এবং পরে তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর কার্শিয়াং আবাসে তাঁহাকে অন্তরীণ করা হয়।

সুভাষচন্দ্রের অন্তরীণ ব্যাপারে সমগ্র দেশবাসী অপমানিত ও আহত অনুভব করিল। ১০ই মে ভারতের সর্বত্র "সুভাষ দিবস" পালন করা হইল। ব্রিটিশের কার্যের প্রতিবাদ করিয়া সভাসমিতিতে সুভাষচন্দ্রের কার্যের স্তুতি এবং ব্রিটিশের নিন্দামূলক প্রস্তাব গৃহীত হইল।

অন্তরীণ অবস্থায় সুভাষচন্দ্রের দেহ ও মনে দ্বন্দ্বের ফলে স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া গেল। ১৯৩৭ খৃঃ অব্দে ১৭ই মার্চ তাঁহাকে বিনাসর্তে মুক্তি দেওয়া হইল। তিনি স্বাস্থ্যান্বেষে ভিয়েনা গমন করেন এবং কিছুকাল পরে ইংলণ্ডে গমন করিলেন—১৯৩৮, জানুয়ারী। তখন ইউরোপের রাজনৈতিক আকাশ ঘন মেঘাচ্ছন্ন। জার্মানিতে হিটলার, ইতালিতে মুসোলিনী ও রাশিয়াতে ষ্টালিনের রাষ্ট্রধারা ইউরোপকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। ইংলণ্ড, আমেরিকা ও ফরাসীর নাগপাশ হইতে মুক্তির জন্য পৃথিবীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলি চেষ্টা করিতেছে। সুভাষচন্দ্র এই সুযোগে মধ্য ইউরোপে ভারতবর্ষের পক্ষে জনমত সৃষ্টির জন্য আন্দোলনের চেষ্টা করেন। ভারতবর্ষ তখন সুভাষ-চন্দ্রের অকৃত্রিম দেশপ্রীতি ও অদম্য কর্মপ্রচেষ্টাকে অত্যন্ত আবেগপূর্ণ শ্রদ্ধাদৃষ্টিতে লক্ষ্য করিত। ফলে তাঁহার ইংলণ্ড-বাসকালে ভারতবাসী তাঁহাকে হরিপুরা কংগ্রেসের

সভাপতি নির্বাচিত করিল। সুভাষচন্দ্র দেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন। হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণে তাঁহার ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি, ব্রিটিশের কূটনীতির বিশ্লেষণ, ভারতের ভবিষ্যৎ সংগ্রামের পথনির্দেশ অপূর্ব ভাষায় প্রকাশিত হইল। পর বৎসর ত্রিপুরী কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধীর প্রচ্ছন্ন বিরোধিতা সত্ত্বেও দেশবাসী ডাঃ পট্টভী সীতারামিয়াকে প্রত্যাখ্যান করিয়া সুভাষচন্দ্রকে নির্বাচিত করিল। এই নির্বাচনকে গান্ধীজী ব্যক্তিগত পরাজয় বলিয়া জনসাধারণের সম্মুখে প্রচার করিলেন (Pattabhi's defeat is my defeat)।

যিনি প্রত্যক্ষ কংগ্রেসের "চারি আনা" সদস্য ন'ন, তাঁহার এইপ্রকার ব্যক্তিগত পক্ষ গ্রহণ করাতে জনসাধারণ ক্রুদ্ধ ও বিব্রত হইল। ত্রিপুরী কংগ্রেসের প্রাক্কালে দেখা গেল যে অতি বিচক্ষণ গান্ধীজী রাজকোটে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিয়া জনসাধারণের মনকে আকর্ষণ করিয়া লইয়াছেন। যুক্তপ্রদেশের নেতা গোবিন্দবল্লভ অর্ধসত্য সংবাদ প্রচার করিয়া নর্মদাসলিলে সত্যকে বিসর্জন করিয়া মানুষের মনকে সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে বিষাক্ত করিয়া তুলিলেন। তখন সুভাষচন্দ্রের রুগ্ন দেহের উত্তাপ ১০৫°, ১০৬° ডিগ্রী। সুভাষচন্দ্র মহাত্মার আশীর্বাদ প্রার্থনা করিলেন। ভারতের জাতীয় ঐক্যের নামে সুভাষবাবু মহাত্মার সহযোগিতা যাজ্ঞা করিলেন। মহাত্মা হিমালয়ের মত অটল। ব্যক্তিগত মান-অভিমান, ঈর্ষা-বিদ্বেষ, সুভাষচন্দ্রকে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিল।

কলিকাতায় আসিয়া তিনি সভাপতি পদ ত্যাগ করিলেন। রাজেন্দ্রপ্রসাদ মহাত্মার প্রসাদে সভাপতি নিযুক্ত হইলেন। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

সুভাষচন্দ্র নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবার পাত্র ছিলেন না। দেশের প্রয়োজনে তিনি সংগ্রামপন্থী কর্মীদল সৃষ্টি করিলেন। নাম হইল "অগ্রগামীদল" বা "ফরওয়ার্ড ব্লক।" কংগ্রেস ক্রোধে আত্মহারা হইয়া সুভাষচন্দ্রকে বিদ্রোহী দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়া তিন বৎসরের জন্য কংগ্রেস হইতে বহিষ্কৃত করিলেন। ফলে পরবর্তী বৎসর ১৯৩৯ সালে রামগড়ে কংগ্রেসের মণ্ডপের পার্শ্বে সুভাষচন্দ্র আপোষ-বিরোধী জাতীয় সম্মেলনের আহ্বান করিলেন এবং সভাপতিত্ব করিলেন। ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে রামগড়ের সেই স্মৃতি চিরকাল অম্লান থাকিবে।

জুন মাসে সুভাষচন্দ্র কলিকাতা নগরীর বুকে মিথ্যাবাদী হলওয়েলের স্মৃতিস্তম্ভ অপসারণের দাবী করিয়া আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। ক্রমশঃ উহা অত্যন্ত ব্যাপক আকার ধারণ করিল। হিন্দু মুসলমান সকলেই ব্রিটিশের এই "প্রস্তরীভূত মিথ্যা সাক্ষী"কে নিশ্চিহ্ন করিতে প্রয়াস পাইল। জুলাই মাসে ফরওয়ার্ড পত্রিকায় প্রকাশিত "হিসাব নিকাশের দিন" ( Day of Reckoning ) শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য তিনি কারারুদ্ধ হইলেন। সুভাষচন্দ্র তখন বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করার প্রতিবাদে অনশন করিবেন

বলিয়া মুসলিম লীগ গবর্ণমেণ্টের নিকট পত্র লিখিলেন। সে এক অপরূপ পত্র। শক্তিমানের বিরুদ্ধে শক্তিহীনের একমাত্র অস্ত্র—"মৃত্যুযজ্ঞে আত্মাহুতির" প্রয়োজন বিশ্লেষণ করিয়া সুভাষচন্দ্র মুক্তি দাবী করিলেন। বাংলা ভাষায় অপূর্ব সম্পদ সেই পত্রখানি। গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হইল ৫ই ডিসেম্বর, ১৯৪১ সাল।

সুভাষচন্দ্র এলগিন রোডের গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। যুদ্ধ তখন দ্বিতীয় পর্যায়ে উপস্থিত। ভারতবর্ষ যুদ্ধে যোগদান না করিয়াও ব্রিটিশের প্রয়োজনানুযায়ী যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিতেছে, যেন দেশের জনসম্পদ, অর্থসম্পদ, ব্রিটিশের নিকট ঋণজালে দায়াবদ্ধ। সরকারী প্রহরী দিবারাত্রি গৃহের বহির্দেশে সতর্ক প্রহরাতে নিযুক্ত—যেন সুভাষচন্দ্র মুঘল রাজান্তঃপুরিকা।

লোকে জনশ্রুতি শুনিয়াছিল যে, সুভাষচন্দ্র এলগিন রোডের গৃহাবাসে তপস্যায় নিমগ্ন। তিনি প্রতিকর্মে দেশের নেতৃবৃন্দ কর্তৃক অবহেলিত, কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জাতীয় প্রতিষ্ঠান হইতে বিতাড়িত, রাজসরকার কর্তৃক নিগৃহীত; সুতরাং তিনি সংসারে বীতরাগ, ধ্যাননিমগ্ন; উদ্দেশ্য—ধ্যানের অবসরে যদি কোন আলোকের সন্ধান পান। তাঁহার সম্বন্ধে ক্ষুদ্রতম সংবাদের জন্য দেশের প্রতিটি লোক ব্যাকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছে। দেশবাসী সুভাষচন্দ্রের সম্বন্ধে যে কোন আলৌকিক কাহিনী শুনিয়া তৃপ্তি লাভ করিত।

২৬শে জানুয়ারী ১৯৪২ সাল, স্বাধীনতা দিবসের স্মরণীয় দিনে প্রভাতে সংবাদ প্রচারিত হইল—**সুভাষচন্দ্র নিরুদ্দেশ।**

সুভাষচন্দ্র আফগানিস্থানের মধ্য দিয়া রাশিয়ার পথে বার্লিনে হিটলারের সমীপে উপস্থিত। সে পলায়ন-কাহিনী একখানি উপন্যাস। ইউরোপে উপস্থিত হইয়া ভারতীয়দের সাহায্যে তিনি একটি ব্রিটিশ-বিদ্রোহী সৈন্যবাহিনী রচনা করিলেন। মুসোলিনী ও হিটলার তাঁহাকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। সঙ্গে ইউরোপবাসী ভারতীয়দের দ্বারা "ফ্রি ইণ্ডিয়ান আর্মি" নামে সৈন্যদল গঠন করিলেন। এই দলের "ফুরার" বা অধিনায়ক হইলেন সুভাষচন্দ্র।

কিন্তু দূরত্বের জন্য প্রত্যক্ষভাবে জার্মানীর সাহায্যের পরিধি ও পরিমাণ সীমাবদ্ধ হইয়া রহিল। তখন পূর্ব রণাঙ্গনে ব্রিটিশ রাষ্ট্রশক্তি বিধ্বস্ত; জাপান আমেরিকার অধিকৃত পার্ল হারবার অধিকার করিয়াছে, ব্রিটিশের সিঙ্গাপুর ধ্বংস করিয়াছে। রাসবিহারী বসু বহু ভারতীয় সৈন্যদল গঠন করিয়াছেন।

জাপানের সাহায্যে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের নূতন অধ্যায় রচিত হইতেছে। রাসবিহারী বসুর সঙ্গে টেলিফোনে আলোচনা করিয়া সুভাষচন্দ্র সাবমেরিণ যোগে অত্যন্ত বিপদসংকুল পরিস্থিতি অতিক্রম করিয়া টোকিওতে উপস্থিত হইলেন—২০শে জুন, ১৯৪৩।

২১শে জুন প্রথম রেডিও ভাষণে সুভাষবাবু ব্রিটিশের স্বরূপ প্রচার করিলেন। সে ভাষণ শুনিয়া সমস্ত এশিয়া-বাসীর প্রাণে নূতন উদ্দীপনা সঞ্চারিত হইল। সুভাষচন্দ্রের মুহূর্ত অবসর নাই। প্রতিটি মুহূর্ত এক একটি বিশিষ্ট কর্মের জন্য নির্ধারিত। আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর সঙ্গে তিনি যুদ্ধের পরিস্থিতি, ভবিষ্যৎ কর্মসূচীর আলোচনা করেন। ২রা জুলাই তিনি সিঙ্গাপুর উপস্থিত হইলেন। ৪ঠা জুলাই তিনি সর্বসম্মতিক্রমে আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর সভাপতি নির্বাচিত হন এবং **নেতাজী** বলিয়া অভিনন্দিত

হন। সুভাষচন্দ্রের জীবনের মধুরতম স্বপ্ন বাস্তব হইয়া উঠিল কলিকাতায় ১৯২৮ সালে সুভাষচন্দ্রের স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর সর্বাধিনায়ক পদ আজ বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিল। সুভাষচন্দ্র ৫ই জুলাই আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ উপলক্ষ্যে বলেন—

"হে আমার সহকর্মীদল, তোমাদের রণধ্বনি হউক, দিল্লী চলো, 'দিল্লী চলো'……আজ আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ দিন, পরাধীন জাতির পক্ষে স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিক হওয়া সর্বোত্তম সম্মান ও গৌরব। এই সম্মান ও গৌরবের মধ্যে যে দায়িত্ব নিহিত আছে, আমি সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন।"

"আমি দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করছি—আলোকে অন্ধকারে, দুঃখে সুখে, জয়ে পরাজয়ে আমি তোমাদের পার্শ্বে থাকব,—বর্তমানে আমি তোমাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা, দুঃখকষ্ট এবং দুর্গম অভিযান ভিন্ন আর কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারছি না,…… তোমাদের সঙ্গে আমি মৃত্যু পর্যন্ত অগ্রসর হবো।" মনে পড়ে ফরাসী বীর নেপলিয়ান ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে ইতালী অভিযানের পূর্বে বিভ্রান্ত ফরাসী সৈন্যদের মধ্যে এমনি প্রেরণা প্রচার করিয়াছিলেন—তাই ফরাসী সৈন্যগণ অতিক্রম করিয়াছিল আল্পস্ পর্বতমালা, জয় করিয়াছিল ইতালীর শ্যামল প্রান্তর। কি উন্মাদনা সৃষ্টি করিয়াছিল সুভাষচন্দ্রের প্রচারবাণী! সমস্ত এশিয়াবাসী যেন রণভেরী শুনিয়া যুদ্ধের অশ্বের মত রণক্ষেত্রের প্রতি চঞ্চল পদক্ষেপে অগ্রসর হইয়া চলিল।

তিনমাসের মধ্যে সুভাষচন্দ্র "ঝান্সীর বাহিনী" প্রতিষ্ঠা করিলেন—সেদিন ছিল ২২শে অক্টোবর; সিপাহী বিদ্রোহের অধিনায়িকা ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাই এর জন্মদিন। সঙ্গে সঙ্গে গঠন করিলেন জাপানীদের অনুকরণে "আত্মঘাতী সেনাবাহিনী" (Suicide Squad)। তাহারা নিজেদের রক্ত দিয়া শপথ গ্রহণ করিত 'মৃত্যু আমার মিত্র, আমি ভারতের জন্য প্রাণপণ

করিলাম।' তাহাদের প্রধান কাজ ছিল মৃত্যুর সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করা। তাহারা শত্রুর ট্যাঙ্ক ধ্বংস করার কাজে নিযুক্ত হইত। নিজেদের পৃষ্ঠদেশে মাইন বহন করিয়া শত্রুর ট্যাঙ্কের চলার পথে শয়ন করিত। যথাসময়ে মাইন স্ফুরণের ব্যবস্থা করিত। শত্রুর ট্যাঙ্ক ধ্বংস হইত নিঃসন্দেহ ; সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের দেহও চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইত। পোর্ট আর্থারের যুদ্ধে জাপান প্রথম এই আত্মঘাতী সৈন্যদল গঠন করিয়াছিল, তারপর সিঙ্গাপুব ধ্বংসের সময় জাপানের এই বাহিনী সর্বাপেক্ষা কার্যকরী হইয়াছিল।

বিপ্লবী সুভাষচন্দ্রের বিপ্লবী প্রচেষ্টা আজ বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। বাঙ্গালী একমাত্র "কথার ফানুষ" নয়। সুভাষচন্দ্রের ব্যবস্থায় সৈন্য শিবিরে ভারতীয় নায়কের অধীনে একসঙ্গে ৭০০০ সৈন্যের শিক্ষার ব্যবস্থা হইল। সঙ্গে সঙ্গে একটি অস্থায়ী রাষ্ট্র স্থাপিত হইল—

সুভাষচন্দ্র হইলেন সেই নব গঠিত রাষ্ট্রের অধিনায়ক। জাপান, জার্মানী, ইতালি, আয়র্ল্যাণ্ড, চীন এবং ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুযুধান রাষ্ট্রগুলি স্বাধীন ভারত সরকার স্বীকার করিল। ২৫শে অক্টোবর "স্বাধীন ভারত" ইংলণ্ডের বিরুদ্ধ যুদ্ধ ঘোষণা করিল। "আজাদ হিন্দ্ সংঘ" হইল স্বাধীন ভারতবাসীর জাতীয় প্রতিষ্ঠান।

১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারী স্বাধীন ভারত সরকারের কর্মকেন্দ্র ব্রহ্ম দেশে স্থানান্তরিত হইল—রেঙ্গুন হইল রাজধানী, সেনাবাহিনী-পশ্চাৎ-কেন্দ্র ( Rear Head Quarter ) হইল সিঙ্গাপুর, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় পতাকা উড্ডীয়মান হইল। এই আন্দামান ছিল ভারতীয় বীরের জীবন্ত সমাধি। আজাদ হিন্দ্ সংঘের শাখা ছিল মালয়ে ৭০, ব্রহ্মদেশে ১০০, শ্যামে ২৪। তাহা ভিন্ন চীন, মানচুকু, জাপান, সুমাত্রা, জাভা, বর্ণিও, সেলিবন, আন্দামান প্রভৃতি স্থানে সংঘের শাখা

প্রতিষ্ঠিত হইল। বিভিন্ন বিভাগের জন্য "স্বাধীন ভারত সরকার" মন্ত্রী নিযুক্ত করিল; কর্মচারীগণ যথারীতি নিয়মানুবর্তী হইয়া কাজ করিত। হিসাবপত্র, বিধি-ব্যবস্থা তখন ব্রিটিশ শাসন অপেক্ষা সুচারুসম্পন্ন হইত—কারণ প্রত্যেকেই জানিত ইহা তাহার নিজের কাজ। সুভাষচন্দ্রের রাষ্ট্রের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রধান যোগসূত্র ছিল আনুষ্ঠানিক ধর্মের অভাব এবং জাতীয়তাবোধের প্রভাব।

এই কার্যের জন্য বর্মাপ্রবাসী ভারতীয়গণ ৭ দিনে ৮ কোটী টাকা দান করিয়াছিল। ১৯৪৫ সালের জানুয়ারী মাসে মালয়-প্রবাসী ভারতবাসীগণ নব বৎসরের উপহাররূপে সুভাষচন্দ্রকে ৪০ লক্ষ টাকা দান করিয়াছিল। একজন মুসলমান বণিক এক লক্ষ টাকা মূল্যের হীরা-জহরৎ ও স্বর্ণ দান করিলেন। ঐ অর্থ দ্বারা সুভাষচন্দ্র ব্যাঙ্ক, চিকিৎসালয়, বিদ্যালয়, ভূমি-উন্নয়ন, বাণিজ্যসংরক্ষণ প্রভৃতি কার্যের ব্যবস্থা করিলেন। দুইখানি সংবাদপত্র দৈনিক "পূর্ণ স্বরাজ" এবং সাপ্তাহিক "জয় হিন্দ" প্রকাশ করিলেন। একদিকে সুভাষচন্দ্র যুদ্ধের প্রতিটি অভিযানের সূক্ষ্মতম গতি নির্দেশ করিতেন এবং অন্যদিকে স্বাধীন ভারতের প্রজাবর্গের সুখ-সুবিধা ও জীবন-যাত্রার প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন। সুভাষচন্দ্র এই সময় প্রতিদিন ২০ ঘণ্টা কাজ করিতেন।

সুভাষচন্দ্র জাপানকে ভারতবর্ষ আক্রমণের সুযোগ দিলেন না। সুভাষ বসু বলিলেন, ভারত আক্রমণ এবং ভারত বিজয়ের দায়িত্ব ভারতবাসীদের। জাপানের সাহায্য লইতে তিনি অস্বীকার করেন নাই; তবে ভারত বিজয়ের ভার তাহাদের হস্তে দান করিতে স্বীকার করেন নাই। সুভাষচন্দ্র প্রতি বেতারযোগে ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে দিল্লীর "লাল কেল্লা"র প্রতি অভিযানের প্রতিশ্রুতি দিতেন। তিনি গান্ধীজীর নেতৃত্ব ও মহত্ত্ব স্বীকার করিতেন। ভারতবাসীর শুভেচ্ছা ও

সাহায্য তিনি কামনা করিতেন ; কিন্তু ভারতীয় নেতৃবর্গ সুভাষ-চন্দ্রের জাপান সাহায্যে ভারত অভিযানকে ভুল বুঝিয়াছিলেন। একজন নেতা বলিলেন, "যদি সুভাষচন্দ্র ভারতে অভিযান করেন তবে আমি স্বয়ং যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হবো"। তিনি মনে করিয়াছিলেন সুভাষচন্দ্র হয়ত জয়চাঁদ বা উমিচাঁদের মত বিদেশীর নিকট ভারতবর্ষ বিক্রয় করিবেন। সুভাষ বসুর বিরুদ্ধে এই অপপ্রচারের মধ্যে ঈর্ষা ও ব্যক্তিগত ভীরুতা ছিল।

আজাদ হিন্দ্ সৈন্যদল ১৯৪৪ সালে ৪ঠা জানুয়ারী হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮ই মার্চের মধ্যে ব্রহ্ম সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ভারতভূমিতে পদার্পণ করিল। কর্ণেল শাহ্ নওয়াজ, ইনায়েৎ কয়ানী, মোহন সিং এবং ধীলনের অধীনে মোরাই এর দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া ভারতীয় সৈন্য কোহিমা অধিকার করিল। স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা ভারতের ভূমিতে উত্তোলন করা হইল। ইম্ফল অবরোধ করিয়াছে আজাদ হিন্দ দল, এমন সময় ভীষণ বর্ষা আরম্ভ হইল। "আরমাদার" যুদ্ধে যেমন বন্যা ও ঊর্মিমালা ইলিজাবেথকে সাহায্য করিয়াছিল, তেমনি আজ দুরন্ত বর্ষা ইংলণ্ডকে সাহায্য করিল। প্রকৃতির রোষ-দৃষ্টি এবং দুর্যোগময়ী অবস্থার মধ্যে সংযোগ-সূত্র ও খাদ্য সংগ্রহ করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। সুভাষ বসুর সৈন্যগণ অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারার মধ্যে, দিনের পর দিন অনাহারে বৃষ্টি ক্ষান্তির জন্য অপেক্ষা করিল। কিন্তু বৃষ্টির জন্য ইম্ফলের দিকে অগ্রসর হইতে পারিল না। প্রকৃতি প্রতিকূল!

ব্রিটিশ সৈন্য তখন ব্রহ্মদেশের বিরুদ্ধে আকাশ-যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি করিতেছে। এবং পশ্চাদ্ ভাগে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই সময় কয়েকজন ভারতীয় "ষ্টাফ্ অফিসার" ব্রিটিশদলে যোগ দেয়। ১৫ই মার্চ, ১৯৪৫ ব্রিটিশ মিক্‌থিলা অধিকার করিল। ৫ই এপ্রিল সোভিয়েট রাশিয়া

জাপানের সঙ্গে মৈত্রী ছিন্ন করিল। আমেরিকা তখন আণবিক বোমা ব্যবস্থা করিতেছে। জাপানীরা বর্মা রণাঙ্গণ পরিত্যাগ করার সংকল্প করিল। ১৯৪৫ সালের ৩রা এপ্রিল জাপানী সেনাপতি রেঙ্গুন ত্যাগ করিল এবং সুভাষচন্দ্রকে তাহাদের পশ্চাদানুসরণ করিতে অনুরোধ করিল। সুভাষচন্দ্র জাপানীদের সঙ্গে একত্র রেঙ্গুন ত্যাগ করিতে অস্বীকার করিলেন। ৪ঠা এপ্রিল সুভাষচন্দ্র ব্রহ্ম ত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন—তাঁহাদের গোলাগুলি নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। খাদ্যভাণ্ডার শূন্য, সুতরাং প্রত্যাবর্তন ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না।

আজাদ হিন্দ্ সরকার রেঙ্গুন ত্যাগের সময় তাহাদের সমস্ত দেনা-পাওনা পরিশোধ করিয়া দিল। তাহাদের শাসনে রেঙ্গুনে কোনরূপ হত্যাকাণ্ড, বিশৃঙ্খলতা ও অরাজকতা হয় নাই। সুভাষচন্দ্র ব্রহ্মত্যাগের প্রাক্কালে জনসাধারণের সম্পত্তি ও জীবন রক্ষার ভার দিলেন জেনারেল লোকনাথনের উপর আদেশ দিলেন "ব্রিটিশ আসিলে যুদ্ধ না করিয়া আত্মসমর্পণ করিবে, অযথা জীবন নষ্ট করিবে না।" সুভাষচন্দ্র ৫ই এপ্রিল বিমানযোগে ব্যাংকক যাত্রা করিলেন। সুভাষচন্দ্রের ব্রহ্মত্যাগের সেই করুণ দৃশ্য আজাদ হিন্দ্ সৈন্যদল বিবৃত করিবার সময় অশ্রুমোচন করে।

১৯৪৫ সালের ২৩শে আগষ্ট পৃথিবীতে প্রচারিত হইল যে, সুভাষচন্দ্র বসু বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। সে সংবাদ আজও সমর্থিত হয় নাই।

সুভাষচন্দ্র মৃত হউন বা জীবিত হউক, ভারতবাসীর

নিকট সুভাষচন্দ্র একটি জীবন্ত সত্ত্বা। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ অধ্যায় সুভাষচন্দ্রের জীবনের ঘটনার সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত। সুভাষচন্দ্রের প্রেরণা যে জাতিকে কতটা উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল তাহার ইতিহাস লিখিবার সময় এখনো আসে নাই। যখন বর্তমান যুগের চঞ্চল পরিস্থিতি শান্ত হইয়া যাইবে, যখন ঘটনার আবর্ত স্তব্ধ হইয়া যাইবে, যখন ব্যক্তিগত ঈর্ষা ও বিদ্বেষ ম্লান হইয়া যাইবে, তখন ভারতবাসী সুভাষচন্দ্রের মূল্য নির্ণয় করিবে। স্বাধীনতা যে ভাবে ভারতবর্ষে আসিয়াছে তাহার মধ্যে সুভাষচন্দ্রের হস্তচিহ্ন চিরন্তন হইয়া থাকিবে। পৃথিবীর স্বাধীনতার ইতিহাসে সুভাষচন্দ্রের দান সীমাহীন।

ভারতবাসী স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়াছে, কামনা করিয়াছে ; বাঙ্গালী বিপ্লবী স্বাধীনতার জন্য যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিল ; সুভাষচন্দ্র সে যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিয়াছেন। সেই আহুতির মূল্য দিবে মহাকাল।

সমাপ্ত